প্রতিচিন্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১

প্রতিচিন্তা



সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

চতুর্থ বর্ষ ● তৃতীয় সংখ্যা ● ঢাকা ● জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪

প্রতি চিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা ২০১৪

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মাহবুব হোসেন, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; উপদেষ্টা, ব্র্যাক

সম্পাদনা পর্ষদ
নজরুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন অর্থনীতিবিদ, জাতিসংঘ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
হাসান ফেরদৌস, জাতিসংঘে কর্মরত
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী, চিত্রশিল্পী

শিল্প নির্দেশক
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্, প্রতিচিন্তা

দাম : ৫০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : protichinta.prothom-alo.com, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
July-September Issue, 2014; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূ চি প ত্র

স ম্পা দ কী য় ——— ৬

স মা জ

সপ্তদশ শতকের বাংলায় ধর্মীয় জীবন : কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা
আকবর আলি খান ——— ৯

আ ন্ত র্জা তি ক

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ও 'অন্যের' ভাবমূর্তির ধারণা
ইমতিয়াজ আহমেদ ৩৫

রা জ নী তি

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট
সাঈদ ইফতেখার আহমেদ ৬৩

প রি বে শ

বাংলাদেশের লোকায়ত জলবায়ুবিজ্ঞান : একটি প্রতিবেশ-নারীবাদী আলাপ
পাভেল পার্থ ——— ৭৫

ব ই আ লো চ না

মওদুদ আহমদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের একটি মূল্যায়ন
মিজানুর রহমান খান ——— ১২৬

যদি ইসলাম পৃথিবীতে না থাকত?
আসজাদুল কিবরিয়া ——— ১৪৬

লেখক পরিচিতি ——— ১৬৮



প্রতিবারের মতো এ সংখ্যায় রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজের মতো প্রসঙ্গগুলো ধর্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ও ঔপনিবেশিক আমলে সম্পদ লুণ্ঠন ইত্যাদি শিরোনামে একত্র করা হয়েছে। গুরুত্ব দিয়ে তুলে আনা হয়েছে পরিবেশ প্রসঙ্গটি।

সম্প্রতি আমাদের সরদার ফজলুল করিমকে আমরা হারিয়েছি। দার্শনিক, আজীবন জ্ঞান অনুশীলনকারী এ মানুষটির প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

ভারতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজেপির নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর উপমহাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম আবারও নতুনভাবে স্থান করে নেয় কি না, সে আশঙ্কা নতুনভাবে দেখা দিচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতটি বিবেচনায় নিলে, আকবর আলি খানের লেখাটি বর্তমান বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ বলে বিবেচিত হয়েছে। ভারত উপমহাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। লেখক এই প্রবন্ধে বাংলা অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম বিভক্তিসহ এ দুটি ধর্মের অভ্যন্তরীণ বিভেদগুলোর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা আলোচনা করেছেন। এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের বিস্তার কীভাবে হলো সে সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলোও খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। ভবিষ্যতে ধর্মীয় ও জাত-পাত ভেদাভেদের সঠিক ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রতি তৈরির পথে ভুলগুলো শুধরে নেওয়া সহজ হবে।

ভারতের নির্বাচন উত্তর পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের অবস্থান; তথা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিষয়টি নতুনভাবে আলোচনায় আসছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হলো দেশ দুটির পরস্পর সম্পর্কে নেতিবাচক ভাবমূর্তি বা আস্থার সংকট। এই ভাবমূর্তিটি গড়ে উঠেছে কেন এবং তা প্রতিনিয়ত চলমান থাকার কারণ কী সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ইমতিয়াজ আহমেদ। সমস্যার মূল খুঁজে বের করতে পারলে তার সমাধানের পথ সহজ হয়ে যায়। সে প্রচেষ্টাকে সামনে রেখেই দুদেশের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক তৈরির পথে অবিশ্বাসের কারণগুলো দেখা দরকার। এই আস্থাহীনতার ফলে দুদেশই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর ফলে দুদেশেই সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের যাত্রায় উপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব যে এখনো আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায় তার উদাহরণ পাওয়া যাবে সাঈদ ইফতেখার আহমেদের প্রবন্ধে। ঐতিহাসিক পর্যালোচনার পাশাপাশি আমরা বর্তমান রাজনীতি এবং সামাজিক কাঠামোয় তা কীভাবে গেড়ে বসেছে তার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই সবস্তরে ঔপনিবেশিক ধারণাসমূহের অন্ধ অনুকরণে। আকবর আলি খানের লেখায় ধর্মীয় বিভাজনের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় আমরা যা দেখতে পাই, সেটি ইফতেখারের লেখায় এসে পূর্ণতা পায়। শুধু গণতন্ত্র নয়, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাও এ দেশের সমাজবাস্তবতাকে বিবেচনায় না নিয়ে অনুকরণ করার ফলে ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠীর উত্থান হয়েছে এবং গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করেছে।

বাংলাদেশই শুধু নয়, বর্তমান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন ও তার নেতিবাচক প্রভাব একটি ভয়াবহ বিপর্যয় নিয়ে হাজির হয়েছে। স্থানীয় মানুষ বহুকাল ধরে প্রাকৃতিকভাবেই তাদের প্রতিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক সংকেতের মাধ্যমে তারা তা সম্পাদন করে আসছে। কীভাবে স্থানীয় জনগণ তাদের লোকায়ত জ্ঞানের মাধ্যমে জলবায়ুর সঙ্গে বসবাস করে, সে সম্পর্কে পাভেল পার্থের লেখায় বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের জলবায়ু ভাবনায় এসব লোকায়ত জ্ঞান অত্যধিক গুরুত্ব বহন করে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় এটি অবদান রাখবে।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বহুল আলোচিত-সমালোচিত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যদিও সাময়িক পরিত্রাণ মিলেছে, তবু একটি অনিশ্চয়তাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপস্থিতি এখনো পুরোপুরি বর্তমান। মওদুদ আহমদ রচিত বাংলাদেশের রাজনীতির বিশদ বর্ণনামূলক গ্রন্থ *বাংলাদেশ : এ স্টাডি অব দ্য ডেমোক্রেটিক রেজিমস* বইটি তাই পর্যালোচনার দাবি রাখে। ব্যক্তি মওদুদের চেয়ে একাডেমিক মওদুদের ভূমিকা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। বই আলোচনায় মিজানুর রহমান খান মূল লেখকের যুক্তির সঙ্গে নিজস্ব সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রণে সমসাময়িক রাজনৈতিক বাস্তবতার একটি প্রাঞ্জল চিত্র তুলে ধরেছেন।

আসজাদুল কিবরিয়া গ্রাহাম ই ফুলারের *আ ওয়ার্ল্ড উইদাউট ইসলাম* গ্রন্থটি আলোচনা করেছেন। ইসলাম ধর্মকে নিয়ে সারা দুনিয়ায় দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মুহূর্তে এই ধরনের একটি বই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যেটি ধরে নেওয়া হয় যে ইসলাম না থাকলে দুনিয়ায় কোনো সন্ত্রাসবাদ থাকত না, সেই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এখানে। সভ্যতার সংঘাতের মতো ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের মধ্যে যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক জিইয়ে রাখা হয়েছে, তার একটা কড়া জবাবের প্রচেষ্টা এই বইটি।

সমাজ চিন্তা

সপ্তদশ শতকের বাংলায় ধর্মীয় জীবন : কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা

আকবর আলি খান

সারসংক্ষেপ

বাংলা অঞ্চলে মানুষের আর্থসামাজিক জীবনে ধর্মের প্রভাব নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করার প্রয়াসেই এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত ভেদাভেদ এক দিনে শিকড় গেড়ে বসেনি। শুধু হিন্দু-মুসলমান বিভক্তিই নয়, প্রত্যেক ধর্মের ভেতরে শাখা-প্রশাখার মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য মানুষের সামাজিক জীবনে বিস্তর প্রভাব ফেলেছিল। এ প্রবন্ধে বাংলা অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ও সম্প্রসারণ এবং হিন্দু ধর্মের প্রকৃতি ও বিবর্তনকে ঐতিহাসিক আর্থসামাজিক বাস্তবতার আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইসলাম প্রচারের মাধ্যম নিয়ে অনেক অস্পষ্ট ধারণাকে স্পষ্ট করা হয়েছে। এখানে সপ্তদশ শতকের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হলেও বিংশ শতাব্দীতে এসে এই ধর্মীয় ভেদাভেদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ব্যবহারের ফলেই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প আজকের সমাজে বিরাজমান।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম, সূফি ও পীর, শাক্ততন্ত্র, শাসনব্যবস্থা, জাতি-গোত্র ভেদাভেদ।

প্রারম্ভিক কথা

খ্রিষ্টাব্দ ১৬১০-১৭০৪ সময়কালকে অধ্যাপক ইটন বাংলাদেশে মোগল কর্তৃত্ব সুসংহতকরণের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১] ভৌগোলিক অন্তরায়সমূহকে অগ্রাহ্য করে বাংলা বদ্বীপের ইতিহাসে এই প্রথমবার সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলো। রাজনীতি ও প্রশাসনে অভিন্নতার প্রবণতা দেখা দিলেও বাংলাদেশে সপ্তদশ শতকে ধর্মের ক্ষেত্রে বিভক্তির ধারা বেগবান হয়ে ওঠে। অবশ্য বাঙালির ধর্মের জগতে এ সময়ে কোনো নাটকীয় ঘটনা পরিলক্ষিত হয়নি।

তবু আপাত-স্থবির ও নিস্তরঙ্গ ধর্মীয় জীবনে লোকচক্ষুর অন্তরালে এই বিভেদ ও ভিন্নতা বেড়ে চলে।

ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবে উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল সারা দেশ। তবু বৈষ্ণব আন্দোলনের জোয়ার বাংলাদেশের সব হিন্দুর মধ্যে অভিন্ন বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। তপন রায় চৌধুরী যথার্থই লিখেছেন যে বৈষ্ণববাদ পশ্চিমবঙ্গের নিম্নবর্ণের হিন্দুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে আকৃষ্ট করলেও পূর্ববঙ্গের উচ্চ ও নিম্নবর্ণের এবং পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নতুন মতবাদে দীক্ষিত করতে পারেনি। শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশায় বাংলার হিন্দুদের সিংহভাগ ছিল শাক্ততান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী। তপন রায় চৌধুরী তাই লিখেছেন, "Thus Vaisnavism in Bengal never became anything more than the faith of a powerful minority" (বাংলায় বৈষ্ণববাদ কখনো একটি শক্তিশালী সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিশ্বাসের চেয়ে বেশি মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি।)[২] বৈষ্ণব আদর্শে অনুপ্রাণিত ধর্মীয় সম্প্রদায়ও একত্র থাকতে পারেনি। শ্রীচৈতন্যের মহাপ্রয়াণের পর নব্য বৈষ্ণববাদের আবির্ভাবের ফলে বৈষ্ণবদের মধ্যেও নতুন বিভক্তি দেখা দেয়। অন্যদিকে বাংলার পূর্ব ও মধ্য অঞ্চলে চতুর্দশ শতক থেকে শুরু করে নিঃশব্দে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে এই নতুন মুসলমানেরাও ইসলামি উম্মাহর আদর্শে একত্র হতে পারেনি। এদের মধ্যেও মৌলবাদ-সমন্বয়বাদ, শিয়া-সুন্নি, বহিরাগত আশরাফ ও স্থানীয় আতরাফদের বিভক্তি দেখা দেয়। ধর্মীয় বিভক্তির এখানেই শেষ নয়। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আদিবাসী ও অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল অবৈদিক দেবদেবীর ও লোকধর্মের (folk religion) বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রাবল্য।

সপ্তদশ শতকে বাংলাদেশে তাই মানুষের হৃদয়কে জয় করার জন্য বহু ধরনের ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। তবে এসব বিশ্বাসের উত্থান ও বিকাশ সম্পর্কে যথেষ্ট ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব রয়েছে। কাজেই বাংলাদেশে সপ্তদশ শতাব্দীতে সব ধরনের ধর্মীয় গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও আচারের বিশ্লেষণ এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। তাই মোটা দাগে সপ্তদশ শতকে বাংলাদেশে ধর্মের জগতে তিনটি বড় ধরনের প্রবণতা বিশ্লেষণে এই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রথমত, এই সময়কালে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রসার ও ধর্মান্তরের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। মূলত এ প্রবণতা পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল। দ্বিতীয়ত, চৈতন্য-উত্তর বঙ্গদেশে হিন্দু ধর্মের বিবর্তনের মূল প্রবণতাসমূহ আলোচিত হবে। সবশেষে অন্ত্যজ ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের ধর্মীয় জীবনের পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

সপ্তদশ শতকে বাংলায় ইসলামের প্রসার ও প্রকৃতি

১২৮৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনে 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শীর্ষক নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলাদেশে ইসলামের প্রসার সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেন, যা আজকের ঐতিহাসিকদের জন্যও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।[৩] প্রথমত, বাংলাদেশের মুসলমানদের অধিকাংশ বহিরাগত—এ যুক্তি মানতে বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ রাজি নন। তাঁর মতে, বাংলাদেশের মুসলমানেরা প্রধানত স্থানীয়, এ অনুমানের পক্ষে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণের প্রয়োজন নেই। বর্তমান পরিস্থিতি থেকেই অতীত সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব। তিনি লিখেছেন, 'এখন ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালার অর্দ্ধেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্নদেশ হইতে আগত মুসলমানদের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেননা ইহার অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর লোক—কৃষিজীবি। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবি হইবে আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে ইহা অসম্ভব। দ্বিতীয় অল্প সংখ্যক রাজানুচর এত অল্প সময়ের এত বিস্তৃতি লাভ করিবে, ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ।'

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে ইসলাম ধর্মের জনপ্রিয়তা বঙ্কিমের কাছে ইতিহাসের একটি বড় প্রহেলিকা। 'দেশীয় লোকরা অর্দ্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাংলার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই।'

বাঙালি মুসলমানদের উৎপত্তি সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীতে নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে সুদীর্ঘ বিতর্ক হয়েছে।[৪] শেষ বিচারে বাংলার মুসলমানেরা এ দেশেরই নিম্নশ্রেণীর জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত বঙ্কিমের এই অনুমানই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। তবে বঙ্কিম বাঙ্গালায় ইসলামের প্রসার সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন তুলেছেন, এখন পর্যন্ত তার সন্তোষজনক মীমাংসা সম্ভব হয়নি। এর বড় কারণ, বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে যথেষ্ট ঐতিহাসিক উপাত্ত পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই বাংলায় মুসলিম সমাজে কাল-অনুক্রমিক বিবর্তনের বিশ্লেষণ সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রসার একটি ঘটনা নয়; এটি ছিল অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। সপ্তদশ শতকে বাংলায় ইসলাম সম্পর্কে আলোচনার আগে এ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন। বঙ্কিমের উপস্থাপিত প্রশ্নের আলোকে এ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

'কবে মুসলমান হইল?'

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ত্রয়োদশ শতকে। ইসলাম ধর্মের উদ্ভবের প্রায় ৬০০ বছর পরে বাংলায় মুসলমান রাজত্ব শুরু হয়। এই দীর্ঘ সময় ধরে ভারত

মহাসাগরের বাণিজ্য মুসলমান বণিকেরা কুক্ষিগত করে রেখেছিল। কাজেই মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই এখানে মুসলমান বণিকদের আনাগোনা ছিল। এ ধরনের বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাংলায় ইসলাম প্রসারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেনি। তবে ত্রয়োদশ শতকে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক বেড়ে যায়। তাই অনুমান করা হয় যে ত্রয়োদশ শতক থেকে শুরু করে বাংলাদেশে বড় ধরনের ধর্মান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় ইসলাম দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েনি। তিনটি কারণে অনুমান করা হয় যে বাংলায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতকরণের প্রক্রিয়া অত্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে চলে।

প্রথমত, এটি একটি ভুল ধারণা যে যেখানেই ইসলামের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানেই অতি দ্রুত ইসলাম ধর্ম বিজিতদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের ঘটনা বাংলায় দূরে থাক, ইসলামের জন্মভূমি মধ্যপ্রাচ্যেও ঘটেনি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আলবার্ট হুরানির বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমান শাসনের ১০০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিসর, তিউনিশিয়া ও স্পেনে মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশও ইসলাম কবুল করেনি।[৫] এসব দেশের নব্যদীক্ষিত মুসলমানেরা শহর অঞ্চলে আরব শাসকদের ছত্রচ্ছায়ায় বাস করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে স্থানীয় লোকদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতকরণের প্রক্রিয়া প্রায় ৪০০ বছর সময় ধরে চলেছে। মধ্যপ্রাচ্যের তুলনায় বাংলায় ধর্মের প্রাধান্য ছিল অনেক বেশি। হিন্দুদের জন্য ইহকালের চেয়ে পরকাল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার হিন্দুরা অতি সহজে মুসলমানদের শাসন মেনে নিয়েছে, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে ভারতের কোথাও হিন্দুরা আপস করতে চায়নি। এই প্রবণতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দার্শনিক উইল ডুরান্ট যথার্থই লিখেছেন, 'হিন্দুরা একের পর এক বিদেশি সরকারকে তাদের ওপর আধিপত্য করার সুযোগ দিয়েছে, অংশত এর কারণ হচ্ছে—দেশি না বিদেশি কে তাদের শাসন বা শোষণ করছে সে ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন ছিল না, তাদের কাছে রাজনীতি নয়, পরবর্তী অনন্ত জীবন ছিল তাদের আরাধ্য।'[৬] এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার হিন্দুদের ভিন্ন দেশের ধর্মে দীক্ষিত হওয়া মানসিক দিক দিয়ে একটি যন্ত্রণাদায়ক সিদ্ধান্ত ছিল। কাজেই এখানে ধর্মান্তর-প্রক্রিয়া অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়াই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় প্রখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে হজরত শাহজালালের সঙ্গে দেখা করার জন্য পূর্ববঙ্গের মধ্য দিয়ে সিলেট শহরে যান। তিনি প্রত্যাবর্তনের পথে ১৫ দিন ধরে মেঘনা নদীতে ভ্রমণ করেন। মেঘনার তীরবর্তী অধিবাসীদের তিনি 'Infidels under Muslim rule' বা মুসলমান রাজত্বের অধীনে কাফের বলে বর্ণনা করেছেন। ইবনে বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে এ কথা সুস্পষ্ট, পূর্ববঙ্গে চতুর্দশ

শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল।[৭] ১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ পরিব্রাজক বরবোসা বাংলাদেশে আসেন। তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, 'রাজা হচ্ছেন একজন মুসলমান। তিনি একটি বড় রাজত্বের প্রভু এবং অত্যন্ত ধনী। তিনি হিন্দুদের দ্বারা অধ্যুষিত একটি দেশ অধিকারে রেখেছেন। এখানে রাজা ও তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকে সুবিধা নেওয়ার জন্য প্রতিদিন অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করছে।'[৮] এসব ভ্রমণকাহিনি থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে মুসলমান শাসনের প্রথম ৩০০ বছরেও বাংলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

তৃতীয়ত, পশ্চিম এশিয়া থেকে যেসব ধর্মপ্রচারক ইসলাম প্রচারের জন্য বাংলাদেশে এসেছিলেন, তাঁদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁরা ত্রয়োদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে এসেছেন। বাংলাদেশে প্রখ্যাত ৫৯ জন ইসলাম প্রচারক পীর-দরবেশ সম্পর্কে একটি সমীক্ষা খানের *Discovery of Bangladesh* গ্রন্থে করা হয়েছে।[৯] ওই সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগে তিনজন পীর বাংলাদেশে এসেছিলেন। মুসলিম শাসনামলে ৫৬ জন প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারক পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে বাংলায় আসেন। এঁদের ১৫ শতাংশ ত্রয়োদশ শতকে আসেন, ৩৬ শতাংশ আসেন চতুর্দশ শতাব্দীতে: ১৮ শতাংশ আসেন পঞ্চদশ শতকে, ২৩ শতাংশ আসেন ষোড়শ শতকে। মাত্র ৩ শতাংশ আসেন সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই সমীক্ষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বাংলায় ইসলাম প্রচার সবচেয়ে জোরেশোরে চলেছে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী—এই ৪০০ বছর। তবে পীরেরা আসার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেনি। মৃত পীরেরা জীবিত পীরদের চেয়ে কম কার্যকর নন। অনেক ক্ষেত্রে মৃত পীরদের কাছে মানত মানার সুফল পেয়েও অনেক হিন্দু মুসলমান হতে পারে। ষোড়শ শতকের তুলনায় অনেক কম পীর সপ্তদশ শতকে বাংলাদেশে আসেন। সম্ভবত ষোড়শ শতকে যে পীরেরা বাংলায় আসেন, তাঁদের প্রভাব সপ্তদশ শতকেও অব্যাহত ছিল। সপ্তদশ শতকের পরে বাইরে থেকে বাংলাদেশে পীরদের আগমন একেবারে কমে যায়। এতে অনুমান করা যায় যে সপ্তদশ শতকে বাংলার পূর্ব ও উত্তর অঞ্চলে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৫০০ বছর ধরে ধর্ম প্রচারের পর বাংলাদেশে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

কেন স্বধর্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল?

বাংলায় ইসলামের বিস্ময়কর সাফল্য ব্যাখ্যার জন্য চার ধরনের তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে। এই তত্ত্বগুলো নিম্নরূপ:

ক. মুসলমান শাসকদের ইসলাম ধর্ম প্রচারে আনুকূল্য;

খ. ব্রাহ্মণ্যবাদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের বিদ্রোহ;

গ. হিন্দু উৎপীড়নের ফলে উৎপীড়িত বৌদ্ধদের ইসলাম গ্রহণ;

ঘ. মুসলিম পীরদের ধর্ম প্রচার;

কেউ কেউ অনুমান করেন যে মুসলমান শাসকেরা হিন্দুদের অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে ও পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেছেন। দীর্ঘদিনের ইতিহাস থেকে দু-চারটি অত্যাচার বা ইসলাম গ্রহণের জন্য পুরস্কারের নজির বের করা অসম্ভব নয়। তবে মূলত বাংলায় ইসলাম প্রচারে শাসকদের ভূমিকা ছিল অতি নগণ্য। এই অনুমানের পক্ষে তিনটি যুক্তি রয়েছে। প্রথমত, যদি ধর্মান্তরে রাজাদের ভূমিকাই মুখ্য হয়, তবে রাজধানীর আশপাশের মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য সবচেয়ে বেশি হতো। দীর্ঘ সাড়ে ছয় শ বছর ধরে দিল্লি মুসলমান শাসকদের রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও দিল্লির আশপাশের অঞ্চলে মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। দিল্লি নগর ও তার আশপাশে বেশির ভাগ মুসলমানই ছিল বহিরাগত বা বহিরাগতদের বংশধর। যদি রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে ধর্মান্তর করা হতো, তবে উত্তর ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা এত নগণ্য হতো না। বাংলার দিকে তাকালেও দেখা যাবে যে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের (যেসব অঞ্চলে বাংলার মুসলমান শাসকেরা রাজত্ব করেছেন) তুলনায় মুসলমানের হার বগুড়া, পাবনা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ইত্যাদি প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক বেশি ছিল।

দ্বিতীয় মুসলমান শাসনামলে বাংলার মুসলমানেরা ছিল খুবই দরিদ্র। কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লিখেছেন[১০] :

'হিন্দু হইআ মুসলমান হয় গরসাল
কাঁণ হইয়া ম্যাগ্যা খায় পায়্যা নিশাকাল।'

অর্থাৎ ইসলামে ধর্মান্তরিত হিন্দুরা 'গরসাল' নামে পরিচিত ছিল এবং তারা রাত্রে অন্ধ সেজে ভিক্ষা করে জীবিকা অর্জন করে। চণ্ডীমঙ্গল থেকে দেখা যায় যে মুসলমান শাসনামলে স্থানীয় মুসলমানদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান ছিল খুবই নিচে। আর্থিকভাবে মুসলমান শাসন থেকে সবচেয়ে বেশি লাভ হয় বাংলার বর্ণ হিন্দুদের (বিশেষ করে কায়স্থদের)। দরিদ্র ও অশিক্ষিত স্থানীয় মুসলমানদের এই শাসনব্যবস্থায় কোনো ভূমিকা ছিল না।[১১] কাজেই মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় ইসলাম প্রচারিত হয়েছে—এ ধরনের অনুমান অমূলক।

তৃতীয়ত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে (কদাচিৎ) শাসকদের জোরজবরদস্তির যেমন নজির রয়েছে, তেমনি অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে বাংলার মুসলমান শাসকেরা ইসলাম ধর্ম প্রচারে বিঘ্ন ঘটিয়েছেন। সমসাময়িক লেখক মির্জা নাথাম লিখেছেন, মোগল সুবেদার ইসলাম খান মুসলমান আমলাদের হিন্দুদের জোর করে

মুসলমান করার জন্য শাস্তি দেন।[১২] মানরিক ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় আসেন। তিনি লিখেছেন যে মোগল সম্রাট মোল্লাদের অভিযোগ সত্ত্বেও খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রচারণা বন্ধ করতে অস্বীকার করেন।[১৩] মনে রাখতে হবে যে মুসলমান শাসকেরা ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের কমপক্ষে ৬০০ বছর পরে বাংলায় আসেন। তত দিনে মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে গেছে। ধর্ম নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও গোষ্ঠীগত রাজনীতিই ছিল এদের সব কর্মকাণ্ডের নিয়ামক। ধর্মান্তরকরণ তাদের জন্য আদৌ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

দ্বিতীয় ঘরানার ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে বাংলার নিম্নবর্ণের মানুষ ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ ধরনের বক্তব্য বেভারলি[১৪] ও আর্নল্ডের[১৫] লেখায় দেখা যাবে। এই বক্তব্য সমর্থন করে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'কিন্তু বাঙ্গলাদেশ চিরকালই দুর্দান্ত—স্বাধীনতাপ্রিয় সিংহকে খাঁচায় পুরিলে সে যে রূপ শৃঙ্খলকে দুঃসহ মনে করিয়া ছটফট করিতে থাকে, অত্যধিক ব্রাহ্মণ-শাসনে পীড়িত হইয়া বাঙ্গালী এই দৌরাত্ম্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ব্যাকুল হইল। ব্রাহ্মণেরা মন্দিরগুলি আত্মসাৎ করিয়া দেবতাদিগকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন, জনসাধারণ ও তাহাদের মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উত্থিত হইল। অভিমানে এ দেশে অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল।'[১৬]

এ কথা ঠিক যে বাংলায় নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে প্রাণহীন ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার এটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হতে পারে না। ব্রাহ্মণদের আধিপত্য শুধু বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ব্রাহ্মণেরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বাংলার ব্রাহ্মণদের চেয়ে অনেক বেশি অত্যাচার করেছে। দক্ষিণ ভারতে শূদ্রদের কোনো দিক থেকেই ব্রাহ্মণের ৪০ হাত দূরত্বের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। রাস্তায় কোনো ব্রাহ্মণ দেখলে শূদ্রদের ইউরোপের কুষ্ঠরোগীদের মতো পথ থেকে নামতে হতো। উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণদের প্রতি ঘৃণা একটি প্রবাদে ব্যক্ত হয়েছে :

'ইস দুনিয়া মে তিন কসাই
পিসু খাটমল, ব্রাহ্মণ ভাই'

(এই জগতে তিন ধরনের রক্তচোষা রয়েছে। পিসু (একধরনের মাছি), ছারপোকা ও ব্রাহ্মণ ভাই। লক্ষণীয়, ভারতের অন্যত্র ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রচণ্ড অসন্তোষ সত্ত্বেও স্থানীয় অধিবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি।

দ্বিতীয় মধ্যযুগের বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম অনুমোদিত বর্ণ না থাকলেও প্রকট বৈষম্য বিরাজ করত। অভিজাত 'আশরাফ' ও নিম্নশ্রেণীর আজলাফ বা আতরাফের মধ্যে ছিল দুস্তর ব্যবধান। হিন্দু থেকে যাঁরা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হতেন, তাঁদের আশরাফ হিসেবে গণ্য করা হতো না। তাঁদের ঠাঁই হতো

আতরাফদের বর্গে। আতরাফ শব্দটি আজলাফ শব্দের অপভ্রংশ। আজলাফ শব্দের অর্থ হলো নীচ লোক। তাঁদের ইতর, কমিন বা রাজেল (যার অর্থ হলো অপদার্থ) বলেও অভিহিত করা হতো। কাজেই মুসলমান হলেই সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তি পাওয়া যেত, এ ধরনের অনুমান সঠিক নয়।

সবশেষে বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদ ছিল অত্যন্ত দুর্বল। বাংলার ব্রাহ্মণদের অধিকাংশ কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, অনেক ব্রাহ্মণ নিজেরাই ছিলেন বৈষম্যের শিকার। বাংলায় ব্রাহ্মণদের দুটো প্রধান শ্রেণি ছিল। শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ও বর্ণ ব্রাহ্মণ। শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা বর্ণ ব্রাহ্মণদের হাত থেকে জল গ্রহণ করত না। চাষি কৈবর্তদের ব্রাহ্মণেরা এত নিচু পর্যায়ের ছিল যে তাদের যজমানরা পর্যন্ত তাদের গৃহে আহার করত না। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা নিজেরাই অনেক শ্রেণিতে বিভক্ত। একে অপরকে শোষণ করত। গোটা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো ঐক্য তাদের ছিল না।

উপরিউক্ত যুক্তিসমূহ বিবেচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বাংলায় ইসলাম প্রচারে একটি সহায়ক উপাদান হলেও মূল চালিকাশক্তি ছিল না। যদি তা-ই হতো, তবে বাংলার অনেক আগে বিহার ও দক্ষিণ ভারতে মুসলিম সংখ্যাধিক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হতো।

তৃতীয় ঘরানার ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হলো যে হিন্দুদের অত্যাচারে বাংলায় বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।[১৭] এই মতবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা হলেন দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি লিখেছেন, 'বঙ্গদেশীয় মুসলমান সমাজের নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে গৃহীত।'[১৮] এই বক্তব্যের কয়েকটি বড় দুর্বলতা রয়েছে।

প্রথমত, এটি অত্যন্ত ভুল ধারণা যে মুসলমান শাসনের আগে বাংলায় বেশির ভাগ লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল সম্রাটদের শাসনামলে বাংলায় বৌদ্ধদের তুলনায় অনেক বেশি হিন্দু ছিল।[১৯] কাজেই যদি ধরেও নেওয়া হয় সব বৌদ্ধ ইসলামে দীক্ষিত হয়, তবু বাংলায় বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামের প্রাধান্য সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

দ্বিতীয়ত, যদি হিন্দুদের অত্যাচারে বৌদ্ধরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে থাকে, তবে মুসলমান শাসনের প্রথম এক/ দুই শতকের মধ্যে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। ইবনে বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে এ কথা স্পষ্ট যে চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশে কাফেরের বা অমুসলমানের সংখ্যাই ছিল অনেক বেশি। মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পর বৌদ্ধদের ওপর হিন্দুদের অত্যাচার কমে যাওয়ার কথা। কাজেই মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক শ বছর পরে হিন্দুদের অত্যাচারে বৌদ্ধরা ইসলাম গ্রহণ করে এ ধরনের যুক্তি মেনে নেওয়া শক্ত।

তৃতীয়ত, মুসলমানেরা বৌদ্ধদের প্রতি আদৌ সদয় ছিলেন, এ ধরনের কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং মুসলমান শাসকেরা বৌদ্ধদের অত্যাচার করেছেন। সমকালীন ঐতিহাসিক মিনহাস উস সিরাজ লিখেছেন যে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি উদয়ন্তপুরী বিহার ধ্বংস করেছেন ও নেড়ে মুণ্ড বৌদ্ধদের হত্যা করেছেন। হিন্দুরা গৌতম বুদ্ধকে দেবতা গণ্য করত, মুসলমানরা গৌতম বুদ্ধ বা তাঁর মতবাদের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা দেখায়নি। এই অবস্থায় স্থানীয় বৌদ্ধরা (তাদের সংখ্যা যা-ই হোক না কেন) দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে এ ধরনের অনুমান গ্রহণযোগ্য মনে হয় না।

চতুর্থ ঘরানার ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে বাংলায় ইসলামের সাফল্যের সবচেয়ে বড় কারণ হলো মুসলমান পীর, দরবেশ ও সুফি সাধকদের ধর্ম প্রচার। এ বক্তব্য সঠিক, তবে আংশিকভাবে সঠিক। সঠিক এই অর্থে যে মুসলমান পীর, দরবেশ ও আউলিয়ারাই বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সাধারণ মানুষের পক্ষে ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে পীর-দরবেশরা শুধু বাংলাদেশেই আসেননি। মুসলমান পীর-আউলিয়ারা ভারতের সব স্থানেই ইসলামের বাণী প্রচার করেছেন। এঁদের মধ্যে খাঁজা মঈনউদ্দিন চিশতি (ত্রয়োদশ শতাব্দী), বু আলি কলন্দর (১৪ শতক), দাতা গঞ্জ বক্স (১১ শতাব্দী), কুতুবউদ্দিন, নিজামউদ্দিন আউলিয়া, শাহ ফরিদ উদ্দিন, সৈয়দ মোহাম্মদ ঘিসু দরাজ, পীর মহাবীর কামদিয়াত, ইমাম শাহ প্রভৃতি সর্বভারতে শ্রদ্ধেয় বুজুর্গজন রয়েছেন। এ ঘরানার বক্তব্য গ্রহণ করতে হলে বুঝতে হবে কেন বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে পীর-দরবেশরা ইসলাম ধর্ম প্রচারে সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। অবশ্য এঁদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও কার্যদক্ষতা বাংলার মুসলমান ধর্ম প্রচারকদের থেকে কম ছিল না। প্রশ্ন হলো, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ব্যর্থতা সত্ত্বেও মুসলমান ধর্ম প্রচারকেরা বাংলায় কেন সফল হলেন? এ প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে এ ঘরানার ঐতিহাসিকদের বক্তব্য পূর্ণাঙ্গ হবে না।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলার মুসলমান ধর্ম প্রচারকদের সাফল্য সম্পর্কে সম্প্রতি তিনটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন ঐতিহাসিক অসীম রায়।[২১] তিনি মনে করেন যে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারক পীর-আউলিয়াদের প্রকৃতি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অনুরূপ প্রচারকদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর মতে, বাংলার পীরদের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, বাংলার পীর বলতে শুধু আধ্যাত্মিক মুরশিদ বা ফকির-দরবেশ বোঝায় না। পীরদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত সফল সেনাপতি, অনাবাদি এলাকার অগ্রণী বসতকার ও রূপান্তরিত হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবতা। দ্বিতীয়ত,

বাংলায় পীরদের ভাবমূর্তি শুধু ইসলামি আদর্শে প্রভাবান্বিত হয়নি। পীরদের ভাবমূর্তি লৌকিক দেবতাদের আদলে গড়ে তোলা হয়। ব্যাঘ্র দেবতা, সর্প দেবী, কুমির দেবীর মতো দেবত্ব লাভকারী প্রাণীর আত্মাকে বাংলায় পীরের ক্ষমতার সঙ্গে একীভূত করা হয়। সবশেষে, বাংলায় নিয়ত পরিবর্তনশীল অশান্ত বদ্বীপের পরিবেশে যেখানে নদীভাঙন, বন্যা, প্রলয়ংকরী ঝড়ের মতো প্রাকৃতিক রুদ্ররোষ জীবনকে অস্থিতিশীল করে রেখেছে। এই পরিবেশে পীরেরা একটি বন্ধনকারী শক্তি হিসেবে মানুষের জীবনে শান্তির প্রলেপ নিয়ে আসেন। তাই মানুষ দলে দলে স্থানীয় পীরদের অনুসরণ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

অসীম রায় যেসব বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলায় পীরদের অনন্য বলেছেন, সেসব গুণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের পীরদেরও ছিল। রায়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দুটি প্রধান দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত, বাংলায় পীরদের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের পীরদের বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে। বাংলার অধিকাংশ কিংবদন্তি পীরকে উপমহাদেশের অন্যান্য অংশেও সমভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। উত্তর ভারতের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঁচ পীরের পূজা সমভাবে জনপ্রিয়। মুসলমান বিশ্বের সর্বত্র খাজা খিজরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা হয়। বাংলায় তিনি পীর বদর নামে পরিচিত। গাজী মিয়াকে বাংলায় বিয়ে-শাদি ও সন্তান ধারণের পীর হিসেবে পূজা করা হয়। উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে গাজী মিয়াকে সমভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা হয়। বাংলায় প্রেমের পীর হচ্ছেন মনাই পীর, গরু-বাছুরের রক্ষক হচ্ছেন তিন নাথ, গ্রাম রক্ষাকারী হচ্ছেন মানিক পীর, বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন গাজী সাহেব এবং জানমালের হেফাজতকারী হচ্ছেন সত্যপীর। ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যেও একই ধরনের স্থানীয় পীরকে উপাসনা করা হয়েছে। বাঙালি মানিক পীরের পাঞ্জাবি প্রতিরূপ হচ্ছে শাখি সরওয়ার সুলতান। শেখ সাদ্দু হচ্ছেন মনাই পীরের উত্তর ভারতীয় সংস্করণ। উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুরূপ স্থানীয় পীরদের মধ্যে রয়েছে গুগ্গা পীর, পীর লালবাগ, পীর শাহতাব, পীর মিলা, পীর দিদার কাঠ বাওয়া সাহেব, পীর ইমাম জামিল ইত্যাদি। রায় মনে করছেন যে বাংলার প্রকৃতি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি নিষ্ঠুর। এ অনুমান সঠিক নয়। গরিব মানুষের জন্য পৃথিবীর সর্বত্রই প্রকৃতি নিষ্ঠুর। যেহেতু বাংলায় পীরদের প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে রক্ষাকারী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, সেহেতু তাঁরা ভারতের অন্য অঞ্চলের পীরদের থেকে ভিন্ন—এ অনুমানের কোনো ভিত্তি নেই।

দ্বিতীয়ত, রায় মনে করেন যে বাংলায় হিন্দুরা বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি, এখানে পীরদের উদ্যোগে গণধর্মান্তর ঘটেছে। গণধর্মান্তরের বিষয়টি বিশদভাবে পরীক্ষা করে মোহর আলি মনে করেন যে

বাংলায় ইসলাম ধর্মে আদৌ কোনো গণধর্মান্তর হয়নি। মোহর আলির নিম্নলিখিত বক্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।[২২] 'লক্ষণীয় যে সাহিত্য বা অন্য কোনো সূত্রে কোনো কালে বা কোনো স্থানে বড় ধরনের ধর্মান্তরের কোনো উল্লেখ নেই। উঁচু বা নিচু যেকোনো শ্রেণির মানুষের মধ্যে গণধর্মান্তরের কোনো ঘটনা যদি ঘটে থাকত, তবে তৎকালীন ঘটনাপঞ্জির দলিল বা ধর্মজীবনীতে তা অবশ্যই স্থান পেত। সে যুগের লেখকগণ তাঁদের নেতাদের ধর্মীয় সাফল্যের বর্ণনা করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন, তাই তা দলিল-দস্তাবেজে অবশ্যই স্থান করে নিত, এমন ধারণা করা যায়।' বাংলায় গণধর্মান্তর ঘটলে কোনো কোনো অঞ্চলে জনসংখ্যার প্রায় ১০০ ভাগই মুসলমান হতো। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশে (যখন ধর্মের কারণে অভিবাসন ঘটেনি) এমন গ্রাম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যা পুরোপুরি মুসলমান অধ্যুষিত। কোনো জেলাতেই হিন্দুদের জনসংখ্যা ২০ শতাংশের কম ছিল না। চতুর্দশ শতকে হজরত শাহজালাল ৭০০ ধর্মপ্রচারক নিয়ে সিলেট অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। ৫০০ বছর মুসলিম ধর্ম প্রচারকদের অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সিলেট জেলায় ১৯৩১ সালে জনসংখ্যার ৪০ শতাংশের বেশি ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। যদি গণধর্মান্তর ঘটত তবে সিলেটে জনসংখ্যার অনেক বড় অংশ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করত।

রিচার্ড এম ইটন অসীম রায়ের সঙ্গে একমত যে পীরদের প্রচেষ্টাতেই বাংলায় ইসলামের সাফল্য সম্ভব হয়েছে। তিনি অসীম রায়ের সঙ্গে একমত যে বাংলায় নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ইসলামে গণধর্মান্তর ঘটেছে। অবশ্য গণধর্মান্তরের কোনো নতুন নজির দেননি। তবে পীরদের জনপ্রিয়তার কারণ সম্পর্কে তিনি অসীম রায়ের সঙ্গে একমত নন। তিনি মনে করেন যে পূর্ব বাংলায় পীরদের জনপ্রিয়তার একটি কারণ হলো, পীররা উত্তর ভারত ও পশ্চিম বাংলার অনুর্বর অঞ্চল থেকে তাঁদের শাগরেদদের দক্ষিণ বাংলার বাদা অঞ্চলে অভিবাসনের নেতৃত্ব দিয়েছেন।[২২] তাঁর ভাষায়, 'এ অঞ্চলের পূর্বেকার ঘন জঙ্গলকে ধানখেতে রূপান্তরিত করার জন্য উন্নততর সাংগঠনিক দক্ষতা ও প্রচুর জনবলের প্রয়োজন পড়েছিল।' পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় সক্রিয় বদ্বীপ উপনিবেশ গড়ে তোলার নেতৃত্ব এসেছে পীরদের মধ্য থেকে। এসব বসতি বাইরের অভিবাসীসহ স্থানীয় জেলে সম্প্রদায় ও ভাসমান কৃষক সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে। তারা এসব নতুন বসতিতে মসজিদ নির্মাণ করে এবং মসজিদই ইসলামের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়।

ইটনের এই অভিনব ব্যাখ্যা অনুসারে বাংলায় পীরেরা শুধু আধ্যাত্মিক নেতৃত্বই দেননি, তাঁরা দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন উর্বর জমিতে তাঁদের অনুসারীদের বসতি স্থাপন করে তাদের বৈষয়িক জীবনকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাই ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলায় পীরদের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি।

ইটনের বিশ্লেষণের বিস্তারিত বিশ্লেষণ খানের *Discovery of Bangladesh* গ্রন্থে দেখা যাবে।[২৪] এখানে শুধু তিনটি বক্তব্য উপস্থাপন করাই যথেষ্ট হবে।

প্রথমত, ইটনের বক্তব্যের পক্ষে যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। জহর সরকারের ভাষায় ইটনের বক্তব্যের পক্ষে 'স্বল্প প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে।'[২৫] তিনি বলছেন যে পীরেরা ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করে তাদের শাগরেদদের নিয়ে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের বাদা ও ভাটি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছেন। কিন্তু দুই-তিনজন পীর ছাড়া অন্যদের নাম উল্লেখ করতে পারেননি। তিনি বলছেন যে পশ্চিমবঙ্গ এমনকি উত্তর ভারত থেকে পীরেরা বসতি স্থাপন করার জন্য শাগরেদদের নিয়ে এসেছেন। কোন অঞ্চল থেকে কখন পীরের নেতৃত্বে এ ধরনের অভিবাসন ঘটেছিল সে সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই।

দ্বিতীয়ত, ইটন মনে করেন যে মুসলমান পীরেরাই দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার ঘন জঙ্গলকে আবাদযোগ্য করেছেন। কোনো কোনো স্থানে মুসলমান পীরেরা কৃষির জমি সম্প্রসারণে অবদান রাখতে পারেন। তবে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষবাস মুসলমান পীরদের আগমনের অনেক আগেই শুরু হয়েছে এবং মুসলমান পীরদের অভিবাসন থেমে যাওয়ার পরও ২০ শতক পর্যন্ত চলেছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর শিলালেখে ফরিদপুর অঞ্চলকে নব্যাবশিকা বলা হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে এই অঞ্চল হলো নতুনভাবে সৃষ্ট ভূমি। এ অঞ্চলে পীরদের তদারকি ছাড়াই বসতি গড়ে উঠেছে। অনুরূপ ঊনবিংশ শতকে বরিশাল-খুলনা অঞ্চলে জঙ্গল পরিষ্কার করে উপনিবেশ স্থাপন করা হয়েছে। এ ধরনের বসতি স্থাপনের পেছনে পীর-মুরশিদদের কোনো ভূমিকা ছিল না।

তৃতীয়ত, দক্ষিণ অঞ্চলের নতুন বসতির অঞ্চল থেকে উত্তর অঞ্চলের প্রাচীন বসতির অঞ্চলে মুসলমানদের প্রাধান্য দেখা যায়। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুসারে খুলনায় জনসংখ্যায় মুসলমানদের হিস্যা ছিল ৫১.৪ শতাংশ, বাকেরগঞ্জে ৬৬.৬ শতাংশ ও নোয়াখালীতে ৭৪.১ শতাংশ। পক্ষান্তরে বগুড়ায় মুসলমানের অনুপাত ছিল ৮০.৮ শতাংশ, পাবনায় ৭২.৪ শতাংশ ও রাজশাহীতে ৭৮.৪ শতাংশ। স্পষ্টতই ইটনের তত্ত্ব অনুসারে বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহীর মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যাখ্যা করা যায় না। অন্যদিকে খুলনায় মুসলমান পীরদের কার্যকলাপ সত্ত্বেও জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হিন্দুই থেকে গিয়েছিল।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণের আলোকে বাংলায় ইসলাম প্রচার সম্পর্কে খান নিম্নলিখিত প্রবণতাসমূহ চিহ্নিত করেছেন।[২৫]

— বাংলাদেশে ইসলাম আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয়নি। ত্রয়োদশ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে একটি দীর্ঘ স্থায়ী প্রক্রিয়ায় ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। বাংলাদেশে বহিরাগত পীর-দরবেশদের কার্যাবলি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে সপ্তদশ ও সম্ভবত অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পাঁচ থেকে ছয় শ বছর ধরে ধীরে ধীরে পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রাধান্য লাভ করেছে।

— বাংলায় গণধর্মান্তর ঘটেনি। এখানে বিচ্ছিন্নভাবে ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে ধর্মান্তর ঘটেছে। তাই এখানে ধর্মান্তরের প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত প্রলম্বিত।

— বাংলাদেশে জীবিত পীরদের তুলনায় মৃত পীরদের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় জীবিত পীরদের তুলনায় মৃত পীরদের ভূমিকা কম সক্রিয় ছিল না। মৃত পীরদের কাছে মানত মেনে ফল পাওয়ায়ও অনেকে মুসলমান হয়েছেন।

— দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্রই মুসলমান পীর-দরবেশরা ধর্মপ্রচারে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু বাংলায় তাঁরা যতটুকু সফল হয়েছেন অন্যত্র তা সম্ভব হয়নি। তার প্রধান কারণ হলো বাংলায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় গ্রামসমূহ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল। যেখানে গ্রামীণ সংগঠন শক্তিশালী ছিল, সেখানে ধর্মান্তরের সুযোগ ছিল সীমিত। অধ্যাপক বেশামের মতে, শক্তিশালী গ্রামীণ সংগঠনের উপস্থিতির জন্য দক্ষিণ ভারতে হিন্দু ধর্ম টিকে থেকেছে।[২৬] অথচ বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় শক্তিশালী গ্রামীণ সংগঠন ছিল না। বাংলার পূর্ব দিকে বেশির ভাগ গ্রামীণ সংগঠন ছিল অত্যন্ত দুর্বল। যতই পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে যাওয়া যায় ততই গ্রামীণ সংগঠনের প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে থাকে। বাংলার পশ্চিম অঞ্চলে গ্রামীণ সংগঠন ছিল শক্তিশালী। তাই পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু সংখ্যাধিক্যই থেকে যায়। (বাংলাদেশে গ্রামীণ সংগঠনের অনন্যতার বিশ্লেষণ খানের *Discovery of Bangladesh* বইয়ে দেখা যাবে)। যেখানে গ্রামীণ সংগঠন দুর্বল থাকে, সেখানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রবল হয়। বাংলায় যেসব অঞ্চলে গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী ছিল না, সেখানে মানুষ তাদের পছন্দমতো ধর্ম বেছে নিয়েছে। বাংলার বাইরে অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা মুসলমান পীর-দরবেশদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় আকৃষ্ট হলেও গ্রাম থেকে বহিষ্কারের ভয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে পারেনি। ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যেকোনো ব্যক্তি পতিত হয়ে যায়। তাদের জন্য হিন্দু ধর্ম চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। মনুর অনুশাসন হচ্ছে এই যে লোকের বর্ণচ্যুতি ঘটে তার সঙ্গে কথা বলা এমন কি ওঠা-বসাও উচিত নয়; উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তাকে দেওয়া যাবে না, সাধারণভাবে তার সঙ্গে কোনো সম্পর্কও রাখা চলবে না। আরও বলা হয়েছে যে কোনো লোক যদি পতিত কোনো লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তবু সে পতিত বলে গণ্য হবে। বর্ণচ্যুতির শাস্তি শুধু বর্তমান জন্মেই সীমিত নয়, আগামী সাত জন্ম পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। তাই ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে পূর্বতন লোক ধর্মে বিশ্বাস সত্ত্বেও হিন্দু ধর্মে প্রত্যাবর্তন সম্ভব ছিল না।

পীরদের প্রাধান্যের ফলে মধ্য যুগের বাংলায় সুফিবাদ মুসলমানদের গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। বাংলায় প্রধানত সাতটি ঘরানার সুফি মতবাদ দেখা যায়। এই ঘরানাগুলো হচ্ছে : ১. সোহরাওয়ার্দী, ২. চিশতি, ৩. কলন্দরিয়া, ৪. মাদারিয়া, ৫. আদহামিয়া, ৬. নক্সবন্দি ও ৭. কাদেরিয়া। তবে এ সাতটি ঘরানার মধ্যে বাংলাদেশের ধর্মীয় জীবনে ফলন্দরি, মাদারি ও অদহমী সম্প্রদায়ভুক্ত সুফিরা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল। এই সুফি মতবাদসমূহ পশ্চিম এশিয়া থেকে উত্তর ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলায় আসে। সুফি মতবাদের সঙ্গে তান্ত্রিক, মরমিয়া ও যোগ সাধনে বিশ্বাসী সাধকদের বিশ্বাস ও আচরণের সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে। তাই সুফিবাদ সহজেই স্থানীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়।

ইসলাম ধর্মে দীক্ষা স্থানীয় মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের ওপর কী প্রভাব এনেছে সে সম্পর্কেও বিতর্ক রয়েছে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মুসলমানেরা লোকধর্মের (folk religion) বিশ্বাস ও আচার-আচরণ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেনি। তাই তারা প্রথম দিকে নামমাত্র মুসলমান ছিল। পরবর্তীকালে এরা মৌলবাদী আন্দোলনের ভেতর দিয়ে আপসহীন মুসলমানে পরিণত হয়। এ মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন অসীম রায়[২৭] ও রিচার্ড এম ইটন।[২৮] এ কথা সত্য যে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়ে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের ওপর লোকধর্মের দেবদেবতা বা বিশ্বাসের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তবু রায় ও ইটনের তত্ত্বের দুটি প্রধান দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত, বাংলার সব মুসলমান একই ধরনের জীবন ধারণ করেনি। অনেকে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকেই ইসলাম নির্দেশিত জীবন যাপন করেছে। বহিরাগত মুসলমানেরা এ ধরনের জীবন যাপন করত। ষোড়শ শতকে মুকুন্দরাম এ ধরনের মুসলমানদের জীবনযাত্রার নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন।[২৯]

ফজর সময়ে উঠি বিছাই লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ
সোলেমানী মালা ধরে জপে পীর পেগম্বরে
পিরের মোকামে দেই সাঁজ
দশ বিশ বিয়াদবে বসি আ বিচার হবে
অনুক্ষণ পড়য়ে কোরান
বেসাইআ কেহ হাট পিরের সিরনি বাটে
সাঁজে বাজে দগড়ি নিসান।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম গ্রহণ করা দূরের কথা, মুসলমানদের সঙ্গে চলাফেরা করলেই হিন্দুরা জাতিচ্যুত হতো। কাজেই ধর্মান্তরিত মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। তবু বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের দিক থেকে বৈষ্ণববাদ এবং সুফিবাদ অতি কাছাকাছি চলে আসে। ডক্টর এনামুল হকের ভাষায় :

'...গোড়ীয় বৈষ্ণবদের এই "নামে রুচি জীবে দয়া" মুসলিম সুফি সাধকদের "জিকর" ও "খিদমৎ" নীতির নামান্তর... "কীর্তন" ও "সমা" এবং "দশা" ও "হাল" শব্দার্থ ভাব, সম্পাদনা ব্যবস্থা ও মানবিক অনুভূতির দিক হইতে একই বস্তুর অভিব্যক্তি। বিশেষত গোড়ীয় বৈষ্ণবদের "প্রেম", সুফিদের "ইশক" "রাধা-কৃষ্ণ" সুফীদের "সাকী" ও "বুৎ" কিংবা শমআ ও পরওয়ানা, ঐশ্বর্য সুফিদের কিয়ামত ছাড়া কিছুই নহে। সুফিদের "গজলিয়াত" ও বৈষ্ণবদের "পদাবলী" ভাব ও রচনা উভয় হইতে অনেকখানি এক। সুফি সাহিত্যের "মৈয়" ও "শরাব", বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেম ও পীরিতি হইয়া দেখা দিয়াছে। সুফি সাহিত্যের "আশিক ও মাসুক" বৈষ্ণব পদাবলীর "রাধা ও কৃষ্ণ"। এই সাহিত্যের "হিজরান" ও "বিশাল" বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহ ও মিলন।'[৩০]

এত সাদৃশ্য সত্ত্বেও বৈষ্ণববাদ ও সুফিবাদের দুটি ধারা সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছে কিন্তু কখনো একত্র হয়নি। এর কারণ ছিল দুটি। প্রথমত, বাংলার সুফি সাধকেরা মুসলমান শাসনের বড় সমর্থক ছিলেন। তাঁরা সুন্নি মুসলমান শাসকদের রাষ্ট্র পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করেননি। হয়তো তাঁরা মনে করতেন যে মুসলমান শাসনের ছত্রচ্ছায়া ছাড়া হিন্দু সমাজপতিরা তাঁদের মতবাদ উচ্ছেদ করবেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাই সুফিবাদ সুন্নি শাসনকে দৃঢ়তর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছে। অন্যদিকে বৈষ্ণবদের পক্ষ থেকে সুফিবাদে প্রভাবান্বিত স্থানীয় মুসলমানদের বৈষ্ণববাদে অঙ্গীভূত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বৈষ্ণবরাও মুসলমানদের পতিত গণ্য করত।

সুন্নি শাসকদের প্রাধান্য সত্ত্বেও সপ্তদশ শতকে বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে ইরানের শিয়াদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। শের শাহ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ষোড়শ শতকে মোগল সম্রাট হুমায়ুন ইরানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি যখন বিজয়ীর বেশে ভারতে ফেরেন তখন তাঁর সঙ্গে ইরানি শিয়া সৈন্যরা ভারতে প্রবেশ করেন। শিয়ারা মোগল শাসনযন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়। সপ্তদশ শতকে বাংলায় অনেক রাজপুরুষ ছিলেন শিয়াধর্মাবলম্বী। অনেক শিয়া ব্যবসায়ী ও ইরানে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে পরাভূত রাজপুরুষেরা বাংলার শহর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তবে বাংলার মোট মুসলিম জনসংখ্যায় এসব নগরবাসী শিয়াদের হিস্সা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। রাজনৈতিক দিক থেকে অষ্টাদশ শতকে তারা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করলেও, সপ্তদশ শতকে বাংলায় শিয়াদের রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল সীমিত। তবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শিয়াদের প্রভাব অনুভূত হয়। শিয়াদের উদ্যোগে মহররম বাংলার মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। উপরন্তু কারবালার মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডি মুসলমান সাহিত্যিকদের চিন্তা ও চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে। বাংলা ভাষায় মর্সিয়া সাহিত্যের

আত্মপ্রকাশ ঘটে।' মকতুল হুসৈন, 'কারবালা', 'জঙ্গনামা', 'মহরম পর্ব' ইত্যাদি শিরোনামে মোগল শাসনামলে কারবালার বিয়োগান্ত নাটক বাংলা ভাষায় প্রচারিত হয়। এমনকি *মনসামঙ্গল* কাব্যে হাসান ও হোসেন নামে চরিত্র দেখা যায়।[৩১]

সপ্তদশ শতকে বাংলায় হিন্দু ধর্মের বিবর্তন

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে বাংলাদেশে শাক্ত ধর্মের প্রাধান্য দেওয়া যায়।[৩২] শাক্ত ধর্মের পাশাপাশি বাংলায় তান্ত্রিক ধর্মের বিকাশ ঘটে। শাক্ত ও তান্ত্রিক মতবাদই হলো বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ধর্মের মূল ভিত্তি। বৈষ্ণব আন্দোলনের মতো জনপ্রিয় আন্দোলনও শাক্ত-তান্ত্রিক ধর্মের পথ থেকে অধিকাংশ বাঙালিকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

বাংলায় শাক্ত-তান্ত্রিক ধর্মের ক্ষেত্রে সপ্তদশ শতকে কোনো বড় ধরনের ঘটনা ঘটেনি। তবু শাক্ত-তান্ত্রিক হিন্দুদের ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে দুটি প্রবণতা দেখা যায়। প্রথমত, শাক্ত-তান্ত্রিক হিন্দুদের মধ্যে পশ্বাচার সম্প্রদায়ের প্রাধান্য হ্রাস পায় এবং কুলাচার সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। পশ্বাচার সম্প্রদায় সব দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই সম্প্রদায়ের মূল বিশেষত্ব হলো এই যে তারা গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে ও তার কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করে। কুলাচার সম্প্রদায় গুরুবাদে বিশ্বাস করলেও এরা তিন ধরনের শক্তি বা প্রকৃতিতে বিশ্বাস করে। একটি শক্তি শরীরে গুহ্য রয়েছে। একটি শক্তি বর্ণে বিভাসিত এবং আরেকটি শক্তি রয়েছে নারীতে। এরা পশ্বাচার সম্প্রদায়ের মতো সাত্ত্বিক সাধনায় বিশ্বাসী নয়। পঞ্চমকার বা মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুনকে এরা সাধনার অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করে। ক্রমে শাক্ত-কুলাচার যৌন অনাচারের বাহন হয়ে দাঁড়ায়। বর্ণ প্রথা সম্পর্কেও পশ্বাচার ও কুলাচার সম্প্রদায়ের মতভেদ ছিল। কুলাচার মতবাদ বিশ্বাস করত যে কুলাচার পালন করলে একজন শূদ্রও ব্রাহ্মণের মর্যাদা অর্জন করতে পারে। এঁরা বিশ্বাস করতেন যে কুলাচার নির্ধারিত পথ অনুসরণ করলে নিম্নবর্ণের ব্যক্তিরাও দেবত্ব অর্জন করবে। পক্ষান্তরে পশ্বাচার বর্ণপ্রথাকে অমোঘ বিধান হিসেবে মেনে নেয়।

দ্বিতীয়ত, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে শাক্ত-তন্ত্রের অনুসারী পণ্ডিতরা তাঁদের ধর্মমত সমর্থনে গ্রন্থ রচনা করেন। পুরানন্দ পরমহংস পরিব্রাজিকা ষোড়শ শতকের শেষ দিকে তান্ত্রিক ধর্মমত ব্যাখ্যা করে বই লেখেন। এ ছাড়া মহাদেব বিদ্যাবাগীশ *আনন্দ লহরী* শীর্ষক বইটি লেখেন ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে এবং *শারদ তিলক* শিরোনামে আরেকটি বই লেখেন ১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দে। তবে এসব গ্রন্থে শাক্ত-তান্ত্রিক মতবাদের কোনো নতুন ব্যাখ্যা বা দর্শন নেই। সামগ্রিকভাবে এসব লেখক প্রচলিত মতেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

সপ্তদশ শতকে শাক্ত-তন্ত্রের অনুসারীদের মধ্যে কুলাচারের জনপ্রিয়তা বাড়ে। অষ্টাদশ শতকে এই সম্প্রদায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তপন রায় চৌধুরী মনে করেন যে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশে কুলাচার সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি ঘটে।[৩৩]

সপ্তদশ শতকে বাংলায় হিন্দুদের ধর্মের জগতে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণববাদের বিবর্তন ও অবক্ষয়। বৈষ্ণববাদ শ্রীচৈতন্য আবিষ্কার করেননি। ভক্তি আন্দোলনের উৎস হিন্দু ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত। তবু বাংলাদেশে ভক্তি আন্দোলনে প্রাণসঞ্চার করেন শ্রীচৈতন্য দেব (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)। চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের আগে বাংলাদেশে হিন্দু ধর্ম রঘুনন্দনের মতো শাস্ত্রকারদের প্রভাবে নিছক আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। বর্ণব্যবস্থা মানুষের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তোলে। অন্যদিকে বহিরাগত ইসলাম ধর্ম বাংলায় জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে আকৃষ্ট করে। এই পরিস্থিতিতে শ্রীচৈতন্য দেব একই সঙ্গে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও ইসলামের প্রভাব প্রতিহত করার উদ্যোগ নেন। শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত বৈষ্ণববাদের মূল বিশেষত্ব ছিল নিম্নরূপ :

ভক্তির প্রাধান্য। শ্রীচৈতন্যের আগে ধর্ম পালনে শাস্ত্রভিত্তিক জ্ঞান ও আচার অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য দেওয়া হতো। শ্রীচৈতন্যের বক্তব্য হলো, জ্ঞান নয় ভক্তিই মুক্তির একমাত্র উপায়। তাই মুক্তির জন্য ভক্তের ব্যক্তিগত নিষ্ঠাই যথেষ্ট, মধ্যবর্তী কোনো পুরোহিত বা ব্রাহ্মণের প্রয়োজন নেই। মুক্তির জন্য প্রয়োজন অষ্টপ্রহর কৃষ্ণের নামকীর্তন। কীর্তনের মধ্যে কৃষ্ণ ও ভক্তের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রেমের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।

জাতিভেদ প্রত্যাখ্যান। শ্রীচৈতন্য বর্ণব্যবস্থাভিত্তিক জাতিভেদ প্রত্যাখ্যান করেন। নিম্নবর্ণের লোকদের উচ্ছিষ্ট খাওয়ার জন্য তিনি এক শিষ্যকে সাধুবাদ জানান। কথিত আছে যে যবন হরিদাসের মৃত্যুকালে তিনি সমবেত ব্রাহ্মণদের হরিদাসের পাদোদক পান করিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'মোর জাতি—মোর সেবকের জাতি নাই।' শ্রীচৈতন্যের ব্রাহ্মণবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে বিদ্রূপ করে রক্ষণশীল সমাজ তাই বলত 'সব অ-বিধি নদের বিধি।'

শ্রীচৈতন্যের মহাপ্রয়াণের পর বৈষ্ণবধর্ম বিস্তৃতি লাভ করলেও এর মধ্যে বড় ধরনের গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। এসব পরিবর্তনের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রবণতাসমূহ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

শ্রীচৈতন্য ও তাহার প্রধান অনুচরদের দেবত্ব আরোপ। শ্রীচৈতন্য নিজে কখনো দেবত্ব দাবি করেননি এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তদের মধ্যে কোনো মধ্যবর্তীর ভূমিকা স্বীকার করেননি। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে কয়েক দশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে অবতারের মর্যাদা দেওয়া হয়। শ্রীচৈতন্যকে বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন এক

কিংবদন্তির দেবতা হিসেবে গড়ে তোলা হয়। কঠোর কৃচ্ছসাধনায় অনাহারে শ্রীচৈতন্যের দেহ অস্থিচর্ম সার হয়ে উঠেছিল। বিদ্রূপ করে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'কৃষ্ণ নগরের কুমাররা তাহার যে মূর্তি প্রস্তুত করে, তাহাতে চৈতন্যদেব গোসাঁইদের মত নধর কান্তি ভুঁড়িটি অগ্রগণ্য, তৈলে ঘৃতে মাখনে পুষ্ট দেহ।'[৩৪] শ্রীচৈতন্যকে বিষ্ণুর অবতারের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে বৈষ্ণব ধর্মের গোঁসাইরা নিজেরাও দেবত্ব দাবি করে ও ভক্তদের তাদের পূজা করতে বাধ্য করে। চৈতন্যের প্রধান সঙ্গীদের প্রত্যেকেই রাধাকৃষ্ণ লীলাসংক্রান্ত দ্বাপর যুগের শ্রীকৃষ্ণের কোনো সঙ্গীর অবতার রূপে কীর্তিত হলেন। নিত্যানন্দ চিহ্নিত হলেন বলরাম, অদ্বৈতকে বলা হলো সদাশিবের অবতারকেশব, ভারতীকে বলা হলো শ্রীকৃষ্ণের গুরু সন্দীপনী মুনি। আবার শ্রীচৈতন্যের কোনো কোনো সঙ্গীকে কৃষ্ণলীলায় নারী চরিত্রের অবতাররূপে কল্পনা করা হয়েছে। নরহরি দাস হলেন মধুমালতী, রামানন্দ, বিশাখা রূপ—শ্রীরূপ মঞ্জুরি, সনাতন, লবঙ্গ মঞ্জুরী ইত্যাদি। এরা ভক্তদের ও আরাধ্য দেবতার মধ্যে নতুন মধ্যবর্তী শ্রেণির সৃষ্টি করে ভক্তির মূল চেতনাকেই দুর্বল করে দেয়।

জাতিভেদের প্রত্যাবর্তন। নব্য বৈষ্ণববাদে জাতিভেদকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। দুইটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাতিভেদ বৈষ্ণব ধর্মে ফিরে আসে। প্রথমত, রক্ষণশীল সমাজের পক্ষ থেকে বৈষ্ণবদের একঘরে করা হয়। রক্ষণশীল সমাজকে অগ্রাহ্য করলে হিন্দু সমাজে অচল হয়ে পড়বে। এই ভয়ে অনেক বৈষ্ণব ভক্তই জাতিভেদ মেনে নিতে বাধ্য হন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের বংশধরেরা বহু চেষ্টা করে ও বহু অর্থ ব্যয় করে খড়দহ ও শান্তিপুর অঞ্চলে ব্রাহ্মণকুলীনদের সঙ্গে আদান-প্রদান সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। দ্বিতীয়ত, যেখানে বৈষ্ণবরা শক্তিশালী ছিল সেখানে রক্ষণশীল হিন্দুরা বৈষ্ণব নেতাদেরই ব্রাহ্মণের মর্যাদা দান করেন। উদাহরণস্বরূপ নরোত্তমের উদাহরণ স্মরণ করা যেতে পারে। নরোত্তম ব্রাহ্মণবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। বৈষ্ণবরা এক বিরাট জনসভা করে নরোত্তমকে খাঁটি ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করে। তবে বৈষ্ণবদের এই বিদ্রোহ ছিল সীমিত। এরা আন্তবর্ণের বিবাহ প্রচলন করতে পারেনি। এমনকি ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা একসঙ্গে আহার করত না। যদিও চৈতন্য দেব জনগণের মুখের ভাষায় ধর্ম প্রচার করেছেন তবু তার শিষ্যরা সংস্কৃত ভাষায় তাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। আদর্শগতভাবে জাতিভেদ অস্বীকার করলেও বৈষ্ণববাদ সনাতন হিন্দু সামাজিক বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর পর বৈষ্ণববাদ বিভিন্ন শাখা ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বৈষ্ণববাদের দুটি প্রধান ভৌগোলিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বাংলার বাইরে বৃন্দাবনে ছয়জন গোস্বামী নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। গৌড়ে বৈষ্ণবদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দত্ত ও শ্যামানন্দ। তবে মূল বিভাজন ঘটে তাত্ত্বিক প্রশ্নে।

এই তাত্ত্বিক বিতর্কের মূল প্রশ্ন ছিল কৃষ্ণের মনে রাধা ও অন্যান্য গোস্বামীদের প্রেম ও দৈহিক সম্পর্কে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে। এই প্রশ্নে বৈষ্ণবরা স্বকীয়া ও পরকীয়া দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। স্বকীয়া মতবাদের প্রবক্তারা মনে করতেন যে রাধা ও কৃষ্ণের অন্যান্য গোপিনী প্রেমিকাদের সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে হয়েছিল। তবে যোগমায়ার বলে তাদের স্বামীরা তা বুঝতে পারেনি। পরকীয়া মতবাদের সমর্থকেরা মনে করেন যে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা ও গোপিনীদের সম্পর্ক ছিল বিবাহবহির্ভূত।

পরকীয়া ব্যাখ্যার সমর্থকেরা বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত সহজিয়া সাধনা ও তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান মিলিয়ে বৈষ্ণব সহজিয়া ধারা গড়ে তোলেন। এ মতের প্রবক্তারা নিজেদের কৃষ্ণের লীলা সঙ্গিনী গোপিনী হিসেবে কল্পনা করত এবং নরহরি সরকারের মতো অনেক পুরুষ নারীসুলভ জীবন ধারণ করত। ভক্তিবাদের সহজিয়া ধারায় বিভিন্ন ধরনের যৌন বিকৃতি ও অনাচার দেখা দেয়। সপ্তদশ শতকে সহজিয়া বৈষ্ণববাদ, মুসলিম সুফিবাদ ও শাক্ত-তান্ত্রিকদের কুলাচার আচার-আচরণ ও বিশ্বাসের দিক অনেক ক্ষেত্রেই খুবই কাছাকাছি চলে আসে। সাধক কবি আলি রাজা (১৬৯৫-১৭৮০) যিনি সপ্তদশ শতকে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ছিলেন পরকীয়া মতের সমর্থক। তিনি লিখেছেন,[৩৫]

'স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস
পরকীয়ার সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস।'
(বিবাহিতা নারীর প্রেমে অত্যধিক প্রেম রস নাই, পরস্ত্রী প্রেমিক মনের যোগ্য।)

আলি রাজার রচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে মুসলিম সুফি সাধকেরাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহজিয়াভাব ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বাংলায় সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ, শৈব এবং বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধারণার সংমিশ্রণে নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠীতে নতুন নতুন সাধনার বিকাশ ঘটে। এসব সমন্বয়বাদী ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কর্তাভজা সম্প্রদায় ও বাউল সম্প্রদায়। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আওল চাঁদ (১৬৮৬-১৭৭৬) সপ্তদশ শতকে সক্রিয় ছিলেন। বাউল সম্প্রদায় অবশ্য অনেক পুরোনো। পঞ্চদশ শতকে শাহ মোহাম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জোলেখা* গ্রন্থে বাউল শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। তবে এসব মতবাদ মূল জনগোষ্ঠীকে প্রভাবান্বিত করেনি। বাউল ও কর্তাভজা মতবাদ বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে।

সামগ্রিকভাবে বৈষ্ণব আন্দোলন ধর্মের ক্ষেত্রে বাংলার মানুষকে একত্র করতে পারেনি। রক্ষণশীল হিন্দুরা শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত কীর্তনের বিরোধিতা করে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে,[৩৬]

'হেন কালে পাষণ্ডী পাঁচ সাত অইল
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাত্রি
যে কীর্তন প্রবর্তাইল কভু শুনি নাই।
****
কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ বার বার
এই পাপে নব দ্বীপ হইবে উজাড়।'

রক্ষণশীল হিন্দুরা মনে করত যে বৈষ্ণববাদ হিন্দু ধর্মের অপূরণীয় ক্ষতি করছে। অন্যদিকে বৈষ্ণব সাহিত্যে শাক্তদের পাষণ্ড বলে আখ্যায়িত করা হতো। বৈষ্ণব সাহিত্যে পাষণ্ডদের যৌন অনাচার ও মদ্যপানের নিন্দা করা হয়। ইসলামের সঙ্গে বৈষ্ণবদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তপন রায় চৌধুরী যথার্থই লিখেছেন, As regards their attiude to Islam, it was one of contempt, if not of positive hostility'[৩৭] ইসলামের প্রতি তাঁদের (বৈষ্ণবদের) দৃষ্টিভঙ্গি অবিসংবাদিত বৈরিতা না থাকলেও অবজ্ঞা ছিল। কৃষ্ণ দাস কবিরাজ (জন্ম ১৫৯৭) রচিত *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে* ইসলাম সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যের উক্তি উদ্ধৃত করে বিদ্বেষমূলক ও ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করা হয়েছে।

হরিদাস কলিকালে যবন অপার
গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে অতি দুরাচর ॥
ইহা সবার কোনো মতে হইবে নিস্তার
তাহার হেতু না দেখিয়ে, এ দুঃখ সবার
হরিদাস কহে, প্রভু চিন্তা না করিহ
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ ॥
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
হারাম হারাম বোল কহে নামাভাসে।[৩৮]

(ভাবার্থ: শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে বলিলেন, অসংখ্য যবন (মুসলমান) ব্রাহ্মণদের হিংসা করে, গো হত্যা করে এবং তারা দুরাচার। এদের সবার শাস্তি থেকে নিস্তার নেই এবং এ জন্য শ্রীচৈতন্য উদ্বিগ্ন। জবাবে হরিদাস বলিলেন যে মুসলমানদের মুক্তি নিয়ে চিন্তার কারণ নেই। কারণ তাহারা ঘন ঘন হারাম (যাহা শুনিতে হায়-রামের মতো শোনায়) জপিতেছে। কাজেই রামের নাম জপ করিয়া তাহারাও মুক্তি লাভ করিবে।)

উপরের বাংলা উদ্বৃতিতে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ব্যক্ত করা হলেও শেষে হারাম শব্দের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি ঔদার্য প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলা শ্লোকটির শেষে ইসলামবিদ্বেষী একটি তথাকথিত পুরাণের শ্লোক কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের মুখে যোগ করেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ মনে করেন যে তথাকথিত পুরাণের শ্লোকটি জাল।[৩৯]

ইসলামের প্রতি অনুরূপ অবজ্ঞা জয়ানন্দ ও ঈশান নাগরের রচনায়ও দেখা যায়। পক্ষান্তরে মুমিন মুসলমানেরাও কাফেরদের ঘৃণা করত। এই বিদ্বেষ ও ঘৃণার পরিবেশে ধর্মের ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী ধারা কখনো প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি।

অবৈদিক ধর্মীয় বিশ্বাসের হিন্দু ধর্মের মূলধারায় স্বীকৃতি

বাংলার হিন্দুরা শুধু শিব ও বিষ্ণুর মতো বৈদিক দেবতা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না। বাংলার লোকধর্মে অবৈদিক দেবতারাও একটি বড় অংশজুড়ে রয়েছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ধর্ম ঠাকুর, মনসা, চণ্ডী, ষষ্ঠী, পঞ্চানন্দ ঠাকুর ও ঘাট কর্ম ইত্যাদি। এঁদের অনেকের ভক্তসংখ্যা এত বেশি ছিল যে তাদের সবাইকে সনাতন হিন্দু ধর্মের বাইরে রাখা সম্ভব ছিল না। ষোড়শ শতকের প্রখ্যাত বাঙালি শাস্ত্রকার রঘুনন্দন বেশ কয়েকজন অবৈদিক দেবতাকে স্বীকার করে নেন। তাঁর গ্রন্থে মনসা, ঘণ্টাকর্ম, শীতলা দেবী, মঙ্গল চণ্ডিকা ও সুতিকা ষষ্ঠিকার পূজার বর্ণনা রয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের ও পীরের পাঁচালির প্রাচুর্য এসব দেবদেবীর অবিসংবাদিত জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর। যেসব দেবদেবীর কর্মকাণ্ড ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে দৈহিক ও মানসিক মঙ্গল হয়, তাহাকেই মঙ্গলকাব্য বলে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ নিম্নলিখিত ১৬ প্রকারের মঙ্গলকাব্য চিহ্নিত করেছেন। *মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল, ধর্ম মঙ্গল, কালিকা মঙ্গল, বাসুলী মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল, ষষ্ঠী মঙ্গল, সারদা মঙ্গল, সূর্য মঙ্গল, রায় মঙ্গল, বরদা মঙ্গল, গোসানী মঙ্গল, লক্ষ্মী মঙ্গল, গঙ্গা মঙ্গল, কপিলা মঙ্গল ও পীর মঙ্গল*। এসব মঙ্গলকাব্য প্রধানত ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী সময়কালে রচিত হয়। তবে পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে ও ষোড়শ শতকে বেশি মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। মধ্যযুগের বাংলায় *মনসা* ও *চণ্ডীর* মতো মঙ্গলকাব্যের অনেক দেবতাই সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেন।

সপ্তদশ শতকের একটি বড় পরিবর্তন হলো, রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম ঠাকুর হিন্দু ধর্মের মূল ধারায় বৈদিক দেবদেবীদের মতো মর্যাদা অর্জন করেন। জহর সরকারের মতে, ১৫৯০ থেকে ১৬৬০ পর্যন্ত সময়কালে বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদেনীপুর অঞ্চলের অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী ও আদিবাসীরা হিন্দু হিসেবে গৃহীত হয়। এরা ছিল মূলত ধর্ম ঠাকুরের পূজারি। সুকুমার সেন মনে করেন যে 'ধর্ম ঠাকুরের পূজায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান সব ধর্মেরই অনুষ্ঠান অল্প-বিস্তর নেওয়া হইয়াছে।' মূলত দক্ষিণ রাঢ়ের নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্ম ঠাকুরের পূজা করতেন। দুটি কারণে ধর্ম ঠাকুরের উপাসকদের হিন্দু ধর্মের মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথমত, বাংলার পূর্বাঞ্চলে ইসলামের অভূতপূর্ব সাফল্যে আতঙ্কিত হয়ে, রাঢ় অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা ধর্ম ঠাকুরের উপাসকদের হিন্দু ধর্মে অঙ্গীভূত করার উদ্যোগ নেন। দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ব্রাহ্মণদের যথেষ্টসংখ্যক যজমানের অভাবে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। কাজেই গ্রামীণ দরিদ্র ব্রাহ্মণেরা রাঢ় অঞ্চলের ধর্ম

ঠাকুরের উপাসকদের হিন্দু ধর্মের কাছে গ্রহণযোগ্য করার উদ্যোগ নেন।

জহর সরকারের মতে, রাঢ় অঞ্চলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিজে নিজে গড়ে ওঠেনি।[৪০] রাঢ় অঞ্চলে হিন্দু ধর্মের প্রচারের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। তাঁর মতে, পঞ্চদশ/ ষোড়শ শতক থেকে রাঢ় অঞ্চলে দুটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবণতা দেখা দেয়। প্রথমত, মৎস্যজীবী, শিকারি ও অন্যান্য অকৃষি কাজে নিয়োজিত বর্ণের ব্যক্তিরা সার্বক্ষণিক চাষবাসের কাজ শুরু করে। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে peasantization বা কৃষি পেশায় উত্তরণ। রাঢ় অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহ (কৈবর্ত সদগোণ, পোদ, চণ্ডাল, ডোম) পূর্ণকালীন কৃষিকাজ শুরু করলে তারা উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা দাবি করে। তার ফলে বিংশ শতাব্দীর আদমশুমারিসমূহে মাহিষ্য শ্রেণির (যারা ছিল কৃষক) জনসংখ্যা রাঢ় অঞ্চলে দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি সমাজতত্ত্বে sanskritization বা সংস্কৃতায়ন নামে পরিচিত।[৪১] সমাজতত্ত্ববিদ শ্রীনিবাসন হিন্দুদের মধ্যে এ প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করেছেন। শ্রীনিবাস দেখিয়েছেন যে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যখন আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করে, তখন তারা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে নিজেদের বর্ণগত মর্যাদা বাড়িয়ে তোলে।[৪২] বাংলার রাঢ় অঞ্চলেরও অকৃষি (যথা—মৎস্যজীবী, শিকারি, যাযাবর) জনগোষ্ঠীসমূহে পূর্ণকালীন কৃষিকাজে নিয়োজিত হওয়ার পর উচ্চবর্ণের মর্যাদা লাভ করে। তবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় রাঢ় অঞ্চলের সংস্কৃতায়ন কিছুটা ভিন্ন। এখানে অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীতে (যাদের মোটামুটিভাবে বেশির ভাগ নিম্নবর্ণের ছিল) হিন্দু ধর্মে অঙ্গীভূত করার উদ্যোগ নেন গ্রামের পুরোহিতরা। পশ্চিম বাংলায় সংস্কৃতায়ন-প্রক্রিয়ায় শুধু অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীকেই উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা দেওয়াতে সীমাবদ্ধ ছিল না। এখানে অবৈদিক দেবদেবীকে হিন্দু ধর্মের দেবদেবীর মর্যাদা দেওয়া হয়। বিপুলসংখ্যক অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী সামাজিকভাবে ও আদর্শগতভাবে হিন্দু সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়।

জহর সরকারের এ তত্ত্ব পশ্চিম বাংলায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে একটি নতুন দিক তুলে ধরেছে। তবে এই তত্ত্বের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তপন রায় চৌধুরী যথার্থই লিখেছেন, "জহর সরকার তার নাতিদীর্ঘ নিবন্ধে সব প্রশ্নের জবাব দেন নি, সব তথ্যের তথ্য-ভিত্তি প্রকাশ করেননি, যা দিয়েছেন তা তার অসাধারণ বিশ্লেষণ শক্তি এবং বহু বিষয়ে জ্ঞানের পরিচয়।" এই অনুমানটি নিয়ে আরও গবেষণার অবকাশ রয়েছে।[৪৩]

উপসংহার

মধ্যযুগের বাংলায় ধর্ম ছিল সমাজজীবনের একটি চালিকাশক্তি। তবে বাংলায় কোনো ধর্মীয় ঐক্য ছিল না। এখানে অনেক ধর্ম, সম্প্রদায় ও তন্ত্র একই সঙ্গে

বিকশিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকে বাংলায় ধর্মের জগতে কোনো নাটকীয় ঘটনা ঘটেনি। তবু নেপথ্যে এ অঞ্চলে আস্তে আস্তে অনেক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা গেছে।

ধর্মীয় বিশ্বাসের জগতে একই সঙ্গে বিভক্তি ও সমন্বয়ের প্রবণতা দেখা যায়। প্রথম বিভক্তি দেখা দেয় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে। আবার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ভেতরেও বিভক্তি ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বৈষ্ণব ধর্ম বাংলার হিন্দুদের একত্র করেনি। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু শাক্ত-তান্ত্রিক মতবাদ অনুসরণ করে। আবার শাক্ত-তান্ত্রিক মতাবলম্বীরা ও বৈষ্ণবরা নিজেরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে সমন্বয়বাদের প্রবণতা দেখা দেয়। মুসলিম সুফি, বৈষ্ণব সহজিয়া ও শাক্তদের কুলাচারের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সময়ে কর্তাভজা সম্প্রদায় বাউল সম্প্রদায় এই সমন্বয়ের ধারাকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। অবৈদিক দেবতারা হিন্দু ধর্মে স্বীকৃতি লাভ করে। এসব পরিবর্তন সত্ত্বেও ধর্মীয় সংঘাত দূরীভূত হয়নি। হিন্দুরা মুসলমানদের 'ম্লেচ্ছ' ও 'যবন' নামে আখ্যায়িত করতা আর মুসলমানেরা হিন্দুদের কাফের বলে গণ্য করত। হিন্দু ও মুসলমানেরা নিজেরাও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল এবং এ সম্প্রদায়সমূহ একে অপরের বিরোধিতা করত।

ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলার অধিবাসীরা ভৌগোলিকভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্ব ও উত্তর অঞ্চলে দেখা যায় ইসলামের প্রাধান্য। পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলের পূর্বভাগে দেখা যায় হিন্দু ধর্মের শাক্ত ও বৈষ্ণবমতের প্রাধান্য। রাঢ় অঞ্চলের দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগে অবৈদিক দেবদেবীর পূজারিরা সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়। সপ্তদশ শতকে এই বিভক্তিসমূহ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই বিভক্তিসমূহই বিংশ শতকে রাজনৈতিক বিভক্তির ইন্ধন জোগায়।

তবে ধর্মের ক্ষেত্রে এসব বিভক্তি সবটুকুই লোকসান নয়। এসব বিভক্তির ফলেই মানুষ তাদের পছন্দমতো ধর্ম বেছে নিতে পেরেছিল। কবি মনোহর দাস (ষোড়শ/ সপ্তদশ খ্রিষ্টাব্দ) যথার্থই লিখেছেন,[৪৪]

'নানা শাস্ত্র নানা ধর্ম আছয়ে সংসারে
মোর শক্তি নাহি হয় এসব আচারে।
আমি কোন ছার ধর্ম আচরণ করি
থাকুক ধর্মের দায় মর্ম বুঝিতে নারি।
ধর্ম যারে বলে তিনি ব্রাহ্মণ্ড বেড়িয়া
স্থাবর জঙ্গম আদি দেখ বিচরিয়া।
হৃদয়ে উদয় যেই সেই কার্য সার
তাহা বিন অন্য ধর্মকর্ম কিবা সার।'

'হৃদয়ে উদয়ে যেই' সেই কাজকেই সার করে বাঙালি তার ধর্ম পালন করেছে। ধর্মের ক্ষেত্রে বাঙালি সব সময়েই হৃদয়কে অনুসরণ করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier*, Delhi: Oxfrord University Press, 1994, P. 153.

২. Tapan Ray Chaudhuri, *Bengal under Akbar and Gahangir*, Delhi, Munshiram, Monoharlal, 1969, P. 135.

৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : কামিনী প্রকাশনালয়, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৩৪০।

৪. এই বিতর্ক সম্পর্কে দেখুন Akbar Ali Khan *Discovery of Bangladesh: Explorations into Dynamics or a Hidder Nation*, Dhaka; University Press Limited, 2001, P. 83-89.

৫. Albert Hourani, *A History of the Arab Peoples*, New York, Boston; Warner Books 1991, P. 46-47.

৬. Will Durant, *Our Oriental Heritage*, New York: Simon and Schuster, 1963, P. 503.

৭. Ibn Batuta, *Travels in Asia and Africa* 1325-1354, Tranaslated by H. A. R. Gibb, New York: Augustus M. Kelly, 1969, P. 257.

৮. উদ্ধৃত, সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসে দুশ বছর*, কলকাতা : ভারতী বুক স্টল, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪৬।

৯. Akbar Ali Khan, *Discovery of Bangladesh*, Dhaka: University Press Ltd. 1996.

১০. সুকুমার সেন (সম্পা.), *কবিকঙ্কণ মুকুন্দচণ্ডীমঙ্গল*, নয়াদিল্লি ও কলকাতা : সাহিত্য একাডেমি, ২০০১, পৃ. ৭৯।

১১. Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bangal*, Vol. II, Karachi: Pakistan Publishing House, 1967.

১২. Mirza Nathan, *Bahiristani-i-Ghaibi*, 2 Vols, Eng. by M. I. Borah. Gauhati: 1936.

১৩. উদ্ধৃত, Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier*, P. 179.

১৪. Henry Beverley, *Census of Bengal 1871*, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1872.

১৫. Thomas Walker Arnold, *The Preaching of Islam*, New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 2010.

১৬. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩, পৃ. ৯৮৭।

১৭. Murray T. Titus, *Islam in India and Pakistan*, Calcutta: YMCA Publishing House, 1959, P. 45.

১৮. দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০১।

১৯. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস : আদি পর্ব*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং হাউস, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪।

২০. Ramesh Chandra Majumdar, *Struggle for Empire*, Bombay: Bharartya Vidya Bhavan, 1958, P. 50-51.

২১. Asim Roy, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal*, Dhaka: Academic Publishers, 1983.

২২. Mohammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal*, Vol. IB Riyadh: Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 1985, P. 782.

২৩. Richard M. Eaton, প্রাগুক্ত।

২৪. Jawahar Sircar, *The Construction of the Hindu Identity in Medieval Western Bangal*: *The Role of Popular* Cults, Calcutta: Institute of Historical Studies, 2005 P. 53.

২৫. আকবর আলি খান, *বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা*, অনুবাদ আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৫।

২৬. A.L. Basham, *The Wonder That was India*: *A Survey of the History and CUlture of the Indian Sub-continent before the Coming of the Muslims*, New York: Grove Press, 1959,

২৭. Asim Ray, প্রাগুক্ত।

২৮. Richard M. Eaton প্রাগুক্ত।

২৯. *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

৩০. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ১৯৫৭, পৃ. ৫০-৫২।

৩১. বিপ্লব দাস গুপ্ত, *বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০০৪, পৃ. ২২৭।

৩২. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৬।

৩৩. Tapan Roy Chaudhuri, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯-১৬৫।

৩৪. দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত ৭৬৮।

৩৫. উদ্ধৃত, Momtazur Rahman Tarafdar, *Husain Shahi Bengal*, Dhaka: Asiatic Socity of Pakistan, 1965, P. 269.

৩৬. উদ্ধৃত, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা; রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৭, পৃ. ১২৩।

৩৭. Tapan Ray Chaudhuri, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

৩৮. উদ্ধৃত, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

৩৯. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২-৪৪৭।

৪০. Jawahar Sarker, প্রাগুক্ত।

৪১. M. N. Srinivas, *The Dominant Caste and Other Essays,* Delhi: Oxford University Press. 1947.

৪২. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* ২য় খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৫, পৃ. ১১০।

৪৩. তপন রায় চৌধুরী। প্রবন্ধ সংগ্রহ। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৯, পৃ. ২২২।

৪৪. উদ্ধৃত, সুকুমার সেন। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১।

আন্তর্জাতিক

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ও 'অন্যের' ভাবমূর্তির ধারণা

ইমতিয়াজ আহমেদ

সারসংক্ষেপ

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক যে ভাবমূর্তিটি দাঁড়িয়েছে, তা অনেকটাই প্লেটোর গুহার রূপক গল্পটির মতো, যেখানে একজন আজন্ম গুহাবন্দী মানুষ তার নিজের ছায়া সম্পর্কে এবং তাকে পাহারা দেওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে অস্পষ্ট এবং ছায়াচ্ছন্ন ধারণা পোষণ করে। এই দুটি দেশ একে অন্যের ভীতিকর ভাবমূর্তি এঁকেছে, যেটা তাদের নিয়ত তাড়িয়ে বেড়ায়। আর 'অন্যের' একটি অস্পষ্ট ও ছায়াচ্ছন্ন ভাবমূর্তি তৈরি করার পেছনে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ যেমন ভূমিকা রেখেছে, তেমনি পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষার ঘাটতি এবং শ্রমিক ও অভিবাসন ব্যাপারটিও নিয়ত একটি ভীতিকর ভাবমূর্তি সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। যার ফলাফল হলো সম্পর্কের এই পারস্পরিক আস্থাহীনতা। অবৈধ চোরাকারবারি এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোও আরেকটি সন্দেহপূর্ণ 'অন্যের' ভাবমূর্তি হয়ে উঠেছে, যারা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণহীনতা ও ব্যর্থতা দুয়েরই সুযোগ নেয়।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক, নিম্নবর্ণীয় জনসংখ্যা, অন্যের ভাবমূর্তি, দেশ বিভাগ, শ্রমের বাজার, অভিবাসন, চোরাচালান।

প্রারম্ভিক কথা

প্লেটোর গুহার রূপক গল্পটি 'অন্যের' ধারণা সৃষ্টির সঙ্গে বেশ ভালোভাবে মিলে যায়। আজন্ম একটি গুহার ভেতরে বন্দী ও শৃঙ্খলিত অবস্থায় গুহার খোলা মুখের দিকে পেছন ফিরে থাকা একজন বন্দী শুধু দেয়ালে প্রতিফলিত তার ছায়া দেখতে পায়। বন্দী একই সঙ্গে নির্দিষ্ট বিরতিতে তাকে খাওয়াতে আসা জেলারের ছায়াও দেখতে পায়। ওই বন্দীর কাছে 'বাস্তবতা' কী রকম হতে পারে? প্লেটো এর উত্তরে বলেন, সত্য বলে আপাত ধরে নেওয়া ওই ছায়া 'অন্যের' ধারণাকে সংজ্ঞায়িত ও

শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে কৌশলী অবদান রাখে, অর্থাৎ পরিশেষে 'অন্যের' একটি ছায়াচ্ছন্ন, অস্পষ্ট প্রতিমা ধারণ করে। বিষয়টি এখানে থেমে থাকেনি। কয়েক শতাব্দীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ঝুটঝামেলা পেরিয়ে আধুনিকতা 'অন্যের' এই ছায়াচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট মূর্তিটিকে ভূখণ্ড বন্দী করার মাধ্যমে আরও বেশি শৃঙ্খলিত করেছে। আধুনিকতাবাদী পর্বকে নির্দিষ্ট করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সময় প্রস্তাব করা যেতে পারে। ১৫৫৫ সালের দ্য পিস অব অগসবার্গ হলি রোমান অ্যাম্পায়ারে বসবাসরত সব প্রজার জন্য তাদের নিজ নিজ শাসক কর্তৃক মনোনীত প্রোটেস্টানিজম বা রোমান ক্যাথলিসিজমের প্রতি সমর্থন প্রদান বাধ্যতামূলক করে। প্রকৃতপক্ষে, ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো প্রজাদের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের পরিবর্তে তার ভূখণ্ডের নিয়মকানুন পালনে বাধ্য করার মাধ্যমে মানুষ, বিভিন্ন ধারণা, স্থাবর, নীতিসমূহ, এমনকি ভাবমূর্তিগুলোকে ভূখণ্ড বন্দী করার আধুনিক, কিন্তু বিশৃঙ্খল যাত্রা আরম্ভ করে। অনতিবিলম্বে, গেরারডাসের মার্কেটরের সাহায্যে মানচিত্র অঙ্কনশিল্প (১৫৮৬) একই সঙ্গে একটি প্রধান পেশা এবং রক্তাক্ত বিরোধের উৎস হিসেবে হাজির হয়। এর ফলে, ভূখণ্ড ও মানচিত্র বন্দী ছায়াচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট ভাবমূর্তিটি 'সত্যিকার অন্য' হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে—একটি অদ্ভুত কিন্তু অন্তরঙ্গ বস্তু যা অভিপ্রায়, প্রমাণীকরণ এমনকি সুযোগমতো স্বার্থপর কার্যদর্শনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

উপনিবেশবাদ উপনিবেশ স্থাপনাকারীদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব পুনরুৎপাদনের সময়ই ইউরোপীয় ডিসকোর্সগুলোকে দক্ষিণ এশিয়ায় নিয়ে এসেছিল। সমালোচকেরা এই প্রক্রিয়াকে দক্ষিণ এশিয়ার মানসিক ঔপনিবেশীকরণ নামে অভিহিত করেছেন এবং এটিকে ইউরোপীয় সরাসরি কর্তৃত্বের মতোই অশুভ ও বিধ্বংসী বলে মনে করেন। আদমশুমারি, যোগাযোগ, শিক্ষা, চিকিৎসা, নজরদারি এবং আরও বিভিন্ন আবিষ্কার ও হস্তক্ষেপের মাধ্যমে প্রথমে এসব ক্ষেত্রে একটি ছায়াচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট 'অন্যের' ধারণা তৈরি করা হয়েছে। অতঃপর, উপনিবেশ স্থাপনাকারীদের আত্মপ্রত্যয় এবং স্থানীয়দের গতানুগতিকতার সুযোগে এই ছায়াচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট ভাবমূর্তি মিথ্যা না হলেও একটি চিরন্তন 'সত্যিকার অন্যের' রূপ লাভ করে। রূপান্তরের এই সাফল্য উপনিবেশ স্থাপনাকারী এবং উপনিবেশিত উভয়ের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। বিশেষত, উপনিবেশিতরা যখন ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা সৃষ্ট এই 'অন্যকে' ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক কালেও বিশ্বাস ও স্মরণ করা শুরু করেছে। অজস্র রাজনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক এবং জনসাধারণ দক্ষিণ এশিয়ার ভূখণ্ডগত বিভক্তিকে কোনো রকম আপত্তি ছাড়াই গ্রহণ করেছিল। হত্যার প্রযুক্তি এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যতিরেকে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল ভিন্ন নয়, যদিও ১৯৭১ সাল বাংলাদেশের জন্য অধিক সংকটময়, সাম্প্রতিক

এবং জীবন্ত হয়ে আছে।[১] চূড়ান্ত বিচারে দুটিই বিভেদময়, গণঘাতী এবং বিয়োগান্ত হিসেবে বিরাজমান। দক্ষিণ এশিয়ার 'অন্যকে' যেভাবেই নামকরণ করা হোক না কেন, 'ভারতীয়', 'বাংলাদেশি', 'পাকিস্তানি' বা তাদের মধ্যে কিছু পরিচিত উপবিভাগ এখন আর ছায়াচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট নয়; বরং তা এখন ভূখণ্ড বন্দী এবং প্রত্যেকের কাছে 'অন্যরা' এখন খুবই অচেনা।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের দৃষ্টিতে ভারতের ভাবমূর্তি এবং ভারতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রবন্ধটি চারটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে দেশ বিভাগ নিয়ে আলোচনা থাকবে। এখানে মূলত দেশ বিভাগের প্রভাব এবং দেরিদার ভাষায়, কীভাবে এটি ভারতীয় এবং বাংলাদেশিদের হন্টোলজিক্যাল সত্তায়[২] রূপান্তরিত করেছে, তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হবে। এর ফলাফল কোনোভাবেই দেশ বিভাগের চেয়ে কম বিভেদকারী ও বিয়োগান্ত নয়। দ্বিতীয় অংশের আলোচনার বিষয় হলো আকাঙ্ক্ষার জগৎ। আকাঙ্ক্ষার অসংগতির ফলেই একে অন্যের প্রতি আগ্রহ থাকার পরও দুই দেশের জনগণের মধ্যে অসামঞ্জস্য তৈরি হচ্ছে। সব নিয়মকানুন এবং সীমান্তে বেড়া দেওয়া সত্ত্বেও মেশানো ও মিশে যাওয়ার মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত স্বার্থ আছে। অতঃপর তৃতীয় অংশে বিশ্বায়নের এই যুগে শ্রমবাজার নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং 'অন্যের' ভীতিকর ভাবমূর্তি জোরদার করার পেছনে বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করা হবে। এখানে মূলত 'অন্যের' ভাবমূর্তিগুলোর ক্লেশ অধিক পরিমাণে উপস্থাপন এবং অবহিত করা অনানুষ্ঠানিক এবং নিম্নবর্ণীয় মেলবন্ধনের ওপর দৃষ্টি দেওয়া হবে। শেষ অংশে আগামী দিনগুলোতে যারা বাংলাদেশ ও ভারতকে নেতৃত্ব দেবে তাদের জন্য এই সবকিছু কী অর্থ বহন করে তা বিবেচনায় নেওয়া হবে।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে এই প্রবন্ধে প্রস্তাবিত বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকল্পগুলো উল্লেখ করছি। প্রথমটি পদ্ধতিগত। এই প্রবন্ধে আধুনিক দুটি রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে ধারণায়ন এবং লেখার সময় সরলীকৃত সময় ও সম্পর্কের যে ডিসকোর্স তার ফাঁদ থেকে মুক্ত থাকার পদ্ধতি ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমনটি আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন: '...অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যকার পার্থক্য শুধু একটি পুনঃ পুনঃ ঘটমান বিভ্রম'।[৩] আইনস্টাইনকে আরও অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাব, বাস্তবতা মূলত স্পেস-সময়ে ঘটা সব ঘটনার সমষ্টি এবং এই বিষয়টির ওপরই এই প্রবন্ধে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি তত্ত্বীয়। এই প্রবন্ধটি বাস্তববাদী প্যারাডাইমের সূক্ষ্ম সমালোচনা। প্রধানত ঠাকুরীয় ডিসকোর্সে[৪] পাওয়া উত্তর-আধুনিকতাবাদের দক্ষিণ এশীয় সংস্করণ ছাড়াও এই প্রবন্ধ কোয়ান্টাম মেকানিকসের অন্তর্জ্ঞান বা আরও সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে অনিশ্চয়তার মূলনীতির ওপর বেশি নির্ভর করছে। অনিশ্চয়তার মূলনীতি সূত্রবদ্ধ

করার জন্য ব্রায়ান গ্রিনির কাছে আমি ঋণী :

> ইলেকট্রনটি ঠিক কোথায় আছে আপনি তা জানতে পারেন, কিন্তু ঠিক ওই সময়ে ইলেকট্রনটি কত বেগে আবর্তন করছে আপনি তা সুনির্দিষ্টভাবে জানতে পারবেন না। বিপরীতক্রমে, কত বেগে ইলেকট্রনটি আবর্তন করছে আপনি তা সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করতে পারেন, কিন্তু এটা করার সময়ে আপনি ইলেকট্রনটির সুনির্দিষ্ট অবস্থান নির্ণয়ের সক্ষমতাকে ব্যাহত করবেন। এই রকম পরিপূরক বৈশিষ্ট্যগুলোকে নির্ধারণের বেলায় সুনির্দিষ্টতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রকৃতির নিজস্ব একধরনের সহজাত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যদিও আমরা ইলেকট্রনের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করছি, অনিশ্চয়তার এই মূলনীতি সম্পূর্ণরূপে সরলীকৃত এবং সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৫]

একইভাবে দেশ বিভাগ, আকাঙ্ক্ষা এবং শ্রমের 'তিনটি জগতের' মধ্যে দুটিকে বাদ দিয়ে শুধু একটির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে 'অন্যের' ধারণা বোঝার ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটতে পারে। এই তিনটি জগৎ (এ রকম আরও থাকতে পারে) এক বৈচিত্র্যমণ্ডিত জটিলতায় পরস্পর সংঘবদ্ধ। সবশেষে জ্ঞানতাত্ত্বিক। এই প্রবন্ধে কোনো পরিচিত বিষয় স্বীকার করার ব্যাপারে একজন আমজনতার সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তা বা গণমাধ্যমে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। এর বিপরীত যেকোনো মতই 'অন্যের' একটি বিকৃত মূর্তি উপস্থাপন করবে এবং এটা আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত কল্পনা এবং আচরণ দ্বারা অবহিত এবং প্রভাবিত।

দেশ বিভাগের (Partition) জগৎ

কলকাতার লিটল রাসেল স্ট্রিটে আমার সঙ্গে দেখা হওয়া নিখিল, যিনি পেশায় একজন নাপিত, আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'দেশ বিভাগ শুরুতেই আমাদের আঘাত করেছিল।' তিনি আসলেই কি ১৯৪৭ সালের কথা বলছিলেন? নিখিল পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশ থেকে ১৯৭১ সালে পালিয়ে যাওয়ার পর আর ফিরে আসেননি। নিখিলকে আমি দুবার বিভক্ত বলতে পারি। ১৯৪৭ সালের পর জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁর মা-বাবার কাছ থেকে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময়ে মানুষকে কী কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল তিনি তা শুনেছেন। কিন্তু তার পরও শোনার অনেক বাকি ছিল। তখন মানুষকে এক বিভীষিকাময় সময় পার করতে হয়েছে, যাঁরা পরস্পর শত শত না হলেও বছরের পর বছর পাশাপাশি বাস করে আসছিলেন। তাঁর স্বদেশে পাকিস্তানি শাসনামলে পরিস্থিতি প্রায় একই ছিল, যেখানে প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্বে সংখ্যাগুরু মাস্তানদের আধিপত্য স্বাভাবিক জীবন নষ্ট করে দিয়েছিল। এপ্রিল, ১৯৭১ সালে যখন পাকিস্তানি সেনারা তাদের মফস্বল শহর আক্রমণ করে, তখন তাঁর পক্ষে সেখানে টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। বৃদ্ধ মা আর তরুণী বোনের হাত ধরে তাঁকে এক রাতে সীমান্ত পার হতে হয়েছিল। তিনি আর এই দেশে ফিরে না আসার সিদ্ধান্ত নেন। নিখিলের দিক থেকে চিন্তা করতে গেলে বাংলাদেশ তাঁর জন্য এক ভীতিকর ভাবমূর্তির জগৎ।

ফরিদা বেগম তাঁর স্বামীকে নিয়ে কথা বলতে সংকোচ বোধ করেননি। জহিরুদ্দীন কলকাতার প্রান্তভাগের একটি ছোট শহরে প্রশাসনিক চাকরি করতেন। ১৯৫০-এর দশকের প্রথম দিকে স্থানীয় তরুণেরা তাঁর বাসায় ঢিল ছুড়েছিল। এই ঘটনার পর জহিরুদ্দীন তাঁর চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভারতে যাঁরা থেকে যেতে চেয়েছিলেন, তিনি তাঁদেরই একজন ছিলেন, এমনকি ১৯৪৭ সালের নৃশংসতার পরও। কিন্তু তরুণদের (তিনি পরে যাদের মজা করার ভঙ্গিতে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বলতেন) ঢিল ছোড়ার এই ঘটনা তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিল এবং ঠিক পরের দিন সকালে তিনি ওই জায়গা ছাড়ার ইচ্ছার কথা তাঁর পরিবারকে জানান। রাজশাহীর সীমান্ত অঞ্চলে কিছুদিন থাকার পর তাঁরা পরিশেষে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বাস করা শুরু করেন। আদিনিবাস ত্যাগের দিনের অস্থিরতা এবং বিষণ্ণতা জহিরুদ্দীন তাঁর বাকি জীবনে আর কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাহলে ১৯৭১ সালে ভারতে ১০ মিলিয়ন শরণার্থীর আশ্রয় গ্রহণ এবং বাংলাদেশের জন্মের ব্যাপারে কী বলবেন? ফরিদা কিছুক্ষণ থেমে বললেন, 'আমার মনে হয় সে কখনো তার মন থেকে ওই উচ্ছৃঙ্খল তরুণদের মুখগুলো মুছে ফেলতে পারেনি।' আরেকটি উচ্ছেদ, 'অন্যের' আরেকটি ভীতিকর ভাবমূর্তি।

'অন্য' বোঝাতে কিছু বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু নিজেদের আলাদা রাখতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত কিছু একই ধরনের আকাঙ্ক্ষার কথা সবাই বলে বসেন। নিখিল ও ফরিদার একই ধরনের মর্মভেদী অভিজ্ঞতা ছাড়াও একটি বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। তাঁরা উভয়ই তাঁদের দুর্দশার চূড়ান্ত ফলাফলকে অর্থাৎ জাতিরাষ্ট্র গঠনকারী ভৌগোলিক সীমারেখাকে চ্যালেঞ্জ করে যান। তাঁদের পূর্বতন এবং বর্তমান আবাসস্থলের মধ্যে দেয়াল উঠলেও তাঁরা তা ভুলে তাঁদের পূর্বতন আবাসস্থলকে বেশ মমতার সঙ্গেই 'আমার দেশ', 'জন্মভূমি' বা 'আমার গ্রাম' বলে অভিহিত করছেন। তাঁরা ভুলে যান যে তাঁদের পূর্বতন বাসভূমিতে যেতে হলে তাঁদের বর্তমানে পাসপোর্ট, ভিসা, শুল্ক বিভাগের সম্মতি এবং এনওসি প্রয়োজন হবে। এমনকি নিজ দেশের মুদ্রার পরিবর্তে ডলারও জমা দিতে হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা বড়জোর নিজের ভূমিতে একটি ভূখণ্ডবন্দী ভ্রমণ হবে।

মজার বিষয়, মুক্তিসংগ্রাম এবং উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের নেতারা মানুষের চেয়ে ভূখণ্ডকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। যেমন বাংলা বিভাগের সময় কংগ্রেস জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বিবেচনা না করে ভূখণ্ডভিত্তিক বিভাগের প্রস্তাব দিয়েছিল। কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের জন্য অখণ্ড বাংলার মোট ভূমির ৫৫.৪১ শতাংশের বিপরীতে জনসংখ্যার ৪৬.৫৭ শতাংশ এবং পূর্ব বাংলার জন্য ৪৪.৫৯ শতাংশ ভূমির বিপরীতে ৫৩.৩৩ শতাংশ জনসংখ্যা প্রস্তাব করে।[৬] কিন্তু এটা সমস্যার সমাধান এনে দেয়নি। কারণ, জনসংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে দেশ বিভাগ কখনো সম্পূর্ণ

হতে পারে না। এমনকি কংগ্রেসের প্রস্তাবমতেই ২৩ শতাংশ মুসলিম পশ্চিমবঙ্গে থেকে যেত এবং তার চেয়ে সামান্য কম হিন্দুধর্মাবলম্বী থেকে যেত পূর্ব বাংলায়। কিন্তু এরই মধ্যে অংশত সাম্প্রদায়িকতা এবং অংশত শ্রেণি ও বর্ণের ভিত্তিতে 'অন্যের' ধারণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেসের মতে, বাংলার সংখ্যাগুরু জনসংখ্যা নিয়ে তৈরি এই 'অন্য' অপেক্ষাকৃত ছোট ভূখণ্ডে বসবাস করতে সক্ষম এবং পূর্ব বাংলায় যাঁরা থেকে গিয়েছিলেন (প্রধানত নিম্নবর্ণের হিন্দুধর্মাবলম্বী), সাবেক কংগ্রেসি এবং বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত আইনজীবী বাবুভূষণ কিছুটা হতাশা নিয়ে যেমনটা বলেছিলেন, 'তারা দুর্ভাগা' এবং তাদের জন্য এর চেয়ে ভালো কিছু করা যাবে না।

মুসলিম লীগের নীতিগত অবস্থান নিয়েও—বিশেষত পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বিষয়ে—একই রকম যুক্তি উপস্থাপন করা যেতে পারে। প্রচলিত আছে মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন মুসলিম লীগ আপাতত একটি 'ভালো সমঝোতায় পৌঁছেছে, যেখানে পূর্ব বাংলার চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থই অধিক'।[৭] পূর্বাংশের ছিটমহলগুলো আরও সমস্যার সূত্রপাত করেছিল। বাংলাদেশ ও ভারতের ২২৫টি ছিটমহল রয়েছে। এর মধ্যে ১১৯টি বিনিময়যোগ্য ভারতীয় ছিটমহল (১৭,১৫৭.৭২ একর) বাংলাদেশে অবস্থিত। বাকি ১১টি (৩৭৯৯.৩৫ একর) অবিনিময়যোগ্য ছিটমহল। এগুলো বিনিময়যোগ্য নয়, কারণ এগুলোর ওপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ নেই বা প্রবেশের কোনো পথ নেই। ভারতে বাংলাদেশের ছিটমহল মোট ৯৫টি। এর মধ্যে ৭২টি (৭,১৬০.৮৫ একর) বিনিময়যোগ্য এবং প্রায় ৫,১২৮.৫২ একর বিনিময়যোগ্য নয়।[৮] শুধু জনসংখ্যাতাত্ত্বিকভাবেই নয়, ভূখণ্ডগতভাবেও দেশ বিভাগ নিশ্চিতভাবে অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।[৯] তার পরও ভূখণ্ড নিয়ে আবিষ্টতা চলছেই, যা মানুষকে শুধু সীমান্তের বাইরের অপর রাষ্ট্র নয়, নিজ রাষ্ট্রেও আতঙ্কিত করে তুলছে। স্বদেশের ভূখণ্ডেই তারা আতঙ্কগ্রস্ত। ১৯৪৭ সালের পর ভারত ও পাকিস্তান ভিন্নভাবে তাদের রাজনীতি পরিচালিত করে এবং একই সঙ্গে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে পরিবর্তন আসে। পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে এই পরিবর্তন সীমান্তের দুই পাশের বাংলার মানুষের চিন্তার ভিন্নতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে কিছুটা সাহায্য করে। রাজনীতিকে সামরিকায়ন এবং ধর্মের উর্দি পরানোর কারণে পূর্ব পাকিস্তানিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে একটি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অস্থিরতায় উপনীত হয়েছিল, যা পরবর্তী সময়ে গণহত্যা এবং বাংলাদেশের রক্তস্নাত জন্মের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার কাছে পূর্বেকার দুর্দশাগুলো অংশত ঢাকা পড়ে যায়। ১৯৪৭ সালের চেয়ে ১৯৭১ সালই তাদের বেশি তাড়া করে বেড়ায়। বাস্তবে, যখন সহিংসতার বিষয়টি উত্থাপন করা

হয়েছিল, চটজলদি ফরিদা ১৯৭১ সালের কথা বলা শুরু করেছিলেন; মনে হচ্ছিল, যেন ১৯৪৭ সাল নিয়ে আর কিছু বলার নেই। কিন্তু ১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট শনাক্তযোগ্য পার্থক্য উল্লেখ করা যায়।

নিখিল না ফিরলেও যাঁদের বাবা-মা বা দাদা-দাদি পূর্ব বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বা যাঁরা এত ছোট বয়সে পূর্ব বাংলা ছেড়েছিলেন যে তাঁদের আজ আর কোনো কিছুই মনে নেই, তাঁরাও বাংলাদেশে আসতে চান, শুধু এটা দেখতে যে তাঁদের মা-বাবা এবং দাদা-দাদিরা কী নিয়ে এত বেশি স্মৃতিকাতর ছিলেন। প্রদীপ এই লক্ষ্য নিয়েই ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ভ্রমণে এসেছিলেন এবং তিনি বরিশালের স্বরূপকাঠির সেই বিশুদ্ধ সবুজাভ বাতাসে নেওয়া নিঃশ্বাস এখনো অনুভব করেন। এই বিষয়টা বাংলাদেশিদের কাছে সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন। ১৯৭১ সালের বিভীষিকার সম্মুখীন হয়ে এবং জাতির নতুনত্বের উত্তেজনায় বাংলাদেশিরা তাঁদের প্রাত্যহিক স্মৃতি থেকে আগেরকার বিষয়গুলো ত্যাগ করেছেন। আনিসুজ্জামান ১৯৪৭ সালে ১০ বছর বয়সে তাঁর মা-বাবার সঙ্গে কলকাতা ছেড়েছিলেন। যেমনটি তিনি আমেনা মহসিনের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনে বিবৃত করেছেন :

> আনিসুজ্জামান তাঁর পৈতৃক বাড়ির জন্য কখনো অতীতবিধুরতায় ভোগেননি। তিনি শুধু একবার চব্বিশ পরগনায় বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং ওই সময়েই তাঁদের পুরোনো বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে এসেছিলেন। তাঁরা কলকাতার যে বাড়িতে থাকতেন সেটার পাশ দিয়ে তিনি বহুবার গিয়েছেন কিন্তু কখনো বাড়িটির ভেতরে প্রবেশ করেননি। তিনি কখনো বাড়িটি ঘুরে দেখার ইচ্ছা বা কৌতূহল বোধ করেননি। তিনি বাড়িটির বর্তমান বাসিন্দাদের জ্বালাতন করাও সমীচীন মনে করেননি। তিনি তাঁর পুরোনো বিদ্যালয়ের পাশে গিয়েছিলেন কিন্তু এ ক্ষেত্রে অতীতবিধুরতার চেয়ে কৌতূহলই বেশি ছিল। বিদ্যালয়টি এখন একটি নতুন স্থানে স্থানান্তর করার ফলে তিনি আর পুনরায় যাওয়ার চেষ্টা করেননি।[১০]

অন্যদিকে, ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফিরে আসা বাঙালি মুসলমানরা আর 'শরণার্থী' ছিলেন না। বরং, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের পক্ষ নেওয়া এবং বাংলাদেশের জন্মের পর পাকিস্তানে ফিরে যেতে ইচ্ছুক বিহারি এবং আটকে পড়া পাকিস্তানিদের 'শরণার্থী' নামকরণ করা হয়েছিল। নতুন সৃষ্ট রাষ্ট্র জনসাধারণের চেতনায় ১৯৪৭ সালের স্মৃতি জিইয়ে রাখার কোনো কারণ দেখেনি। আরও নতুন ও বেদনাদায়ক ইতিহাস আগের ইতিহাসের স্থান দখল করে নিয়েছিল।

ভারতীয় এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে শরণার্থী সিনড্রোম থেকে যায়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং ভারতের আরও অনেক অংশে এখনো 'রিফিউজি কলোনি' আছে। কিন্তু অপচ্ছায়াটি ছিল অতিসম্প্রতি সময়ের। 'এটা কি সত্য নয় যে ১৯৭১ সালে প্রায় ১০ মিলিয়ন মানুষ শরণার্থীতে পরিণত হয়েছিল?' '১ মিলিয়ন শরণার্থী কি থেকে যায়নি?' 'এটা কি অনেকটা ১৯৪৭ সালের পুনরাবৃত্তি ছিল না যখন দলে

দলে শরণার্থীরা আমাদের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল?' 'বাংলাদেশিরা—যারা ক্রমবর্ধমান হারে সংখ্যাগুরু এবং বাঙালি মুসলমানে পরিণত হচ্ছে—তারা কি দারিদ্র্যপীড়িত এবং প্রায় অপর্যাপ্ত ভূখণ্ডে নিজেদের আবদ্ধ রাখতে পারবে?' এগুলো হচ্ছে কলকাতা এবং দিল্লিবাসীর কতগুলো সাধারণ পর্যবেক্ষণ এবং এর সবটুকু সত্যতাবর্জিত নয়, কেননা পুরোনো ভাবমূর্তির ওপরই নতুন ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালের 'অন্যদের' ধারণা ১৯৭১ সাল-পরবর্তী 'অন্যের' ধারণার মধ্যে দৃঢ়তর হয়।

আবারও সেই ভূখণ্ডকেন্দ্রিক সিদ্ধান্তই হলো এবং এবার ভূখণ্ডে কঠিন ও সত্যিকারের দেয়াল নির্মাণের মাধ্যমে। মূলত বেসামরিক ধাঁচের 'প্রাচীরবন্দী মানসিকতা' সামরিক আক্রমণ ঠেকাতে নয়, মানুষকে বিভক্ত করার নিমিত্তে তৈরি হয়। এটা বেশ কিছু সময় ধরে আধুনিকতাবাদী চিন্তা-চেতনার অংশে পরিণত হয়েছে। বার্লিন ওয়াল, বেলফেস্ট ওয়াল এবং এমনকি সম্প্রতি নির্মিত ওয়েস্ট ব্যাংক বেরিয়ার 'অন্যের' ভাবমূর্তিকে ভূখণ্ডবন্দী করার মাধ্যমে মানুষকে বিভক্ত করার প্রচেষ্টাই ছিল।[১১] এর মধ্যে কিছু প্রাচীর ব্যর্থ ও ভেঙে ফেলা হলেও অন্যদের নতুন করে প্রাচীর নির্মাণের প্রচেষ্টা থেমে নেই। একবার এই মানসিকতা আত্মস্থ হয়ে গেলে এর থেকে মুক্তি নেই। ইহুদিরা বাস্তবিক অর্থেই নাৎসিদের দ্বারা জার্মানি এবং পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন অংশে দেয়াল ও বেড়াবন্দী ছিল। কিন্তু এটা তাদের ফিলিস্তিনে নতুন দেয়াল নির্মাণ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। একজন কীভাবে তার ভূখণ্ডের সীমানার ঠিক ওপারের 'অন্যদের' সম্পর্কে জানতে পারবে, বিশেষত যখন 'অন্যরা' আধাস্বীকৃত এবং প্রচলিত মতানুসারে গোপনে সীমান্তবর্তী শহর, গ্রাম এবং তার বাইরেও বিদ্যমান পার্থক্যগুলো রহিত করার কাজে যুক্ত থাকে? যদি আধুনিকতাবাদী ডিসকোর্সের ভূখণ্ডকেন্দ্রিকতাকে গুরুত্ব দিই এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিই, তাহলে সীমান্তে দেয়াল নির্মাণ এবং বেড়া দেওয়া একটি বিয়োগান্ত এবং প্রহসনমূলক বিকল্প। আমি এখানে অবশ্যই মার্ক্সের ধ্রুপদি উক্তি স্মরণ করব, 'ইতিহাস ফিরে আসে দুবার—প্রথমবার বিয়োগান্ত রূপে, দ্বিতীয়বার প্রহসন রূপে।' কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

ভারতীয় সরকার তার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ১,১৩৪ কোটি রুপি ব্যয়ে পুরো ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং প্রকল্পটি মার্চ ২০০৭ সালে সম্পন্ন হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। বাংলাদেশকে বেড়াবন্দী করার জন্য সীমান্তে বেড়া নির্মাণ (২৪০৯ কিলোমিটার) এবং রাস্তা নির্মাণ (৭৯৭ কিলোমিটার) করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বেড়া নির্মাণ সবচেয়ে বেশি হবে পশ্চিমবঙ্গে (১০২১ কিলোমিটার) এবং সর্বনিম্ন হবে আসামে (৭১.৫ কিলোমিটার)। ত্রিপুরায় ৭৩৬ কিলোমিটার, মিজোরামে ৪০০ কিলোমিটার এবং

মেঘালয়ে ১৯৮ কিলোমিটার সীমান্তে বেড়া নির্মাণ করা হবে।[১২] প্রাচীরবন্দী এবং সামরিক বেষ্টনীঘেরা 'অন্যরা' এখন কোথায় যাবে? গুয়াহাটির ফটোসাংবাদিক সিং আমাকে বলেছিলেন, ১,১৩৪ কোটি রুপির বেড়া কাটতে মাত্র ১০ রুপির (একটি কাঁচির মূল্য) প্রয়োজন। তিনি আরও বললেন, কে কাকে শোষণ করছে? যেহেতু স্থানীয়রা কথিত 'অবৈধ অভিবাসীদের' তীব্রভাবে শোষণ করছে (নিম্ন বেতন, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অমানবিক জীবনযাত্রার অবস্থা এবং এ রকম আরও অনেক), তাই বাংলাদেশের উচিত ভারতের কাছে শ্রমিকদের সময় ও শ্রমের ক্ষতিপূরণ দাবি করা। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, সীমান্তে এই বেড়া নির্মাণ আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তাবিত জনসংখ্যা বিস্ফোরণ—বিশেষত অন্যদের—কি রোধ করতে পারবে? সমালোচকেরা বোধ হয় ভিন্নমত পোষণ করবেন।

এই বিষয়ে তিনটি ভাগে যুক্তি উত্থাপন করা হয়। প্রথমটি যৌক্তিক সামঞ্জস্যহীনতা। ১৯৯২ সালেই মুচকুন্দ দুবে বিষয়টি সবার দৃষ্টিতে এনেছিলেন :

> প্রথমেই ভারতের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এই মিথ্যা ছড়াতে থাকে যে অধিকাংশ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিন্দু এবং এই হিন্দুরা নৃশংসতার শিকার হয়েই বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু অনুপ্রবেশের সময় ধরা পড়া এবং যাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে তাদের সংখ্যাকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করলে সম্পূর্ণ ভিন্নচিত্র পাওয়া যায়। বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় ধরা পড়াদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের অনুপাত ছিল প্রায় ৬০:৪০ এবং বাংলাদেশ-আসাম সীমান্তে তা প্রায় ২৫:৭৫। এখন এই একই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বলছে যে বাংলাদেশ থেকে মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কাছাকাছি জেলাগুলোতে এসে ভিড় করছে এবং প্রায় দিল্লি পর্যন্ত চলে আসছে। এই কথারও খুব সামান্যই বাস্তবিক ভিত্তি রয়েছে। তা ছাড়া, এই বিবৃতি দুটি একটি অপরটিকে বাতিল করে দেয়।[১৩]

দ্বিতীয়টি হচ্ছে আদমশুমারি। ১৯৯১ সালের আদমশুমারির আপাত তথ্যগুলো ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে উন্মুক্ত করা হয়। এখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে গুয়াহাটির রবিজিৎ চৌধুরী নিচের প্রতিবেদনটি তৈরি করেছিলেন :

> ১৯৯১ সালের আদমশুমারির পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এখনো প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু আপাত জনসংখ্যার আকার বাংলাদেশ থেকে আসামে একটি বড় জনস্রোত প্রবেশ করছে মর্মে যে সাধারণ ধারণা তা সমর্থন করছে না...
>
> আদমশুমারি অনুসারে ১৯৭১-১৯৯১, এই দুই দশকে সর্বভারতীয় ৫৩ শতাংশের বিপরীতে আসামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৫২.৪৪ শতাংশ। এই দুই দশকে আসামে জনসংখ্যা ৭,৬৬৯,৪১০ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা ১৯৮৭ সাল থেকে দুই থেকে তিন মিলিয়ন বাংলাদেশি ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে দাবি তা নাকচ করে দেয়।[১৪]

শেষ তর্কটি অভ্যন্তরীণ অভিবাসনবিষয়ক। কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের সামির গুহ রায়ের মতে, অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যাটি 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অতিরঞ্জিত'। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং

বাংলাদেশের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং হ্রাসের হারের তুলনামূলক পর্যালোচনা করার পর, রায় বলেন :

> জনসংখ্যাতাত্ত্বিক পরিসংখ্যান সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করার পর চূড়ান্তভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা সমস্যার জন্য বাংলাদেশি শরণার্থীরা দায়ী নয়; বরং পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলো থেকে ব্যাপক হারে আসা অভিবাসীরাই দায়ী...১৯৮১-৯১ সালের মোট ১৬ লাখ অভিবাসীকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা অভিবাসীর সংখ্যা ৯.১ লাখ; বাকি প্রায় সাত লাখ লোক এসেছে ভারতেরই অন্যান্য প্রদেশ থেকে। অর্থাৎ এই দশকে বার্ষিক গড়ে প্রায় ৯১ হাজার বাংলাদেশি আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করেছে কিন্তু এর মধ্যে কতজনকে চিহ্নিত করা গেছে এবং কতজনকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে, তা জানা যায়নি। সম্ভবত এই অভিবাসীদের একটি অংশ নিজেদের ইচ্ছাতেই তাদের আদি-নিবাসে ফিরে গিয়েছিল।[১৫]

বিতাড়ন ইস্যুতে বলতে গিয়ে সিপিআই(এম) সদস্য হান্নান মোল্লা প্রায় রায়ের যুক্তিকেই বর্ধিত করে একবার সংসদে বলেছিলেন, 'মহারাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত অধিকাংশ বাংলাভাষী মানুষ হাওড়া এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকে মহারাষ্ট্রে চলে গেছে।' তিনি আরও অভিযোগ করেছিলেন, 'কারাবন্দী বাংলাভাষী মানুষদের মুক্তির বিনিময়ে প্রত্যেকের কাছে পুলিশ সাধারণত ২০০০ থেকে ২৫০০ রুপি দাবি করত। তা দিতে ব্যর্থ হলে পুলিশ তাদেরকে ১০-১৫ দিন আটকে রেখে সীমান্তে নিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়'।[১৬] কিন্তু তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ৯.১ লাখ। যেমনটি একজন পর্যবেক্ষক সম্প্রতি বলছিলেন :

> এটা সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা বিদেশভ্রমণ। যদি আপনি বাংলাদেশি হয়ে থাকেন তাহলে ২০০০ রুপির কম খরচে টুর অপারেটরের খরচ মিটিয়ে আপনি ভারতে একটি নিরাপদ যাত্রা ও একটি ভবিষ্যৎ কিনে নিতে পারেন। সামান্য কিছু বিষয় পরিবর্তন করলে আপনি আপনার পছন্দমতো ভারতের যেকোনো অংশে স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ভোটব্যাংকের অংশ হিসেবেও দেখতে পাবেন। যেহেতু একজন বাংলাদেশি সাংস্কৃতিকভাবে একজন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির মতোই তাই তিনি খুব সহজে একজন ভারতীয় হয়ে উঠতে পারেন। যা আবার ২০০ রুপির কম মূল্যের নকল রেশন কার্ডের মাধ্যমে খুব দ্রুত সুরক্ষিত হয়।

বছর পরিক্রমায় অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীর সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। পুলিশের হিসাবমতে, ভারতে অবৈধ অভিবাসীর সংখ্যা এক কোটির ওপরে। তবে এই সংখ্যা আরও বাড়বে। সংগতভাবেই সীমান্তে কড়া নজরদারির মাধ্যমে অনুপ্রবেশ প্রতিহত করে সমস্যাটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার আহ্বান জানানো হয়েছে।[১৭]

'অন্যরা' আবারও 'পুলিশের ধারণা' এবং 'এক কোটির বেশি' শব্দসমূহের সাহায্যে প্রকাশিত হলো। এখানে এটা দাবি করা হচ্ছে না যে অবৈধ অভিবাসীর অস্তিত্ব নেই, যদিও 'অবৈধ' শব্দটির ব্যবহার এখানে সঠিক নয়। কারণ অবৈধতার প্রশ্ন আসে কেবল বৈধ কোনো কিছুর বিপরীতে। বাংলদেশ ও ভারত, এমনকি পাকিস্তানের বেলাতেও বিয়ে ব্যতীত (এটাও একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং আমরা যদি সুষমা স্বরাজ এবং বিজেপিকে বিশ্বাস করি, তাহলে এমনকি সোনিয়া গান্ধীও এই শর্ত পুরোপুরি পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন) কোনো বৈধ অভিবাসন হতে পারে না। নেহরু-লিয়াকত প্যাক্ট এবং দুই দশক পরের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি, উভয়ই নাগরিকত্বের বিষয়টিকে ভূখণ্ডবন্দী এবং অবরুদ্ধ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় অভিবাসন শুধু অবৈধ জগতেই সম্পন্ন হয়। মজার বিষয়, ভারতের ক্ষেত্রে এর একটি অদ্ভুত ব্যতিক্রম রয়েছে। নেপালের যে গোর্খারা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়, তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে।[১৮] সরকার এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর মানুষের ক্ষমতা এবং গণতন্ত্রের জন্য এটাই যথেষ্ট। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মানুষের চলাচল বা অভিবাসন না থাকা হবে অস্বাভাবিক ব্যাপার। যদি এই দুই দেশের মধ্যকার মানুষের যাতায়াত কখনো বন্ধ হয়, তবে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ই নিষ্ফলা হয়ে যেতে পারে। যেহেতু ন্যায়ের দরজা বন্ধ, তাই একমাত্র পথ হচ্ছে দেশ বিভাগের এই ভূখণ্ডকেন্দ্রিক 'টুর অপারেটর' নামক দালালের মাধ্যমে বিশ্বকে অগ্রাহ্যকারী কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া এই সীমান্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে পার হওয়া।

আকাঙ্ক্ষার জগৎ

এটা ভালো যে ১৯৭১ সালে সীমান্ত পার হতে নিখিল ও তার পরিবারের 'টুর অপারেটরের' প্রয়োজন হয়নি। তাহলে এটা নিখিল ও তার বোনকে কামাসক্তির জগতে নিয়েও যেতে পারত। 'নিয়োগ, ট্রানজিট এবং সংগ্রহ' এলাকা বলে চিহ্নিত ২৫০ গ্রামে পরিচালিত বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিবছর সাত হাজারের ওপর নারী ও শিশু ভারত ও পাকিস্তানে পাচার হচ্ছে।[১৯] এই রিপোর্টের তথ্যমতে, প্রতিদিন গড়ে কমপক্ষে এক ডজন বাংলাদেশি নারী পাচার হচ্ছে। একবার কলকাতা পৌঁছানোর পর—যেমনটা একজন গবেষক উল্লেখ করেছেন—এই 'মেয়েদের কয়েক শ থেকে প্রায় ১০,০০০ রুপি মূল্যে পর্যন্ত বিক্রি করা যেতে পারে।'[২০] অন্যদিকে, সব নারীই শেষ পর্যন্ত পতিতালয়ে বা যৌনদাসী হিসেবে বিক্রি হয়ে যায় না। পাচারকৃত নারীদের অনেকে শেষ পর্যন্ত অবৈধ শ্রমিক, দাস শ্রমিক, অবৈধ বিয়ে, শিশু-পালিকা হিসেবে কাজ করেন; এমনকি অনেকে অঙ্গ-ব্যবসার শিকার হন।[২১] প্রায়ই এক ধরনের পাচার অন্য

ধরনের পাচারকে সাহায্য করে, যেমনটি এক সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে : বিবেচিত আইন কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত না হলেও সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য 'পাত্রী-বাণিজ্য' ভারতসংলগ্ন পশ্চিমের অঞ্চলবর্তী সীমান্তে উদ্বেগ তৈরি করেছে। বিবাহযোগ্য বয়সের মেয়েদের ভারতীয় স্বামী গ্রহণে এবং এরপর সীমান্ত পার হয়ে নানা রকম অসামাজিক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে।[২২]

এর ফলে অনেকে যৌন দাসে পরিণত হচ্ছে। এর পেছনে উপযুক্ত কারণও আছে। শুধু কলকাতাতেই প্রতিদিন ৬০ থেকে ৮০ হাজার লোক যৌনসঙ্গী ভাড়া করে।[২৩] যদিও যৌন দাসত্বের শিকার নারীরা হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে এই জগতে প্রবেশ করেছে, কিন্তু এ রকম একটি বড় চাহিদাই নারী পাচারকে চাঙা রেখেছে।

কিন্তু আধুনিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে সামষ্টিক আকাঙ্ক্ষাও এখানে কাজ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ শ্রীঅরবিন্দ এটা অস্বীকার করেননি, যদিও এটা ভারসাম্যহীন এবং কনস্ট্রাকটিভিস্ট হতে পারে। ১৯২৬ সালে যখন ভারতে মুসলমানদের আত্তীকরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে মতামত চাওয়া হয়েছিল, অরবিন্দ বেশ স্পষ্টভাবে বলেছিলেন :

> 'কেন নয়? গ্রিস, পারস্য এবং অন্যান্য জাতি থেকে নানা উপাদান ভারত আত্তীকরণ করেছে। কিন্তু ভারত তখনই গ্রহণ করেছে যখন অন্য পক্ষ ভারতের কেন্দ্রীয় সত্যকে স্বীকার করেছে এবং সে এমনভাবে গ্রহণ করেছে যে গ্রহণের পর তা বিদেশি উপাদানের পরিবর্তে ভারতের নিজস্ব সত্তার অংশে পরিণত হয়েছে...। মানসিকভাবে মুসলিম সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে আত্তীকরণ করা হয়েছে এবং এটা আরও অনেক দূর হয়তো ঘটতে পারত। কিন্তু এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য মুসলিম মানসিকতায় পরিবর্তন আসা প্রয়োজন। বাহ্যিক জীবনে দ্বন্দ্ব রয়ে গিয়েছে এবং মুসলমানরা সহনশীলতা না শেখা পর্যন্ত আত্তীকরণ সম্ভব বলে মনে করি না।'[২৪]

এটা মোটেও বিস্ময়কর ছিল না যে মুসলমানদের 'অন্যের' দৃষ্টিতে দেখার কারণে শেষ পর্যন্ত অরবিন্দ 'হিন্দু-রাষ্ট্র ধারণার পুস্তিকা রচয়িতা' এবং 'জিহাদি হিন্দুত্ববাদ ও রাজনৈতিক হিন্দুত্ববাদের' মতাদর্শের প্রচারক খেতাব পেতে পারেন।[২৫] অরবিন্দের মুসলমানদের আত্তীকরণ করার এবং ভারতীয় ভূখণ্ডকে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলার প্রত্যয়ের ফলে নতুন অনেক তর্ক সৃষ্টি হয়েছে। অরবিন্দ শুধু একটি ইচ্ছা, মোহাবিষ্ট কল্পনা প্রকাশ করেছিলেন, যা সম্ভাবনার অতীত। কিন্তু অন্য যেকোনো আকাঙ্ক্ষার মতো এটা মানুষকে প্রলুব্ধ ও উন্মত্ত করেছিল এবং যখন এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি, তখন মানুষকে ক্রোধ পেয়ে বসেছিল, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নৃশংসতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু মুসলমানদেরই কেন আত্তীকৃত হতে হবে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষাকে শুরুতেই প্রত্যাখ্যান করতে হবে? ধর্ম ও সংস্কৃতিনির্বিশেষে সব মানুষই কি পরস্পর আত্তীকৃত হতে পারে না? সম্ভবত

মওলানা আবুল কালাম আজাদ এটাই প্রত্যাশা করেছিলেন। ১৯৪০ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতির ভাষণে আজাদ বলেছিলেন :

> আমি একজন মুসলমান এবং আমি গভীরভাবে সচেতন যে আমি ইসলামের গত তেরো শ বছরের সুমহান ঐতিহ্য ধারণ করছি। আমি এই উত্তরাধিকারের একটি ছোট অংশও হারাতে চাই না...। একজন মুসলমান হিসেবে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আমার একটি বিশেষ পরিচয় রয়েছে এবং এই বিষয়ে কোনো অন্যায্য হস্তক্ষেপ আমি বরদাশত করতে পারি না। কিন্তু এসব অনুভূতিসহ আমার আরও একটি গভীর চেতনা রয়েছে, যা আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়েছে। ইসলামের আদর্শ এটিকে ব্যাহত করেনি বরং শক্তি জুগিয়েছে। আমি একইভাবে এই বিষয় নিয়ে গর্বিত যে আমি একজন ভারতীয়, ভারতীয় জাতিসত্তার এক অবিচ্ছেদ্য প্রয়োজনীয় অংশ, এর সামগ্রিক কাঠামোর একটি দরকারি উপাদান, যা ছাড়া এই মহান স্বপ্নসৌধ অসম্পূর্ণ। আমি আমার এই যৌক্তিক দাবি কখনো ত্যাগ করতে পারব না।[২৬]

কিন্তু মসজিদ এবং মাদ্রাসা তৈরি (অর্থাৎ দেবত্বকে পার্থিব বস্তুসমূহে অনুভবের আকাঙ্ক্ষা) যদি কোনো সূচক হয়, তবে এটা দেখা যায় যে ইতিহাস, আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে ভারতীয় ও বাংলাদেশিরা অরবিন্দ ও আজাদ উভয়কেই বেছে নিয়েছে। সেন্ট্রাল টাস্কফোর্স অন বর্ডার ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সীমান্তের ভারতীয় দিকে ৯০৫টি এবং বাংলাদেশের দিকে ৯৬০টি মসজিদ রয়েছে। একইভাবে সীমান্তের ভারতীয় অংশে ৪৩৯টি এবং বাংলাদেশ অংশে ৪৬৯টি মাদ্রাসা আছে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলাতেই শুধু ১৭২টি মসজিদ এবং ৫৫টি মাদ্রাসা রয়েছে; অন্যদিকে ৩০৫টি মসজিদ এবং ১০৪টি মাদ্রাসা সীমান্তের নানা অংশে ছড়িয়ে রয়েছে।[২৭] প্রকৃতপক্ষে সীমান্তের উভয় পাশের মুসলমানরা আত্তীকৃত হতেও পারেনি (অরবিন্দের প্রস্তাব) আবার বোকার মতো আত্তীকরণ আশাও করেনি (আজাদের প্রস্তাব)। গোষ্ঠীবদ্ধ সেক্যুলার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে 'অন্যরা' বুঁদ হয়ে আছে জীবিকার খোঁজে।

বিষয়টি এখানেই শেষ নয়, কারণ মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণের এই আকাঙ্ক্ষা সর্বত্রই দেশজ নয়। 'ভিনদেশি সহযোগিতা' 'অন্যের' প্রতিমূর্তি প্রচারকারীদের মধ্যে স্পন্দন তৈরি করে এবং এবার তা 'জাতীয় নিরাপত্তা' নামক এক অস্পষ্ট যুক্তিতে। যেমনটি ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছিল :

> এই মসজিদ এবং মাদ্রাসাসমূহ গালফ রাষ্ট্রসমূহ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে 'প্রচুর অর্থ সাহায্য' পেয়ে থাকে। ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (জেদ্দা), পাকিস্তানের হাবিব ব্যাংক এবং গালফ রাষ্ট্রসমূহে বাস করা কিছু ভারতীয় মুসলমানের দ্বারা অর্থ সাহায্য এসব মসজিদ এবং মাদ্রাসা পেয়ে থাকে।[২৮]

দুর্ভাগ্যজনক হলেও এখানে যুক্তি হিসেবে দেখানো হচ্ছে যে তারা 'ভারতীয় মুসলমান' হতে পারে, কিন্তু গালফ রাষ্ট্রসমূহে বাস করে ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণে

তাদের কোনো অধিকার নেই। অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে, যদি 'ভারতীয় মুসলমানদের' মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণের ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হয়, তবে তাদের তা 'মুসলিম পাকিস্তান' বা 'মুসলিম বাংলাদেশ' রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুগপৎ প্রকাশিত হয়, যদিও দুটিরই গন্তব্য একই। এই তর্কের দুটি দিক রয়েছে: একটি দিক বুদ্ধিবৃত্তিক এবং অন্যটি বাস্তব ও নৃশংস। বুদ্ধিবৃত্তিক দিকটি প্রথমে দেখা যাক। একবার দিল্লিতে বিজেপি শাসনামলে আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়া এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিলেন: 'আপনারা বাংলাদেশে সেক্যুলারিজমকে হত্যা করলেন কেন?' এর উত্তর তৈরি করতে আমার এক বা দুই মিনিট লেগেছিল কিন্তু আমি খুব ভালোভাবেই জানতাম যে আমি যা-ই বলি না কেন ওই ব্যক্তিকে বাজপেয়ির 'সেক্যুলারিজমের' বিশ্বাস থেকে একচুলও নড়াতে পারতাম না। অন্যদিকে এই প্রশ্নকেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। যেমনটি তালুকদার মনিরুজ্জামান উল্লেখ করেছেন:

> মুজিব তাঁর শাসনামলের শেষ দিকে ভাষণ এবং জনসমক্ষে কথাবার্তায় বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যবহারের মাধ্যমে প্রায়শ ইসলামের উদাহরণ দিতেন, যা প্রধানত ইসলামমুখী বাংলাদেশিরাই ব্যবহার করত। তিনি আল্লাহ, ইনশা আল্লাহ, বিসমিল্লাহ, তাওবা এবং ইমানের মতো শব্দসমূহ ব্যবহার করতেন। পরবর্তী সময়ে এমনকি মুজিব তাঁর জনপ্রিয় বিদায় প্রকাশের ভঙ্গি 'জয় বাংলা' ত্যাগ করেন এবং ভাষণের শেষে বিদায় জানানোর ঐতিহ্যবাহী ইন্দো-ইসলামিক শব্দগুচ্ছ 'খোদা হাফেজ' বলা শুরু করেন। তাঁর শাসনামলের শেষ দিকের ভাষণগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা মুজিব বিশেষভাবে উল্লেখ করতেন।[২৯]

জিয়াউর রহমান আর এক পা এগিয়ে বাস্তবিকভাবেই অনেক বাঙালি মুসলমানের আকাঙ্ক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেন। মে, ১৯৯৭ সালে এক সরকারি প্রজ্ঞাপনের সংবিধান থেকে 'সেক্যুলারিজমকে' বাদ দেওয়া হয় এবং এর পরিবর্তে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি' শব্দগুচ্ছকে সংবিধানে সংযুক্ত করা হয়।[৩০] কিন্তু মনিরুজ্জামানের মতে, আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো 'বইগুলোকে ইসলামীকরণের জন্য নানা মহল থেকে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের উপর চাপ বাড়তে থাকে এবং পরবর্তীতে বেশি করে ইসলামি বিষয়গুলো বইতে সংযুক্ত করা হয়'।[৩১] এক পক্ষের উত্থানের জন্য অন্য পক্ষের ধ্বংসের প্রয়োজন হয়।

এই উদাহরণ কি বিজেপি এবং মুরলি মনোহর যোশীর চেয়ে খুবই ভিন্ন ছিল? লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের পতন এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ক্ষমতায় ফিরে আসার পর মীরা নন্দ ভারতের মুক্তচিন্তাবিদদের বিজ্ঞান ও ধর্মের

মধ্যে পুরোপুরি পার্থক্যরেখা টানার আহ্বান জানান, যা যোশী বিপজ্জনকভাবে গুলিয়ে ফেলেন:

> হিন্দুবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসীরা 'হিন্দু ভারতকে' 'জাতিসমূহের গুরু' হিসেবে তৈরি করার দাবি করেছে, কারণ একমাত্র হিন্দুত্ববাদই আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; যেখানে অন্য সব 'সেমেটিক' বিশ্বাস আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে...।[৩২]
>
> এটা সেই অন্ধ বিশ্বাস যা ড. যোশী এবং তার গোড়া অনুসারীদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক জ্যোতিষবিদ্যা বিভাগ খোলার পেছনে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং যেখানে দুনিয়ার তাবত কুসংস্কারের পেছনে কর প্রদানকারীদের অর্থ ঢালা হচ্ছে...।
>
> এই অন্ধ বিশ্বাসকে নস্যাৎ করা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত...। অসহনীয় কুসংস্কারের অস্তিত্বকে অস্বীকার এবং তীব্র হিন্দু ও আর্য বর্ণবাদী অতিস্বরের জন্য এটাকে আমাদের অবশ্যই নস্যাৎ করতে হবে।

কিন্তু বাস্তবে কাজটি এত সহজ নাও হতে পারে। নতুনতর চাহিদার ফলে হয়তো 'অগ্রহণযোগ্য' এবং 'বিতর্কিত' বিষয়সমূহ বহাল থাকবে। যেমনটি সম্প্রতি এক পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: এতে 'বিতর্কিত' ভাস্কর্যের তালিকা থাকা সত্ত্বেও 'দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বইটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে, কারণ যেহেতু আগামী বছর শিক্ষার্থীরা বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাই দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মনোযোগ নষ্ট করা উচিত হবে না'।[৩৩] দক্ষিণ এশিয়ার নিয়ত পরিবর্তনশীল রাজনীতির কারণে কে জানে আগামী বছর কী ঘটবে? এটা অবশ্যই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোটের চেয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট মাত্র ৩০টা সংসদীয় আসনে পিছিয়ে থাকলেও, মোট ভোটের হিসাবে কিন্তু কিছুটা এগিয়েই আছে (বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের ভোট ৩৫.৩১ শতাংশ এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোটের ভোট ৩৫.১৯ শতাংশ)।[৩৪]

অন্য নস্যাৎকরণটি আরও বেশি বাস্তব ও নৃশংস। প্রায় প্রতিটি দাঙ্গাতেই মন্দির ও মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। মাত্র তিনটি প্রতিবেদন দেখা যাক:[৩৫]

১. ১৯৯২ অযোদ্ধা: ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে হাজার হাজার কারসেবক বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলেছিল...। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ফলে ভারতের বিভিন্ন অংশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও বাংলাদেশেও দেখা দিয়েছিল। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে হিন্দুবিরোধী দাঙা ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে বেশ কিছু মন্দির আক্রমণ ও ধ্বংস করা হয়।

২. ২০০২ লোহারু: ১৭ মার্চ, ২০০২ সালে হরিয়ানার ভায়ওনি জেলার লোহারুতে সাম্প্রদায়িক দাঙা বাধে। এই দাঙার কারণ ছিল গরু জবাইয়ের গুজব। এতে হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খল জনতার একটি দল দুটি মসজিদ আক্রমণ

করেছিল। তারা সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের কমপক্ষে ১৫টি দোকান ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়...। হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খল জনতা রেলস্টেশনের কাছে আরেকটি মসজিদও জ্বালিয়ে দেয়।

৩. ২০০২ হুগলি : ৫ এপ্রিল, ২০০২ সালে কলকাতার কাছে হুগলি জেলায় তিনটি মসজিদের বাইরে দুটি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল। শুক্রবার নামাজের পরে ঘটা এই বিস্ফোরণে আটজন আহত হয়েছিল...। একজন দুষ্কৃতকারী একটি বোমা বহন করছিল, যেটি বিস্ফোরিত হয়ে সে নিজে মারাত্মকভাবে আহত হয়...। এই দাঙ্গায় একজন মারা যায়, সাতজন আহত হয় এবং ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বাংলাদেশেও একই অবস্থা বিদ্যমান। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের ওপর প্রতিটি নৃশংসতার সময়ই মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট ও ধ্বংসের ঘটনা ঘটে। অক্টোবর, ২০০১ সালে নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে যখন বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় ফিরে এসেছিল, তখন ঢাকা, ফেনী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, খুলনা ও চট্টগ্রাম জেলায় বেশ কিছু মন্দির আক্রমণ এবং অপবিত্র করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে 'অন্যদের' আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ধ্বংসের একটি উন্মত্ত প্রতিযোগিতা এখানে দেখা যাচ্ছে এবং আরও করুণ বিষয় হচ্ছে সীমান্তের বাইরের 'অন্যরা' এখন ভেতরে অবস্থান করছে।

একবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কর্মরত ছিলেন এমন এক অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস (ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস) কর্মকর্তা আমার সঙ্গে 'অন্যদের' বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। একবার নির্বাচনের এক বা দুদিন আগে এক রাজনীতিবিদ তাঁর কাছে এসেছিলেন এবং কোনো রকম পাপবোধ ছাড়াই তাঁকে বলেছিলেন : 'আপনাকে আগামীকাল সকালবেলা কিছু সময়ের জন্য সীমান্ত খোলা রাখতে হবে, সীমান্তের ওপার থেকে প্রায় ২০,০০০ লোক আমার দলের পক্ষে ভোট দিতে আসবে।' 'সীমান্ত খোলা রাখব?' ওই কর্মকর্তা তড়িঘড়ি জিজ্ঞেস করেছিলেন। ওই রাজনীতিবিদ বলেছিলেন : 'হুম, আপনি অন্য কোথাও ব্যস্ত থাকবেন, এই লোকগুলো সকালবেলা আসবে এবং সন্ধ্যাবেলার মধ্যে সবাই ফিরে যাবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা নিশ্চিত করব। চিন্তা করবেন না!' তারপর তিনি কী করেছিলেন আমি জানতে চেয়েছিলাম। 'অবশ্যই আমি ওই রাজনীতিবিদের অনুরোধের সঙ্গে একমত হতে পারিনি, কিন্তু এমন একটি প্রস্তাব রাখার সাহস দেখে আমি সম্পূর্ণ বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। সীমান্ত এলাকার পরিস্থিতি কতটা ভিন্ন তা বোঝা গিয়েছিল। এখন আমি জানি কেন মানুষ বলে, সীমান্তের আশপাশে শুধু সন্ত্রাসী দলগুলোই আস্তানা গড়ে!' তাঁর অন্য গল্পটিও সমান তাৎপর্যপূর্ণ। একজন বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ভারতে এসে তাঁর পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর ভারতীয় বন্ধুরা এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে ওই ব্যবসায়ীকে অবৈধভাবে

একটি নতুন ভারতীয় পাসপোর্ট তৈরি করে দিয়েছিলেন। এরপর ওই ব্যবসায়ী বাংলাদেশ হাইকমিশনে গিয়ে ফিরতি যাত্রার জন্য বাংলাদেশি ভিসা নেন। ঢাকায় পৌঁছানোর পর তিনি ভারতীয় হাইকমিশনে গিয়ে হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের সত্য কথা বলে তাঁর নতুন ভারতীয় পাসপোর্ট সমর্পণ করেছিলেন! ওই আইপিএস কর্মকর্তার মতে, রাষ্ট্রীয় জটিলতা ছাড়াও ক্ষমতাবান 'অন্যদের' সাহায্য ছাড়া রাজনীতিবিদ বা ব্যবসায়ী কেউই তাঁদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে সফল হতেন না। কিন্তু এর অন্য দিকও আছে।

শ্রমের জগৎ

দেশ বিভাগ 'অন্যদের' আকাঙ্ক্ষায় দোটানা সৃষ্টি করেছিল, যা অনেককে দেওয়া-নেওয়ার প্রাচীন ঐতিহ্যে নিয়োজিত রাখে। নিরাপত্তাকর্মী, গোয়েন্দা সংস্থা এবং সরকারের অন্যান্য দমনমূলক সংস্থার সার্বক্ষণিক নজরদারি সত্ত্বেও অনেকে এ ক্ষেত্রে বেশ সাফল্য অর্জন করে। তবে এখনো রাষ্ট্রীয় জটিলতাও বিদ্যমান, কারণ শ্রমই (আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক, বৈধ/অবৈধ) হলো রাষ্ট্রের পুনরুৎপাদনের ভিত্তি। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে আমি শ্রমিক শোষণ এবং মুনাফা সর্বোচ্চকরণবিষয়ক একটি সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি দিতে চাই। এই পরিবর্তন সহজ জ্ঞানেই 'অন্যদের' ভয়ানক ভাবমূর্তিকে দৃঢ়তর করেছে। আমি অবশ্যই বিশ্বায়নকে নির্দেশ করছি।

বিশ্বায়ন জ্ঞান এবং আচরণের বহু জগৎ বা একটি বহুরৈখিকতার জন্ম দিয়েছে। যার ফলে আমরা বিশ্বায়নের বিভিন্ন ধরনের চেহারা দেখতে পাচ্ছি। একটি নির্দিষ্ট ভাষ্য—নিম্নবর্গীয় বিশ্বায়ন—এই নিবন্ধের যুক্তিগুলো বুঝতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ, ব্যাখ্যা করা যাক।

আমরা সবাই অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বা 'ওপর থেকে বিশ্বায়নের' সঙ্গে পরিচিত।[৩৬] এটা দ্বারা বোঝানো হয় যে বাণিজ্য, অর্থায়ন ও বিনিয়োগের আন্তর্জাতিকীকরণ ছাড়াও উৎপাদন প্রক্রিয়ার আন্তর্জাতিকীকরণের ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এখন কয়েকটি দেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে, অতঃপর অন্য কয়েকটি দেশে সেগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করে এবং সবশেষে উৎপাদিত পণ্য সারা বিশ্বে রপ্তানি করে। তাই এখন একটি চূড়ান্ত পণ্যের গায়ে একক কোনো উৎপাদনচিহ্ন থাকে না, বরং যেহেতু এটা উৎপাদনে বিভিন্ন রাষ্ট্র জড়িত তাই এর গায়েও অনেকগুলো উৎপাদনচিহ্ন থাকে। এদিক থেকে দেখতে গেলে একটি কম্পেক কম্পিউটার পুরোপুরি আমেরিকান নয় বা একটি টয়োটা গাড়িও পুরোপুরি জাপানি নয়। উভয় পণ্যের ক্ষেত্রেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। ভিন্নভাবে বললে, আগের পণ্যের

আন্তর্জাতিকীকরণের জায়গায় পুঁজিবাদ বিশ্বায়নের এই যুগে পণ্য নিজেই এখন আন্তর্জাতিক বা বৈশ্বিক।

বিশ্বায়নকে দৃঢ়করণ এবং জানান দেওয়ার আরও এক ধরনের মিথস্ক্রিয়া আছে।[৩৭] প্রকৃতপক্ষে, সমালোচকেরা অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন রোধে গড়ে ওঠা বৈশ্বিক নেটওয়ার্ককে ইতিমধ্যে 'নিচ থেকে বিশ্বায়ন' বলে অভিহিত করছেন।[৩৮] এই নেটওয়ার্কে নানা ধরনের লোক আছে—পরিবেশবাদী, এনজিও, ধর্মীয় গোষ্ঠী, প্রান্তিক কৃষক, শ্রমিক ইউনিয়ন (দৈবাৎ উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় ধরনের রাষ্ট্র থেকে), নারীবাদী আন্দোলন কর্মী, ভোক্তাবাদী, আফ্রিকান ঋণ মওকুফ আন্দোলনকারী, ঘর্মশালাবিরোধী কর্মী এবং এ রকম অন্যান্য—এরা সবাই কোনো না কোনোভাবে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের সমালোচনাকারী বা সরাসরি অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত অথবা এর ভুক্তভোগী। এই প্রতিরোধ আন্দোলনের, বিশেষত এর পারস্পরিক নেটওয়ার্কের নিম্নবর্গীয় চরিত্রকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই।

অন্যদিকে, নিচ থেকে বিশ্বায়নের ধারণার গভীরতর নিম্নবর্গীয় একটি ধারা আছে। এই ধারা পণ্য চোরাচালান ও মানব পাচার, অবৈধ ছোট অস্ত্র ও বিস্ফোরক চোরাচালান, অর্থ পাচার, নেশাদ্রব্য উৎপাদন ও বাণিজ্য, সন্ত্রাসবাদ এবং সমগোত্রীয় অন্যান্য কাজে জড়িত 'সন্দেহজনক গোষ্ঠী' এবং 'অস্পষ্ট কর্মকাণ্ডের' মধ্যকার গভীর সম্পর্ককে নির্দেশ করে। এই ধারার সঙ্গে নানা জাতি, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, বর্ণ ও ধর্মীয় সম্পর্কও রয়েছে। নিম্নবর্গীয়, বিশেষ করে দারিদ্র্যপীড়িত ও প্রান্তিক মানুষ এসব গোষ্ঠী এবং কর্মকাণ্ডের সহজ শিকারে পরিণত হয়, কিন্তু নিম্নবর্গীয় হওয়ার কারণেই অনেক অপেক্ষাকৃত ধনী গোষ্ঠী এদের কাজে সমর্থন জানায় এবং গোপনে এদের জন্য কাজ করে। দারিদ্র্য ও প্রান্তিকতার দীর্ঘায়িত প্রকৃতি এবং তাদের জন্য স্বতন্ত্র বৈশ্বিক কোনো উদ্যোগ না থাকায় এই গোষ্ঠীগুলো তাদের টিকে থাকা বা ভাগ্যবদলের লড়াইয়ে অনানুষ্ঠানিক বা অপরাধপ্রবণ পথে চলে যায়। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নবিরোধী আন্দোলনগুলোর সঙ্গে এই পর্যায়ের যৌগিক মেলবন্ধনকে একসঙ্গে মিলিয়ে এটাকে 'নিম্নবর্গীয় বিশ্বায়ন' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এখানে নিম্নবর্গ, তাদের উদ্দীপ্ত সমর্থক ও সমব্যথীরা মিলে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং দৃঢ়করণে কোনো অংশে কম সৃজনশীল ও ক্ষমতাবান নয়। এটা করার ক্ষেত্রে তারা প্রায়ই অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের দানবীয় শক্তিকে মোকাবিলা করে থাকে। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনের নিম্নবর্গীয় অংশকে অস্বীকার করা যায় না। সিয়াটল, রোম, প্রাগ বা ওয়াশিংটনে বিশ্বায়নবিরোধী বিক্ষোভ এটাই নির্দেশ করে যে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন এই নিম্নবর্গীয় বা প্রান্তিক শক্তিসমূহকে এক ভয়াবহ

পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছে। অন্য অর্থে, এই বিক্ষোভসমূহ বিশ্বব্যাপী নিম্নবর্গীয়দের দুঃখ-দুর্দশাকে তুলে ধরছে।

যা হোক, এই প্রতিরোধ আন্দোলন নিম্নবর্গীয়দের জীবন ও জীবিকা বদলে দিতে পারে না। জেমস মিটেলম্যানের মতে, 'দারিদ্র্য যেখানে তীব্রতর, অপরাধী গোষ্ঠীগুলো সেখানে সক্রিয় হয়ে ওঠে'।[৩৯] দারিদ্র্য ও অপরাধপ্রবণতার মধ্যে সম্পর্ক এতটা সরলও নয়। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নবর্গীয় অবস্থা রাষ্ট্রের ক্ষমতা দৃঢ়করণে মানুষকে নিরুৎসাহিত করে ফেলে। অন্যদিকে, অপশাসন তখন নিয়মে পরিণত হয়। জনসাধারণ, বিশেষত নিম্নবর্গীয়রা তখন জীবন নির্বাহের জন্য অনানুষ্ঠানিক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর অধিক হারে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য অযোগ্য এবং প্রায় দুর্নীতিবাজ সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের বিপরীতে 'গডফাদার', 'ভাড়াটে গুন্ডা, 'মাস্তান' এবং এ ধরনের শক্তিসমূহের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তখন লেনদেনের এক অস্পষ্ট নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে এবং এই প্রক্রিয়ায় শুধু রাষ্ট্রীয় নয়, বরং নিম্নবর্গীয় শক্তিকেও অস্থির করে তোলে, যা প্রকৃত প্রস্তাবে এদের আরও দুর্বল ও ক্ষমতাহীন করে ফেলে। এটা ফলে নিম্নবর্গীয় বিশ্বায়ন পরিচালনা এবং দৃঢ় করতে নতুন নিয়োগ এবং সৃজনশীল কিন্তু দানবীয় উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এই জটিল কাঠামোটি কিছুটা দানবীয়ভাবে পরিকল্পিত।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাকারবারবিষয়ক এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, 'সাধারণ পুরুষ, নারী এমনকি শিশুরাও বাহক, কুলি এবং রিকশাচালক ছদ্মবেশে চোরাকারবারের কাজে অংশগ্রহণ করে।'[৪০] এই গবেষণা এটাই নির্দেশ করে যে চোরাকারবারের নিম্নবর্গীয় রূপ আপাত প্রতীয়মান ব্যবস্থার চেয়েও অনেক বেশি জটিল। নিম্নবর্গীয় অসহায়ত্ব তাদের প্রায়ই নিজেদের ইচ্ছায় চোরাকারবারিদের সহজ শিকারে পরিণত করেছে। এটা নিম্নবর্গীয় চোরাকারবারের শিকার এবং চোরাকারবারের উপায়সমূহ তাদের জন্য সহজলভ্য করে করা হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য, চোরাকারবারি এবং চোরাচালান-বাহকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে, যদিও উভয়ই সমাজ ও বিশ্বকে অপরাধকবলিত করার কাজে জড়িত।[৪১] চোরাকারবারি হচ্ছে মূলধন বিনিয়োগকারী ব্যক্তি, অন্যদিকে চোরাচালান-বাহক হচ্ছে নিছক শ্রমিক, যাকে প্রতিবার সফলভাবে পণ্য গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার বিনিময়ে নগদ অর্থ পরিশোধ করা হয়। এই চোরাচালান-বাহকই তার যাত্রার প্রতিটি ধাপে নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ দেওয়ার মতো নোংরা কাজগুলো করে। অন্যদিকে, চোরাকারবারি চোরাচালানকৃত পণ্য থেকে বড় মাপের মুনাফা ভোগ করে। চোরাচালান-বাহকের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা নিছক অন্য একটি

পেশামাত্র, যা তারা ভালো কিছু পাওয়ার আশায় কিছুটা বেপরোয়াভাবে করে থাকে এবং যা বেপরোয়া নিম্নবর্গীয়দের জীবন ও জীবিকার জন্য সমানভাবে প্রয়োজনীয়।

কিন্তু ভারত থেকে বাংলাদেশে কি চোরাচালান হয়ে আসে? প্রায় সবকিছুই। স্টিলের রন্ধনশৈলী, কীটনাশক, সার, চিনি, সাইকেল, মোটর এবং রেডিও-টেলিভিশনের যন্ত্রাংশ, প্রসাধনদ্রব্য, মোটরসাইকেল, তৈরি পোশাক, ফোন, এয়ারগান, গুঁড়ো দুধ, লবণ, ফলমূল, জুতা, ঘড়ি, পিকআপ ভ্যান, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, হেরোইন, অ্যালকোহল, ফেনসিডিল, উত্তেজক বড়ি ইত্যাদি। দিল্লিতে কাজ করা এক সাবেক বাংলাদেশি কূটনীতিক একবার বলেছিলেন, বাংলাদেশের গ্রামে ব্যবহৃত ৪০ শতাংশ বস্তুই ভারত থেকে চোরাচালানকৃত পণ্য। ভারতীয় একটি দৈনিক পত্রিকার সাবেক সাংবাদিক এবং বর্তমানে একজন একাডেমিক মোহন একটু ভিন্নভাবে একই কথা বলেছিলেন। 'আপনি কি জানেন বিএসএফের সংজ্ঞা কী?' আমি উত্তর দেওয়ার আগেই তিনি তড়িঘড়ি করে বলরেন : 'বর্ডার স্মাগলিং ফোর্স (সীমান্ত চোরাকারবার বাহিনী)'। তাহলে, প্রশ্ন থেকে যায় এই চোরাকারবারের কারণ কী? ভ্যান শেন্ডেলের মতে: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার আন্তসীমান্ত বাণিজ্যে একটি অতিপরিচিত পণ্য চিনিতে মুনাফা লাভের সম্ভাবনা পরিষ্কারভাবে অত্যন্ত বেশি ছিল। বাংলাদেশ একট চিনি উৎপাদনকারী রাষ্ট্র হলেও ভারতে চিনির মূল্য বাংলাদেশের চেয়ে অনেক কম ছিল। ১০০ কেজির এক বস্তা চিনির মূল্য কলকাতায় ছিল ৬০০ রুপি এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী শহরগুলোতে তা ছিল ৯০০ রুপি (২০০০ টাকা)। ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও কলকাতা থেকে বাণিজ্য করা বড় চিনি ব্যবসায়ীরা লাখ লাখ টাকা মুনাফা আশা করতে পারতেন, যা তাঁদের বিনিয়োগের কমপক্ষে শতকরা ২৫ ভাগ হতো। অন্যান্য পণ্যের (লবণ, শাড়ি, গুঁড়ো দুধ ইত্যাদি) বৃহৎ বাণিজ্যও একই ধরনের মুনাফা জোগাবে।[৪২]

দুটি পণ্য বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে: অবৈধ মাদক এবং নিষিদ্ধ ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য। দেশে প্রতিবছর আমদানি হওয়া অবৈধ মাদকের পরিমাণ বেশ উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৩ সালে শুধু বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডই সীমান্ত এলাকা থেকে নিম্নবর্ণিত পণ্যগুলো আটক করে: হেরোইন (৪,৩১৬ কেজি), আফিম (৬,৩০০ কেজি), চরস (৪,৩০০ কেজি), গাঁজা (৩৪০.৩৯০ কোজি), ভাং (২,৭৯০ কেজি), অ্যালকোহল (৩১৯১ বোতল) এবং ফেনসিডিল (২৩,২৮৭ বোতল)।[৪৩] ২০১২ সালে সব আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মিলে ৩৮, ৭০২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে যা ২০১১ সালে ছিল ৫৪, ২৪৪ কেজি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী ২০১২ সালে ১২৪.৯২ কেজি হেরোইন এবং ১,২৯১,০৭৮ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। এর সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে ইয়াবা। একজন

মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তার মতে, মিয়ানমার থেকে একটি ইয়াবা ট্যাবলেট ১০০ টাকা দিয়ে কিনে ঢাকায় ৬০০ থেকে ১,০০০ টাকায় বিক্রি করা যায়।[৪৪] দক্ষিণ এশিয়ার মাদক নেটওয়ার্ক এতটাই সক্রিয় এবং সৃজনশীল যে কার্গিল যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়েও আফিম আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে এবং সেখান থেকে ভারতে এসেছে এবং প্রক্রিয়াজাত হয়ে হেরোইনও তৈরি করা হয়েছে। মাদক পাচারে মুনাফা অনেক বেশি। এক হিসাবমতে, (১৯৯৮ সালের মূল্যে) ৯০ শতাংশ বিশুদ্ধ এক কেজি হেরোইনের মূল্য প্রায় ২৬০০ মার্কিন ডলার এবং একই পরিমাণ হেরোইন ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করলে এর দাম বেড়ে হয় ৫২০০ মার্কিন ডলার। যখন এটা দিল্লিতে গিয়ে পৌঁছে তখন এর মূল্য ৭০০০ থেকে ৭২০০ মার্কিন ডলারে পরিণত হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যের সঙ্গে তুলনা করলে দিল্লিতে এর মূল্য এখনো পরিমিত। মার্কিন বাজারে এক কেজি হেরোইনের মূল্য ৬০,০০০ মার্কিন ডলার।[৪৫] এটা সহজে বোধগম্য যে আন্তমহাদেশীয় পর্যায়ে হেরোইন পাচার এবং এর থেকে মুনাফার জন্য একটি আঞ্চলিক কাম বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক প্রয়োজন। এটা ভালোভাবে অনুমানযোগ্য যে ভারত ও বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেকগুলো শহর ট্রানজিট এবং গন্তব্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এই বিশাল নেটওয়ার্ক থেকে মুনাফা অর্জন করছে। নিষিদ্ধ ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যের বেলাতেও প্রায় একই অবস্থা বিদ্যমান।

উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে প্রায় দুই লাখ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র আছে এবং সবগুলোই লোকমুখে মাস্তান হিসেবে পরিচিত স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হাতে রয়েছে। কিছু প্রতিবেদন অনুসারে, সীমান্তপথে প্রতিদিন প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র দেশে প্রবেশ করে, যা এই অঞ্চলে একটি অনানুষ্ঠানিক অস্ত্রের বাজারের অস্তিত্বকে নির্দেশ করছে। দেশের ভেতরেই স্থানীয় অবৈধ কারখানায় ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র উৎপাদন করা হচ্ছে। ২০০১-২০০২ সালে অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার এতটাই অবাধ হয়ে গিয়েছিল যে অপরাধীদের সাজার আওতায় নিয়ে আসতে বাংলাদেশ সরকার 'অপারেশন ক্লিন হার্ট' নামক সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিল। এই অভিযানে যৌথ বাহিনীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা। এই অভিযানে ২০১৬টি বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল, যার মধ্যে ছয়টি একে-৪৭, দুটি এম-১৬ রাইফেল এবং কয়েকটি এসএমজি ছিল। ওই অভিযানে অনেক স্থানীয় অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছিল। এগুলো হয় চোরাচালান হয়ে এ দেশে এসেছিল অথবা দেশের অভ্যন্তরেই এগুলো উৎপাদিত হয়েছিল। কিন্তু এটুকুর মধ্যেই সবকিছু সীমাবদ্ধ নয়।

২৭ জুন, ২০০৩ সালে পুলিশ বগুড়ার কাহালু থানার জোগারপাড়া গ্রামের এক বাড়ির উঠানে পরিত্যক্ত এক ট্রাক থেকে ৬২,১১২ রাউন্ড চায়নিজ রাইফেলের

বুলেট এবং ১২০ কেজি বিস্ফোরকদ্রব্য উদ্ধার করেছিল। পরবর্তী সময়ে পার্শ্ববর্তী এলাকায় অভিযান চালালে আরও গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার হয়, যার মধ্যে ছিল প্রাণঘাতী আরডিএক্স। সর্বমোট প্রায় এক লাখ বুলেট এবং প্রায় ২০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছিল। এরপর আবারও ২০০৪ সালের ১-২ এপ্রিল রাতে চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপকূলের একটি সরকারি মালিকানাধীন জেটিতে পুলিশ ও কোস্টগার্ড অবৈধ অস্ত্র জব্দ করে। এটাকে বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক জব্দকৃত 'এককভাবে সবচেয়ে বৃহৎ' অস্ত্রের চালান হিসেবে বর্ণনা করা হয়। নিম্নে চট্টগ্রামে জব্দ হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদের বিস্তারিত পরিসংখ্যান দেওয়া হলো;

চট্টগ্রামে জব্দ হওয়া অস্ত্রসমূহ :[৪৬]

অস্ত্রের ধরন	সংখ্যা
৭.৬২ এমএম টি-৫৬-আই এসএমজি	৬৯০
৭.৬২ এমএম টি-৫৬-এসএমজি	৬০০
৪০ এমএম রকেট লঞ্চার টি-৬৯	১৫০
৪০ এমএম রকেট	৮৫০
৯ এমএম সেমি-অটোমেটিক স্পট রাইফেল	৪০০
টমি গান	১০০
গ্রেনেড লঞ্চার	২,০০০
টি-৮২-২ হ্যান্ড গ্রেনেড	২৫,০২০
৭.৬২ এমএম বুলেট	৭৩৯,৬৮০
৭.৬২ এমএম পিস্টল বুলেট	৪০০,০০০

জব্দ হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে। অনেকের মতে, এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলো উলফার কাছে যাচ্ছিল, অন্যদের মতে এগুলো ত্রিপুরার বিদ্রোহীদের কাছে যাচ্ছিল। এমনকি অনেকে সম্ভাব্য ক্রেতার তালিকায় নেপালের মাওবাদী ও কাশ্মীরি জঙ্গিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। একটা আপাত তত্ত্ব এটা হতে পারে যে এই চালানটি হংকং থেকে তামিল টাইগারদের কাছে যাচ্ছিল কিন্তু ভারতীয় বা শ্রীলঙ্কান নৌবাহিনীর ধাওয়ার মুখে সরবরাহকারীরা এই অস্ত্রগুলোকে বাংলাদেশে একটি নিরাপদ গোডাউনে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল, যাতে করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে চালানটি তার আসল খরিদ্দারের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। অস্ত্রের ধরন দেখে এটাকেই সত্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যা হোক,

শঙ্কার বিষয় হচ্ছে, হংকং থেকে দক্ষিণ এশিয়া এবং এমনকি এর বাইরেও অবৈধ অস্ত্রের একটি জটিল নেটওয়ার্কের অবস্থান। তা ছাড়া এই অস্ত্রগুলোর মধ্যে কিছু স্থানীয় বাজারে ঢুকে পড়ার মাধ্যমে মাস্তান এবং দক্ষিণ এশিয়ার নিম্নবর্গীয় বিদ্রোহীদের হাতে যে পৌঁছাবে না, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। ২০১২ সালে দেখা যায় সর্বমোট ২,৫০০ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্র থেকে জানা যায় আগ্নেয়াস্ত্র-সম্পর্কিত মামলা ২০১২ সালে অনেক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬২৭টি এবং প্রায় ২,৬০০ জনকে অবৈধ অস্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থাকায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।[৪৭]

শেষ কথা

সন্দেহপূর্ণ এবং অস্পষ্ট শ্রমের 'অন্য' জগৎ, শুরুতে অনুতপ্ত এবং আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ প্রতীয়মান হওয়া ভূখণ্ডবন্দী 'অন্যদের' স্থান দখল করে নিয়েছে, যারা শুধু রাষ্ট্রের উদারতায় জীবিকা নির্বাহে উৎসাহী ছিল। এই সন্দেহপূর্ণ 'অন্যরা' একটি ক্ষমতাবান সত্তা, যারা মানব পাচার থেকে মাদক পাচারসহ প্রায় সব ধরনের চোরাকারবারের দ্বারা তহবিলপ্রাপ্ত। একে-৪৭, এসএমজির মতো অস্ত্র ও বিস্ফোরকসমৃদ্ধ এবং সৃজনশীল কিন্তু অস্পষ্ট ব্যাংকিং সুবিধাপ্রাপ্ত এই সন্দেহপূর্ণ 'অন্যরা' জীবন এবং জীবিকায় আঘাত হানতে প্রস্তুত। নিম্নবর্গীয় বিশ্বায়নের প্রভাবে এই 'অন্যরা' কখনো ভারতীয়, কখনো বাংলাদেশি, কখনো উভয় রাষ্ট্রের এবং কখনো ভারত ও বাংলাদেশ দুই রাষ্ট্রেরই বাইরের। নিজের চাহিদা ও সরবরাহ কীভাবে সৃজনশীলতার সঙ্গে কাজে লাগাতে হয়, তা এরা জানে। রাষ্ট্র যেখানেই নিয়ন্ত্রণ হারায় বা সেবা দিতে ব্যর্থ হয়, সেখানেই এরা একটি উচ্ছৃঙ্খল উপস্থিতির মাধ্যমে বিশাল মুনাফা করে নেয়। বাংলাদেশ, ভারত এবং বাকি দক্ষিণ এশিয়ায় এ রকম উদাহরণ প্রচুর আছে।

এই সন্দেহপূর্ণ 'অন্যদের' নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাষ্ট্রকে পৌরাণিক ওয়েস্টফেলীয় মর্যাদায় শক্তিশালী করার কোনো যুক্তি নেই, কারণ রাষ্ট্র নিজেই 'অন্যদের' সঙ্গে জটিলতায় জড়িয়ে আছে। বছরের পর বছর যখন পুলিশ, নিম্ন আদালত, প্রশাসন, সরকার বা বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদেরা, আর্থিক খাত এবং অন্যান্য অগণিত প্রতিষ্ঠান নিজেদের শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে, তখন তারা তাদের অজান্তেই এই সন্দেহপূর্ণ 'অন্যদের' শক্তিকে মজবুত করেছে। এই সন্দেহপূর্ণ 'অন্যদের' নিয়ন্ত্রণে ভারত ও বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের সামগ্রিক ব্যর্থতাই এই ক্ষেত্রে সমন্বিত এবং যৌথ উদ্যোগ নেওয়ার পেছনে বেশ কার্যকর যুক্তি হতে পারে; যদিও তা দেশজ জ্ঞান-কল্পনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এটা অবশ্যই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না যে এ রকম সমন্বয় এমন এক অঞ্চলে দাবি করা হচ্ছে যেখানকার

অনুন্নয়ন বেশ দৃষ্টিগ্রাহ্য, যদিও বিপরীত দিকে ইউরোপের দৃষ্টিগ্রাহ্য উন্নয়নের সময়েও তাদের এ ধরনের সমন্বিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত যৌথ বাহিনী রয়েছে।

একটি রাষ্ট্রের অবশ্যই 'অন্য রাষ্ট্রকে' ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করা থেকে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। এই ন্যূনতম নীতি রাষ্ট্রের অবশ্যই থাকতে হবে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ মালদ্বীপের পরিবেশ বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা না করি, আর সব কটি রাষ্ট্রের মধ্যেই 'ব্যর্থ রাষ্ট্রের' অনুরূপ ছোট অঞ্চল আছে। এর মধ্যে জাফনা, করাচি, গুজরাট, নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার, কাশ্মীর, পার্বত্য চট্টগ্রাম, আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, উত্তর-পশ্চিম নেপাল, বিহারের অংশবিশেষ, দক্ষিণ ভুটান অপেক্ষাকৃত বেশি পরিচিত। যদি আমরা 'অপরাধ জগতের' শক্তিকেও আমাদের হিসাবে রাখি, তাহলে দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে এসব ছোট ব্যর্থ অঞ্চলের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে। এ ধরনের ক্ষুদ্রাঞ্চলগুলোর উপস্থিতি রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক সংস্থা, বিশেষত পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর শক্তি দৃঢ়করণের সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহপূর্ণ এবং অস্পষ্ট 'অন্যদের' জন্য আকর্ষণীয় ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরি করে। যখন এই সন্দেহপূর্ণ এবং অস্পষ্ট 'অন্যরা' ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে তখন এটা ব্যর্থতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া রাষ্ট্র এবং যে রাষ্ট্র এটিকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার কাজে মদদ জুগিয়েছে উভয়েই ব্যর্থতায় পরিণত হয়।

বিষয়গুলো পূর্বজ্ঞানভিত্তিক না হলেও, মাঝেমধ্যে প্রচারাভিযানটিই অদূরদর্শী প্রতীয়মান হয়। যেমন বাংলাদেশে আইএসআইয়ের (পাকিস্তানের ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স) ভূমিকার বিষয়টি ভারত বারবার দাবি করে আসছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্গানিক বুদ্ধিজীবী এবং গণমাধ্যমের একটি অংশ। অভিযোগকারীরা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে ভারতীয়রা নয়, বরং বাংলাদেশিদেরই পাকিস্তানের অধীনে প্রায় ২৫ বছর আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থায় বাস করতে হয়েছিল এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক সংগঠিত এক গণহত্যার পরই বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। তাই এখন বাংলাদেশিরা আইএসআই দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বলা অর্থ শুধু তাদের বিদ্রূপ করাই নয়, বরং এটা জটিল এবং বহুমাত্রিক বিরোধের বিষয়গুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্রের ঐকান্তিকতার অভাবই প্রকাশ করে। এই দ্বিপক্ষীয় বিষয়গুলো ভারত বা বাংলাদেশ কারোরই একার পক্ষে সমাধান করা বা নিয়ন্ত্রণে রাখার সম্ভাবনা ধীরে ধীরে কমে আসছে। একইভাবে কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড বা অন্য কোনো অঞ্চলে ভারতীয় রাষ্ট্র উপজাতীয়তাবাদী আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ যখন আহ্লাদিত হয়, তখন বাংলাদেশ এটা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে মাঝে মাঝে এই ভারতীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের শক্তি তাঁর ভূখণ্ডের ভেতরের রাষ্ট্রবিরোধী উপাদানসমূহকে শক্তিশালী করতে পারে (ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র এবং

মাদকের বাণিজ্য বা অর্থ পাচারের মাধ্যমে)। 'অন্যদের' নতুন অবস্থান নির্ধারণ করা একটি ভালো সূচনা হতে পারে। যে জায়গাগুলোতে সন্দেহপূর্ণ 'অন্যরা' ইতিমধ্যেই সক্রিয় এবং দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে—যেমন সীমান্তসংলগ্ন গ্রাম এবং শহরগুলোতে—এখন সেখান থেকেই তাদের 'সৃজনশীল' অনধিকার প্রবেশ এবং যোগাযোগের রীতিসমূহ জানতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, ইতিমধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এক ধরনের ভূখণ্ডবহির্ভূত নাগরিকত্বের প্রচলন রয়েছে কিন্তু তা শুধু অস্পষ্ট এবং সন্দেহপূর্ণ 'অন্যদের' দ্বারাই পরিচালিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে, বাংলাদেশ ও আসামের সীমান্তবর্তী শহর ও গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে অসমিয় ও বাংলা উভয় ভাষারই পাঠদান শুরু না করার কোনো কারণ নেই। অথবা শুধু সীমান্তবর্তী মানুষের জন্য এবং সেখানকার স্থানীয় মানুষদের দ্বারা পরিচালিত একটি অডিও-ভিজ্যুয়াল গণমাধ্যমও চালু করা যেতে পারে। রাষ্ট্রকে তাঁর অবস্থান দৃঢ় করতে হলে 'অন্যদের' জন্য অবশ্যই ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে এবং তাদের জীবনমান উন্নয়ন করতে হবে। অন্যথায় রাষ্ট্রের ব্যর্থতার কারণেই এরা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে 'অন্যদের' এই স্থান পরিবর্তন ভূখণ্ড বা মানুষ হিসেবে না হয়ে বরং, যেমনটা থিওডর জেল্ডিন বলেছিলেন যে 'সম্ভবত ব্যক্তি হিসেবে হওয়া উচিত।'[৪৮] রাষ্ট্রের ভূখণ্ডকেন্দ্রিকতা এবং 'অন্যের' ভয়ানক ভাবমূর্তির এই আত্মঘাতী কারণ দূর করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. এমনকি সাধারণ মানুষের মধ্যেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। দিল্লির Centre for the Study of Developing Societies পরিচালিত ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ এবং সহিংসতা বিষয়ে একটি প্রজেক্টে যখন ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছিল, তখন বাংলাদেশে যাদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল তারা ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল নিয়েই বেশি কথা বলেছিল। যেমনটি কুলদীপ নায়ার সম্প্রতি উল্লেখ করেছেন, 'বাংলাদেশ সরকার হয়তোবা দুরূহ আচরণ করছে (যেমনটি করছে ভারত সরকারও) কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ নয়, যাদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী, মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের সন্তানেরা রয়েছেন'। দেখুন—*The Indian Express*, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪।

২. দেখুন—Tom Lewis, 'The politics of' Hauntology,' in Derrida's 'Specters Of Marx,' in Michael Sprinker, ed., *Ghostly Demarcations: A Symposium on Jacques Derrida's Specter of Marx* (London: Verso, 1999), pp. 134-167.

৩. Brian Greene, *The Fabric of the Cosmos: Space Time, and the Texture of Reality* (New York: Alfred A. Knopf, 2004), p.139.

৪. E.P. Thompson, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *Nationalism*-এর সূচনাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ইউরোপে উত্তর-আধুনিকতাবাদ ধারণার আবির্ভাবের বহু পূর্বের একজন উত্তর-আধুনিক

ভাবুক বলে উল্লেখ করেছেন। দেখুন, Rabindranath Tagore, *Nationalism* (Calcutta: Rupa&Co, 1992).

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৬. দেখুন, Tai Yong Tan and Gyanesh, *The Aftermath of Partition in South Asia*, (London: Routledge, 2000) p.89.

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

৮. দেখুন, Nitin A. Gokhale 'A Tale of Two Blunders: Misplaced Machismo and Poorly Demarcated Border Combine to Lead to a Flare-up,' *Outlook Magazine*, 22 April, 2001.

৯. মার্চ, ১৯৭৪ সালে ভারত ও বাংলাদেশ একটি সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু ভারত কখনো এটা অনুসমর্থন করেনি। বাংলাদেশ এটাতে অনুসমর্থন করে (সংবিধান তৃতীয় সংশোধনী আইন, ১৯৯৪)। কিন্তু সেকশন-৩-এ শর্ত আরোপ করা হয় যে দুই দেশের মধ্যকার সীমান্তের সীমারেখা নির্ধারণের পরই চুক্তি কার্যকর হবে। দেখুন, *Outlook*, 11 June 2001, p.24.

১০. দেখুন, Amena Mohsin, 'Partitioned Lives Partitioned Lands', in imtiaz Ahmed, ed. *Memories of a Genocidal Partition: The Haunting Tales of Victims, Witnesses Perpetrators*, (Colombo: Regional Centre for Strategic Studies, 2002).

১১. তবে এসব দেয়াল এবং চীনের মহাপ্রাচীর বা এমনকি ম্যাজিনট লাইনের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। চীনের মহাপ্রাচীর এবং ম্যাজিনট লাইন উভয়ই নির্মাণ করা হয়েছিল ভিনদেশি শত্রুর উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই দেয়ালগুলোও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি।

১২. প্রাচীরবন্দী মানসিকতা অবশ্যই সংক্রামক। এখন ভুটান 'ভারতসংলগ্ন সীমান্তে দেয়াল চায়' দেখুন, *The Times of India*, 12 July 2004.

১৩. দেখুন, *The Hindu* (Madras), 9 December 1992.

১৪. দেখুন, *The Statesman*, 7 July 1994.

১৫. দেখুন, *The Statesman*, 11 September 1994.

১৬. দেখুন, *The Daily Star*, 5 August 1998.

১৭. দেখুন, Seema Kamdar, 'Illegal Influx: Bright lights beckon Bangladeshis,' *Times News Network*, 5, April 2004.

১৮. আমি অ্যাডমিরাল (অবসরপ্রাপ্ত) রমাদাশের কাছে এই তথ্যের জন্য কৃতজ্ঞ।

১৯. দেখুন, *The Daily Star*, 5 October 2000, p.12.

২০. দেখুন, Louise Brown, *Sex Slaves: the Trafficking of Women in Asia* (London: Virago Press. 2000), p.79.

২১. দেখুন, Nazmul Abedin, et.al. 'Trafficking of Women and Children in Bangladesh,' unpublished research paper, Department of International Relations, University of Dhaka, 26 May 1999, p.8.

২২. দেখুন, *The Independent* (Dhaka), 1 May 1997.

২৩. দেখুন, Louise Brown, 2000, p.135.

২৪. দেখুন, Sri Aurobindo, *India's Rebirth*, Paris & Mysore, Institute De Recherches Ecvolutives and Mira Aditi, 2000 edition, p.177, cited from Jyotirmaya Sharma, *Hindutva: Exporing the ldea of Hindu Nationalism* (New Dilhi: Penguin, 2003) p. 68.

২৫. দেখুন, Jyotirmaya Sharma, 2003, p. 69.

26. Mushirul Hasan, 'India's Partition Revisited,' in K.N. Panikkar, et.al.eds., *The Making of History: Essays Presented to Irfan Habib* (New Delhi: Tulika, 2000), p.558.

২৭. দেখুন, *The Pioneer* (New Dilhi: 5 January 2002.

২৮. প্রাগুক্ত।

২৯. দেখুন, Talukder Maniruzzaman, 'Bangladesh Politics: Secular and Islamic Trends,' in Rafiuddin Ahmed (ed.), *Religion, Nationalism and Politics in Bangladesh* (New delhi: South Asian Publishers, 1990) pp.73-74.

৩০. অনুচ্ছেদ ৮(১ক)। একই সময়ে সেক্যুলারিজম ঘোষণাকারী অনুচ্ছেদ ১২ রহিত করা হয়। দেখুন, Syed Anwar Husain, 'Bangladesh and Islamic Countries, 1972-1983,' in Mohammad Mohabbat khan and Syed Anwar Husain (eds.), *Bangladesh Studies: Politics, Administration, Rural Development and Foreign Policy* (Dhaka: The City Press, 1985), p.244.

৩১. দেখুন, Muniruzzaman,1990, pp.74-75.

৩২. বিষয়টি নন্দ আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন: 'হিন্দুত্ববাদের মূল বিশ্বাস নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়: চিরন্তন, সর্বজনীন বা অনধিযান্ত্রিক (non-mechanistic) প্রাকৃতিক বিধির মধ্যে হিন্দু ধর্মের মূল নিহিত আছে, যা 'বৈদিক আর্যদের' অন্তর্জ্ঞানের চমকে আবিষ্কৃত। এই বিধিসমূহ আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত, তাই হিন্দুত্ববাদ অনন্যরূপে বিজ্ঞানসম্মত। যেহেতু হিন্দুরা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত প্রাকৃতিক বিন্যাস অনুসারে জীবনধারণ করে, যা বস্তুকে উচ্চমার্গীয় আত্মার সঙ্গে মিলিত করে, তাই হিন্দুত্ববাদ আব্রাহিমিয় ধারার বিশ্বাসগুলোর চেয়ে অধিক যুক্তিসিদ্ধ এবং পরিবেশবান্ধব। অন্যদিকে আব্রাহিমিয় বিশ্বাসের অনুসারীরা এক কল্পিত অতিপ্রাকৃত সত্তার কাছ থেকে পাওয়া নৈতিক বিধি মেনে চলে এবং প্রকৃতিকে নিছক বস্তু হিসেবে গণ্য করে, যার কোনো আধ্যাত্মিক অর্থ নেই। যেহেতু হিন্দুত্ববাদ অতিশয় বিজ্ঞানসম্মত তাই ভারতে বিশ্বাস এবং যুক্তির মধ্যে এনলাইটেনমেন্ট ধারার কোনো বিতর্কের প্রয়োজন নেই। তাই সত্যিকার এবং গভীরভাবে বিজ্ঞানমনস্ক ভারতীয় হয়ে ওঠার জন্য—প্রকৃতপক্ষে গোটা বিশ্বের—অবশ্যই বেদ ও বেদান্তের শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে'। দেখুন, *The Hindu*, 22 May 2004.

৩৩. দেখুন, *The Times of India*, 15 July 2004.

৩৪. আপাতক সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত। দেখুন, *India Today*, 24 May 2004, p.25.

35. R.N.P. Singh, *Riots and Wrongs; Islam and Religious Riots: A Case Study* (New Delhi: India First Foundation, 2004), pp.279-280, 289-290.

৩৬. দেখুন, Imtiaz Ahmed, 'Globalization, State and Political Process in South Asia,' in Abdur Rob Khan, ed. *Globalization and Non-Traditional Security in South Asia* (Dhaka: Academic Press, 2001); এবং Jeremy Brecher, Tim Costello and Brendan Smith, *Globalization From Below: The Power of Solidarity* (Cambridge, Mass: South End Press, 2000).

৩৭. বিস্তারিত দেখুন, Imtiaz Ahmed, 'Contemporary Terrorism and the State, Non-State, and the Interstate: Newer Drinks, Newer Bottles,' in Sridhar K. Khatri and Gert W. Kueck, eds. *Terrorism in South Asia: Impact on Development and Democratic Process* (Colombo and New Delhi: RCSS and FAF, 2003).

৩৮. দেখুন, Brecher, Costello and Smith, 2000, p.10.

৩৯. দেখুন, James H. Mittelman, *The Globaliation Syndrome: Transformation and Resistance* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000), p.209.

৪০. দেখুন, Chandan Nandy, 'World Bank study indicts BSF, Customs,' *The Telegraph*, 21 January 1995.

৪১. দেখুন, Imtiaz Ahmed, 'Travails of Refugees across Bangladesh-India Border,' in Nancy Jetly, ed., *Regional Security in South Asia: The Ethno-Sectarian Dimensions* (New Delhi: Lancers, 1999), p.439.

৪২. দেখুন, Willem van Schendel, 'Easy Come, Easy Go: Smugglers on the Ganges,' *Journal of Contemporary Asia*, Volume 23, Number 2 (1993), p.200.

৪৩. দেখুন, *Statistics on Seized Illegal Drugs* (Limited Circulation), Bangladesh Rifles, Dhaka, 1 January 1993 to 31 December 1993.

৪৪. Abid Azad, 'Routes of Drug Trafficking,' *New Age*, 19 July, 2013, accessed at http://www.newagebd.com/supliment.php?sid=258&id=1843

৪৫. দেখুন, Shah, Giri Raj Shah, *Encyclopedia of Narcotic Drugs & Psychotropic Substance*, Volume 2, (New Delhi: Gyan publishing House, 1998), pp.515-516.

৪৬. বিভিন্ন পত্রিকা অবলম্বনে।

৪৭. Mohammadm Jamil Khan, 'Illegal Arms Flowing Through Our Porous Border,' *Dhaka Tribune*, 15 May, 2013.

৪৮. 'মানুষকে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন'। দেখুন, Theodore Zeldin, *An Intimate History of Humanity* (London: Vintage, 1998), p.469.

প্রতি চিন্তা
রাজনীতি

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

সাঈদ ইফতেখার আহমেদ

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে গত ৪২ বছরে গণতন্ত্রের নিরীক্ষা এর অগ্রযাত্রার পথে যে সংকট তৈরি করেছে, বর্তমান নিবন্ধে তার উৎসমূলসমূহ অনুসন্ধান করা হয়েছে। উত্তর (অভ্যন্তরীণ) ঔপনিবেশিক বাস্তবতার বিষয়সমূহ বিবেচনায় না রেখে ঔপনিবেশিকতার সূত্রে প্রাপ্ত গণতান্ত্রিক ধারণা এবং কাঠামোসমূহকে হুবহু অনুকরণ করার প্রচেষ্টাকে সংকটের উৎসমূল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে এ গণতন্ত্রের চর্চা একদিকে যেমন জন্ম দিয়েছে বিভাজিত জাতীয়তাবাদ, অন্যদিকে ডান সর্বাত্মকবাদী দল এবং গোষ্ঠীসমূহের অবস্থান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুসমুন্নত করেছে এবং এর পাশাপাশি গণতন্ত্রচর্চার যে অন্যতম মৌল উপাদান 'সেক্যুলার' মতাদর্শ, তার চর্চার ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করেছে। আর এ সবকিছুই বর্তমান বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : গণতন্ত্র, ডান সর্বাত্মকবাদ, জাতীয় এলিটবৃন্দ, প্রাকৃত জনগোষ্ঠী, উত্তর ঔপনিবেশিক কাঠামো, সেক্যুলার মতাদর্শ, বিভাজিত জাতীয়তাবাদ।

প্রারম্ভিক কথা

পেরি অ্যান্ডারসন তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিচিত ভারতীয় গণতন্ত্রের বহুত্ববাদিতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রের ধারণাকেই ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। এর ফলে ভারত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক ন্যায়বিচার বা সামাজিক (সক্ষমতার) সমতা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।[১] অ্যান্ডারসনের সমালোচনার কাঠামোর ভিত্তি হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপের গণতন্ত্রের মডেল। তিনি ইউরোপীয় গণতন্ত্রের এ মডেলকে বৈশ্বিক ধরে নিয়েছেন। পাশ্চাত্যের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মনীষী মনে করেন, রাষ্ট্র, সমাজ, ইতিহাস, ঐতিহ্য নিরিখে সর্বক্ষেত্রে এ মডেল প্রযোজ্য। এ চিন্তায় যে বিষয়টাকে

উপেক্ষা করা হয় তা হলো উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোসমূহে এ মডেল আদৌ প্রযোজ্য হবে কি না, বা কীভাবে এ মডেলটি এসব রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা হবে সে প্রশ্নটি। এই প্রবন্ধের লক্ষ্য পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের মডেলের আলোকে ভারতীয় গণতন্ত্র কতটুকু সফল, সেটি বিশ্লেষণ করা নয়, বরং বাংলাদেশে গণতন্ত্রের মডেল নিয়ে বিয়াল্লিশ বছর ধরে যে চর্চা হয়েছে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ করা। এ বিশ্লেষণের লক্ষ্য হচ্ছে, অ্যান্ডারসন গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার যে ধারণার কথা বলেছেন, সে ধারণাসমূহ উত্তর-'অভ্যন্তরীণ' ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বাংলাদেশে কী রূপ লাভ করেছে তা দেখা এবং তা পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের মডেলের বিপরীতে উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বাস্তবতার আলোকে মূল্যায়ন করা।[২]

গণতন্ত্র

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক কাঠামো থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় দেশটির জনগোষ্ঠীর সামনে এর সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসের নিরিখে গণতান্ত্রিক কাঠামো বিনির্মাণের এক অমিত সম্ভাবনা উপস্থাপন করে। কিন্তু 'বাংলাদেশ বিপ্লবে' নেতৃত্বদানকারী জাতীয় এলিটবৃন্দ অন্যান্য উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের জাতীয় নেতাদের মতোই তাঁদের সামনে প্রস্তুতকৃত সহজলভ্য গণতান্ত্রিক কাঠামোর যে মডেলসমূহ রয়েছিল, সেখান থেকে একটি বেছে নিয়ে নতুন রাষ্ট্রকাঠামো বিনির্মাণ করতে উদ্যোগী হলেন।[৩] জাতীয় এলিটবৃন্দের সামনে গণতান্ত্রিক কাঠামো বিনির্মাণের যে দুটি সহজলভ্য মডেল ছিল মোটা দাগে তার একটি হলো ইউরোপীয় মডেলের গণতন্ত্র এবং আরেকটি আমেরিকান মডেলের গণতন্ত্র। এর বাইরে বাম জাতীয় এলিটবৃন্দ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণচীনের সর্বাত্মকবাদী শাসনব্যবস্থা, যা সাধারণভাবে সমাজতান্ত্রিক মডেল হিসেবে পরিচিত ছিল, তার আলোকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামো বিনির্মাণের কথা ভাবতেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ইউরো/আমেরিকান গণতান্ত্রিক এবং সর্বাত্মকবাদী (সমাজতান্ত্রিক) ব্যবস্থা—এ দুটি মডেলেরই উৎপত্তিস্থল হলো ইউরোপ; পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা এ মডেল দুটির জন্ম দিয়েছে। দুটি মডেলের প্রবক্তা এবং অনুসারীদের মধ্যে যে বিস্ময়কর সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয় তা হলো, তাঁরা মনে করেন এ দুটি মডেলই হলো বৈশ্বিক, ফলে দেশ-কালনির্বিশেষে যেকোনো রাষ্ট্রকাঠামোর জন্য এ মডেল দুটি প্রযোজ্য। তাঁরা আরও মনে করেন যে একমাত্র এ মডেল দুটির মাধ্যমেই উন্নয়ন, প্রাগ্রসরতা এবং আধুনিকতা কোনো জাতি বা রাষ্ট্র অর্জন করতে পারে, ফলে একটি জাতি বা

রাষ্ট্রের পশ্চাৎপদতা/প্রাগ্রসরতা তাঁরা নিরূপণ করেন উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহ এ মডেল দুটি কতটা সফলতার সঙ্গে অনুকরণ করতে পারছে তার ওপর। এ মডেল দুটির বাইরে অন্য যেকোনো ব্যবস্থাকে তাঁরা ধরে নেন পশ্চাৎপদ এবং অনাধুনিকতা হিসেবে।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত এলিটবৃন্দ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করলেও মনোজগতে ঔপনিবেশিক মানসিকতার কারণে তাঁরা তাদের সামনে সহজলভ্য ইউরোপীয় গণতন্ত্র এবং ইউরোপীয় সর্বাত্মক ব্যবস্থার বাইরে দেশীয় রাজনীতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সমাজব্যবস্থার নিরিখে গণতান্ত্রিক কাঠামোর বিনির্মাণ বা এ ধরনের কোনো ধারণা নির্মাণ করতে পারেনি।[৪] ফলে দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও এর জাতীয় নেতারা পঙ্কজ মিশ্রর ভাষায়, 'the iron cage of western interpretation categories' থেকে নিজেদের স্বাধীন করতে পারেননি।[৫] আর পশ্চিমা বিশ্বের তৈরিকৃত 'চিন্তার লৌহখাঁচা' থেকে মুক্ত না হতে পারার ফল হলো, একটি দেশ স্বাধীন হলেও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো, যেটি কিনা পাকিস্তানি অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক কাঠামো থেকে প্রাপ্ত, সেটি বিদ্যমান রেখে এবং তার সঙ্গে পাওয়া পুরো সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র বজায় রেখে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিনির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া। ঔপনিবেশিক কাঠামো এবং এর উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত আমলাতন্ত্র দিয়ে সদ্যস্বাধীন দেশে ওয়েস্টমিনস্টার টাইপে গণতন্ত্র বিনির্মাণের উদ্যোগ তাই শুরুতেই ধাক্কা খায়।

বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া জাতীয় এলিটবৃন্দ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কাঠামোসমূহ, যেটি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী লালন করেছিলেন, সেগুলোকেই সদ্যস্বাধীন দেশের প্রেক্ষাপটে খাপ খাওয়াতে সচেষ্ট হলেন। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের চাপিয়ে দেওয়া কাঠামোসমূহ দীর্ঘদিনেও এ অঞ্চলের সমাজ, ঐতিহ্য, রাজনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। যে কাঠামোসমূহ ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলে সফল হতে পারেনি, সে কাঠামোসমূহ এবং ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরতা বাঙালির জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক এলিটবৃন্দকে প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক এলিট এবং আমলারা তাঁদের নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত কাঠামোসমূহ বজায় রেখেছেন। ফলে যে রাজনৈতিক এলিটবৃন্দ প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর ওপর স্বাধীনতার আগে বিপুল প্রভাব

বিস্তার করতে পেরেছিলেন, অচিরেই প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর ওপর তাঁদের যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক নেতৃত্ব ছিল সেটি অপসৃত হয়। ফলে তাঁরা যে হেজিমনি প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর ওপর স্থাপন করতে পেরেছিলেন, সেটি সম্পূর্ণভাবে তাঁরা হারায়।[৬] এখানে উল্লেখ্য, তৎকালীন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক এলিটরা, আমরা দেখি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক কাঠামোসমূহকে ব্যবহার করে ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির সঙ্গে যুক্ত হতে, যেটি অন্যান্য কারণের সঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক হেজিমনি হারাতে বড় ভূমিকা পালন করে। স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সূচনাপর্বেই আমরা প্রত্যক্ষ করি যে ইউরোপ কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া ঔপনিবেশিক কাঠামোসমূহ এ দেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে শুধু ব্যর্থই হয়নি, গণতন্ত্রের যে মূল উপাদান জনগণকে রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, সেটি করতেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা সফলভাবে পরিচালনা করার মূল শর্ত হলো, সে ব্যবস্থার অধীন বেশির ভাগ জনগোষ্ঠীকে এ ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা; যদি কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার অধীনের জনগোষ্ঠীর ব্যাপকতম অংশকে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে না পারে বা ব্যাপক জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে নিজেদের বিযুক্ত মনে করে, সে ক্ষেত্রে এটি একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিণত হতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় এলিটবৃন্দ প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর ওপর তাঁদের যে রাজনৈতিক হেজিমনি, সেটি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে তাঁরা তাঁদের শাসনব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য ব্রিটিশ মডেলের আলোকে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, সেখান থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে সোভিয়েত মডেলের আলোকে সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন। এর ফলে ঔপনিবেশিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত গণতন্ত্রের যে নিরীক্ষা সদ্যস্বাধীন দেশে শুরু হয়েছিল, তাঁর অকালমৃত্যু হলো। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় গণতন্ত্রের অন্যতম মূল উপাদান বহুত্ববাদকে চর্চা করার যে ক্ষেত্র তৈরি করেছিল, সোভিয়েত মডেলের একদলীয় শাসন আকস্মিকভাবে তার অবসান ঘটায়। একদলীয় শাসন থেকে বাংলাদেশ দীর্ঘ সামরিক শাসনের কবলে পড়ে এবং সামরিক শাসকেরা তাঁদের শাসনক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার জন্য নানাভাবে বহুত্ববাদের চর্চা এবং বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। পাশাপাশি সামরিক শাসকেরা নানাভাবে বিভিন্ন ধরনের গণতন্ত্রবিরোধী ডান সর্বাত্মকবাদী দল এবং গোষ্ঠীগুলোকে মদদ দিতে থাকে, যেন তাঁদের অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকার প্রক্রিয়া পাকাপোক্ত হয়। সাধারণভাবে 'ইসলামি মৌলবাদী' বা ইসলামিস্ট হিসেবে পরিচিত এ ধরনের ডান সর্বাত্মকবাদী দল এবং গোষ্ঠীকে সামরিক শাসকেরা নানাভাবে মদদ দেওয়ার ফলে সামরিক শাসনোত্তীর্ণ সময়েও এসব দল এবং গোষ্ঠী বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্রমেই

প্রভাবশালী হয়ে উঠতে থাকে। এর অনিবার্য পরিণতিতে আজকের বাংলাদেশে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব এমন একটি মাত্রায় পৌঁছেছে, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করতে পারে। ভারতসহ ইউরোপ ও আমেরিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও আমরা সর্বাত্মকবাদী (বাম ও ডান) এবং ফ্যাসিবাদী দল এবং গোষ্ঠীসমূহের উপস্থিতি লক্ষ করি। তবে যেকোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই কোনো সর্বাত্মকবাদী দল বা গোষ্ঠী যদি এ রকম প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে তারা রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়াকে উল্লেখযোগ্য হারে প্রভাবিত করতে পারে, তাহলে সে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক বিকাশের পথে এ শক্তিগুলো একটি বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। ইউরোপ ও আমেরিকার ফ্যাসিবাদী এবং সর্বাত্মকবাদী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের গোষ্ঠীগুলোর যে মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা হলো ইউরোপ ও আমেরিকায় ওই গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অতীব প্রান্তে অবস্থান করার ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যখন ফ্যাসিস্ট সর্বাত্মকবাদী দলগুলো ইউরোপের কিছু দেশে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করার ক্ষমতা অর্জন করেছিল। তারা এসব দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। বাংলাদেশেও সামরিক শাসন-উত্তর গণতন্ত্রের যে নিরীক্ষা, সে নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এসব দল ও গোষ্ঠী আজ বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে।

সামরিক শাসকেরা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অভিযাত্রার প্রতিবন্ধক হিসেবে ডান সর্বাত্মকবাদী শক্তিগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি তাঁদের ক্ষমতার ভিতকে পাকাপোক্ত করা এবং অবৈধ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকে বৈধতা দেওয়ার নিরিখে যে জাতীয় পরিচয় এবং জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বিপরীতমুখী জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় পরিচয়ের জন্ম দেয়। মূলত ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ, যার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ধারণার জন্ম হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র তৈরি হয়েছিল, সামরিক শাসকেরা তাঁদের অবৈধ শাসনক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সে জাতীয়তাবাদকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করেছিলেন, ফলে সে জাতীয়তাবাদকে মোকাবিলা করার জন্য সামরিক শাসকেরা দ্বিজাতিতত্ত্বের বিনির্মিত রূপ হিসেবে ভূখণ্ড এবং প্রচ্ছন্নভাবে ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করে জাতি, জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় পরিচয়ের ধারণাকে বিনির্মাণ করেন।

ইউরোপ ও আমেরিকায় গণতন্ত্রের যে মডেল, সে মডেলটি গড়ে উঠেছে জাতির ধারণা এবং সে জাতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জাতিরাষ্ট্রকে ঘিরে, সেখানে একটি রাষ্ট্রে বসবাসকারী সব জনগোষ্ঠীকে একটি বৃহৎ জাতীয় পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত

হিসেবে কল্পনা করা হয়। এতে আরও ধরে নেওয়া হয়, একটি রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি বা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলো তাদের নিজস্ব পরিচয়ের বদলে যে রাষ্ট্রে তারা বসবাস করে, সে রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া পরিচয়কেই প্রাথমিক পরিচয় হিসেবে মেনে নেবে। এ 'বৃহত্তর' জাতিসত্তার বিনির্মাণে ইউরোপ ও আমেরিকায় সেক্যুলার মতাদর্শ একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। যদিও সেখানেও কোনো রাষ্ট্রই ধর্মীয় চিহ্ন বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি, কিন্তু ঔপনিবেশিকোত্তর অনেক রাষ্ট্রে আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তা হলো ইউরোপীয় মডেলের গণতন্ত্র তারা অনুসরণ করতে চাইলেও ধর্মের প্রভাব এবং ভূমিকা থেকে এসব রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলো মুক্ত হতে পারেনি। তাই ঔপনিবেশিকোত্তর অনেক রাষ্ট্রই শুধু ধর্মীয় চিহ্ন বা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় এই দুই পরিচয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। রাষ্ট্র এবং জাতীয় রাজনীতিতে সীমিত পরিসরে ধর্মের ভূমিকা গণতন্ত্রের চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় কি না, এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও কোনো জাতিরাষ্ট্রে বিভাজিত জাতীয় আত্মপরিচয় থাকলে সেটি যে গণতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক, বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি হচ্ছে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ জাতীয় আত্মপরিচয়গত বিভাজনের কারণেই সামরিক শাসনোত্তর বিভিন্ন জাতীয় নির্বাচনে আমরা প্রধান দুটি বিরোধী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে যথাক্রমে বাঙালি এবং বাংলাদেশি এ দুটি জাতীয় আত্মপরিচয়কে প্রতিনিধিত্ব করার মাধ্যমে যেকোনো মূল্যে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা বা যেকোনোভাবে ক্ষমতায় যাওয়ার এক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হতে প্রত্যক্ষ করেছি, যা গণতান্ত্রিক নীতি-নৈতিকতার ন্যূনতম মানদণ্ডকেও টিকে থাকতে দেয়নি। দুটো দলেরই লক্ষ্য হচ্ছে, তাদের বিনির্মিত জাতীয় আত্মপরিচয়ের নিরিখে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে পরিচিত করে তোলা। দুটো জাতীয়তাবাদই গড়ে উঠেছে ইউরোপীয় মডিউলের আলোকে। পার্থ চ্যাটার্জি মনে করেন, সারবত্তার দিক থেকে দুটো জাতীয়তাবাদী চিন্তাই প্রাচ্যতত্ত্বের আলোকে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।[৭] দুটো জাতীয়তাবাদ প্রাচ্যতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও দুটো জাতীয়তাবাদের মধ্যে মোটা দাগে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ হলো ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ, যার মূল লক্ষ্য ছিল অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। মূলত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় এলিটবৃন্দ ও পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সামাজিকভাবে কোণঠাসা হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁরা রাষ্ট্রকাঠামোয় প্রান্তীয় অবস্থানে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। সে অবস্থা থেকে উত্তরণের নিরিখে পাকিস্তান রাষ্ট্রের

ভিত্তি মুসলিম জাতীয়তাবাদকে তাঁরা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে লড়াই পরিচালনা করার জন্য সংগ্রামে হাতিয়ারস্বরূপ ধর্মীয় পরিচয়নির্বিশেষে এ জাতীয়তাবাদ বিনির্মাণ করেছিলেন। অপরদিকে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ বিনির্মিত হয়েছিল অবৈধ সামরিক শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য, আর এ জন্য যে দ্বিজাতিতত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশ গঠিত হয়েছিল, সে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিনির্মিত রূপ হিসেবে আমরা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদকে দেখতে পাই যেখানে প্রচ্ছন্নভাবে ধর্মীয় পরিচয়কে এ জাতীয়তাবাদী রূপকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সারবত্তার দিক থেকে দুটো জাতীয়তাবাদী রূপকল্পই বিভক্তিমূলক বা এক্সক্লুসিভ। তাতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ কোনো জাতীয়তাবাদী প্রকল্পই একটি ভূখণ্ডের সমগ্র জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়কে আত্মস্থ করতে পারে না। এ অর্থে সব জাতীয়তাবাদী প্রকল্পই এক্সক্লুসিভ, পার্থক্য হলো শুধু মাত্রাগত। যা হোক, মর্মগতভাবে দুটি জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে দ্বান্দ্বিক। দুটি বিপরীতমুখী, দ্বান্দ্বিক জাতীয়তাবাদ সমান্তরালভাবে একটি জাতিরাষ্ট্রে বিদ্যমান থাকলে সে জাতিরাষ্ট্রের পক্ষে গণতান্ত্রিক চর্চা এবং মূল্যবোধকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া সম্ভব কি না, সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়।

এখানে এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, সেক্যুলারিজম—এ ধারণাগুলোর জন্ম হয়েছিল এক্সক্লুসিভলি পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতায়। এ প্রত্যয়গুলো যখন উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোসমূহে আমদানি করে হুবহু প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়েছে, তখন কাঙ্ক্ষিত যে আকাঙ্ক্ষা থেকে এ ধারণাগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে যে, এ রাষ্ট্রগুলোও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর মতো হবে, বাস্তবে তা না হয়ে পঙ্কজ মিশ্রর ভাষায় একধরনের 'Quasi Hybrid Political Forms'-এর জন্ম দিয়েছে।[৮] এ ধরনের রাষ্ট্রকাঠামোসমূহ ইউরোপ এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশগুলোর রাজনৈতিক বাস্তবতার কোনোটাকেই পুরোপুরি ধারণ না করে কিছু ইউরোপীয় উপাদান এবং কিছু ঔপনিবেশিকোত্তর রাষ্ট্রগুলোর বাস্তবতাকে ধারণ করেছে, কিন্তু এ হাইব্রিড মডেল কোনোভাবেই ঔপনিবেশিকোত্তর রাষ্ট্রগুলোর সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে পুরোপুরি ধারণ করতে পারছে না, আর এটিই হলো এসব রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের সংকট। বর্তমান আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে বাংলাদেশের গণতন্ত্রও এ সংকট থেকে মুক্ত নয়। আর এ মুক্ত না হওয়ার ফলে আমরা যখন প্রতিনিধিত্বশীলতাকে গণতন্ত্রের অন্যতম একটি মূল উপাদান ধরি, বাংলাদেশে প্রতিনিধিত্বশীলতার একটি ভিন্ন চিত্র আমরা দেখতে পাই, যেটি ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইউরোপীয় গণতন্ত্রে সাধারণত

যাঁরা ক্ষমতার বাইরে থাকেন তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বিযুক্ত মনে করেন না, কিন্তু বাংলাদেশে আমরা এর বিপরীত চিত্র প্রত্যক্ষ করি। এখানে একটি জাতীয়তাবাদকে সমর্থনকারী রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতায় থাকে, তখন অপর জাতীয়তাবাদকে সমর্থনকারী রাজনৈতিক দল এবং এর অনুসারীরা নিজেদের রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বিযুক্ত মনে করেন। পাশাপাশি আওয়ামী লীগ বা বিএনপি যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, তারা সচেষ্ট থাকে অপর রাজনৈতিক দল এবং এর সমর্থকদের রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে যতটা সম্ভব বিযুক্ত রাখা যায়। বাংলাদেশে গণতন্ত্রচর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, একটি বড় সংখ্যক জনগোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে সব সময় বিযুক্ত মনে করেছে। এ বিযুক্ততা যে শুধু দুটো জাতীয়তাবাদ বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে তা নয়, এর বাইরে রাষ্ট্র ও সমাজে যারা অর্থনৈতিক, লিঙ্গীয়, ধর্মীয় বা ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়কে ধারণ করে, যারা ।রাষ্ট্র ও সমাজের প্রান্তে অবস্থান করে তারাও নিজেদের বিযুক্ত ভেবে এসেছে। ফলে আমরা দেখি, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক মডেল থেকে প্রাপ্ত গণতান্ত্রিক কাঠামো বাংলাদেশে অর্থনৈতিকভাবে যারা প্রান্তীয় অবস্থানে অবস্থান করছে, অর্থাৎ দরিদ্র জনগোষ্ঠী—দরিদ্র এবং হতদরিদ্র মিলে বাংলাদেশে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ—নিম্নমধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র নারী, সনাতন ধর্ম এবং ইসলাম ভিন্ন অন্যান্য ধর্মীয় পরিচয়ে পরিচিত ধর্মাবলম্বীরা, আদিবাসী এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তায় পরিচিত জাতিগোষ্ঠীগুলো সব সময়ই নিজেদের কম-বেশি এ গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের বিযুক্ত ভেবে এসেছে।

ওপরের আলোচনা থেকে যে বিষয়টা স্পষ্ট তা হলো ঔপনিবেশিকতা সূত্রে প্রাপ্ত ইউরোপীয় গণতন্ত্রের যে চর্চা বাংলাদেশ করে আসছে, তা এ দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব যেমন নিশ্চিত করতে পারেনি, পাশাপাশি জাতি-জাতীয়তাবাদসংক্রান্ত দুটো সমান্তরাল দ্বান্দ্বিক রূপকল্প তৈরি করেছে, যা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, এ ধরনের গণতন্ত্রের নিরীক্ষা নানাবিধ কারণে ডান সর্বাত্মকবাদী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে, যারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করলেও আদর্শগতভাবে গণতান্ত্রিক ধারণা এবং চর্চার বিরোধী। কেননা গণতান্ত্রিক ধারণা যে দুটি মৌল আদর্শ বহুত্ববাদ ও সেক্যুলার মতাদর্শের (এ দুটো আবার একে অন্যের পরিপূরক, ফলে একটির অনুপস্থিতি অপরটিকে নিশ্চিত করতে পারে না) ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, এ দুটো মৌল আদর্শেরই তারা বিরোধী।

ধর্মনিরপেক্ষতা

ঔপনিবেশিকোত্তর রাষ্ট্রকাঠামোর ইউরোপীয় ধারণাগুলোর হুবহু প্রতিস্থাপন কী সংকট তৈরি করতে পারে, তার আরেকটি উদাহরণ হলো সংবিধানে সেক্যুলার প্রত্যয়টির বাংলা ধর্মনিরপেক্ষ করা। সেক্যুলার শব্দটি ইউরোপীয় হওয়াতে তার প্রত্যয়গত অর্থ আপামর জনগোষ্ঠীর কাছে বোধগম্য হয়নি। কেননা দেশের জনগোষ্ঠীর খুব অল্প অংশই সাবেক ঔপনিবেশিক প্রভুদের ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী। ফলে বাম রাজনীতিতে বিশ্বাসী এলিটরা ইউরোপীয় কমিউনিস্ট, কমিউনিজম, কমরেড, বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া, প্রলেতারিয়েত ইত্যাদি প্রত্যয়সমূহকে সৃজনশীলভাবে ভাষান্তর করতে পারেননি, যার ফলে আপামর জনগোষ্ঠী তো বটেই, বাম রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপক সংখ্যক কর্মীর মধ্যেও এ প্রত্যয়গুলোর আভিধানিক অর্থ অজ্ঞাত থেকেছে।[৯] তেমনি সেক্যুলার শব্দটি বিদেশি শব্দ বলে প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর কাছে বোধগম্য না হওয়াতে, ডান সর্বাত্মকবাদী গোষ্ঠীগুলো এটিকে নাস্তিকতার সমার্থক হিসেবে প্রচার করতে সমর্থ হয়েছে। পাশাপাশি সেক্যুলার শব্দের বঙ্গানুবাদ 'ধর্মনিরপেক্ষ' করার ফলে তারা জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল করাতে সমর্থ হয়েছে যে এ প্রত্যয়টি প্রকারান্তরে নাস্তিকতা প্রত্যয়টির সমার্থক। এর পাশাপাশি যে প্রশ্নটি দাঁড়ায় তা হলো সেক্যুলার শব্দের বাংলা প্রত্যয় 'ধর্মনিরপেক্ষ' চরিত্র ধারণ করলে অর্থাৎ রাষ্ট্র যদি সব ধর্ম বা ধর্মীয় বিষয় থেকে নিরপেক্ষ থাকে, তাহলে কি রাষ্ট্রের অন্তর্গত ধর্মীয়ভাবে যারা মূলধারার ধর্ম পালন করেন না তাঁদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক সম-অধিকার সে রাষ্ট্রের মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব? ধর্মনিরপেক্ষ বলা হলে আপনা-আপনি ধর্মীয় যেকোনো বিষয় থেকে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে, এ ধারণা চলে আসে। ফলে প্রত্যয়গতভাবেই একটি বিশেষ ধর্মের অনুসারীরা যখন অন্য ধর্মের অনুসারীদের দ্বারা নির্যাতিত হয় তখন কি 'নিরপেক্ষ' রাষ্ট্রের পক্ষে নির্যাতিত মানুষের পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব বা নির্যাতনের কারণগুলো রোধ করা সম্ভব? তাহলে 'ধর্মনিরপেক্ষ' না হয়ে সেক্যুলারের ভাষান্তর 'ধর্মসহিষ্ণু' হলে এর অর্থ হয়তো বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হতো এবং তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্র সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুসৃত ধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্ম এবং ধর্মসংক্রান্ত নানা মতবাদ চর্চার নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারত।

বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় এলিটরা ইউরোপীয় সেক্যুলারিজমের ভিত্তিতে নিজেদের হেজিমনি প্রতিষ্ঠা করতে পারার ব্যর্থতার ফলে, পরবর্তী সময়ে অবৈধ সামরিক শাসকেরা তাঁদের অবৈধ শাসনকে বৈধতা দানের পদ্ধতি হিসেবে সেক্যুলার ধারণাকে সংবিধান থেকে প্রতিস্থাপন করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুসৃত ধর্ম বিশ্বাসের (ইসলামের) প্রতি আনুগত্যের ধারণাকে

পুনঃস্থাপন করেন। বস্তুত এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র সেক্যুলার, ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্মসহিষ্ণু সব চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকের চরিত্র লাভ করে। ক্রমান্বয়ে অবৈধ সামরিক শাসকদের অধীনে রাষ্ট্র এ চরিত্রটিকে আরও স্পষ্ট করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করার মাধ্যমে। রাষ্ট্রকে ধর্মীয় চরিত্র দেওয়ার ধারণাটি বাংলাদেশের নিজস্ব অঞ্চলে উদ্ভূত ধারণা নয়, এটি বাংলাদেশের অবৈধ সামরিক শাসক দেশটির সাবেক অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ পাকিস্তান থেকে ধার করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অবশিষ্ট পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭১ সালে তাঁর ব্যর্থ নেতৃত্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল, তা থেকে উত্তরণের জন্য বিতর্কের মোড় অন্যদিকে ঘোরানোর নিমিত্তে ১৯৭৩ সালে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করার মাধ্যমে পাকিস্তানকে ইসলামিক রিপাবলিকে রূপান্তর করে।[১০] যা হোক, পরবর্তী সময়ে সেক্যুলার নেতৃত্বের দাবিদার রাজনৈতিক এলিটরা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হলেও সেক্যুলার মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের ওপর তাঁদের রাজনৈতিক হেজিমনি প্রতিষ্ঠা করতে না পারার ফলে, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বজায় রেখে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারা পুনঃস্থাপন করেন। এ বিপরীতমুখী চিন্তার সহাবস্থানের ফলে বাংলাদেশের সংবিধান এক বিশেষ সংশ্লেষিত রূপ লাভ করেছে। এ বিশেষ সংশ্লেষিত সংবিধানে যারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্মপালন করে না, তাদের ধর্মীয় এবং এর পাশাপাশি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম-অধিকার পালনের নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে কি না, সে তাত্ত্বিক প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়।

উপসংহার

ভারত ইউরোপীয় গণতন্ত্র হুবহু ইউরোপীয় আদলে অনুশীলন করতে না পারার জন্য পেরি অ্যান্ডারসন এর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ঔপনিবেশিকতা সূত্র থেকে প্রাপ্ত গণতন্ত্র উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোয় কীভাবে হুবহু ইউরোপীয় আদলে খাপ খাবে তা আলোচনা করেননি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আমরা ঔপনিবেশিকতার সূত্রে প্রাপ্ত গণতন্ত্রকে উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোয় খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করার ফলে এর নানাবিধ সংকট দেখি। আর এ সংকটের ফলে এ গণতন্ত্র একদিকে যেমন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রকাঠামোর সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারেনি, তেমনি পাশাপাশি জন্ম দিয়েছে বিভাজিত জাতীয়তাবাদ, যা কিনা সার্বিকভাবে গণতন্ত্রকেই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। গণতন্ত্রের নিরীক্ষার প্রক্রিয়া আরও জন্ম দিয়েছে শক্তিশালী গণসর্বাত্মকবাদী দল ও গোষ্ঠীগুলোর, যারা উল্লেখযোগ্যভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং এর প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে সক্ষম এবং সারবত্তার দিক থেকে এসব দল ও গোষ্ঠী সেক্যুলার মতাদর্শ এবং গণতান্ত্রিক ধারণারই বিরোধী। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের যে নিরীক্ষা, সে নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবও একটি বড় প্রতিবন্ধক। বস্তুত ইউরোপীয় গণতন্ত্রের নিরীক্ষা বাংলাদেশে গণতন্ত্রবিরোধী যেসব উপাদানের জন্ম দিয়েছে বা সংকট তৈরি করেছে, সেগুলো বাংলাদেশের জাতীয় এলিটরা কতটা সৃজনশীলভাবে বাংলাদেশের বাস্তবতা মাথায় রেখে মোকাবিলা করতে পারবেন, তার ওপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অভিযাত্রার ভবিষ্যৎ।

তথ্যসূত্র

১. Perry Anderson, *The Indian Ideology* (Vl: Verson, 2013), Three Essays Collective, 2012.

২. অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের ধারণার জন্য দেখুন, Pablo Gonzalez Cosonova, 'Internal Colonialism and National Development,' *Studies in Comparative International Development,* Vol. 1, No 4, 1965, pp 27-37.

৩. তালুকদার মনিরুজ্জামান বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তিকে বাংলাদেশ বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন। দেখুন, Talukdar Moniruzzamn, *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath* (Dhaka: University Press Ltd., 1980).

৪. মনোজগতে উপনিবেশবাদের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Ashis Nandy, *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism* (Delhi: Oxford University Press, 1988).

৫. Pankoj Mishra, 'India and Ideology: Why Western Thinkers Struggle with the Subcontinent,' *Foreign Affairs,* Vol. 92, No. 6, 2013, p 146

৬. এখানে হেজিমনি বলতে আন্তোনিও গ্রামসি যে সাংস্কৃতিক হেজিমনির কথা বলেছেন তা বলা হচ্ছে। এ প্রবন্ধে হেজিমনির ধারণা গ্রামসির হেজিমনির তত্ত্বের আলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। হেজিমনি সংক্রান্ত বিস্তারিত ধারণার জন্য দেখুন: K. J. Holsti, *The Dividing Discipline, Hegemony and Diversity in International Theory,* (UK: Harper Collins Publishers Ltd; 1985).

৭. Partha Chatterjee, *Empire and Nation,* (New York: Columbia University Press, 2001), p. 42.

৮. দেখুন Mishra, পূর্বোক্ত p. 147.

৯. এখানে উল্লেখ্য যে নিবন্ধের লেখক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাম রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং জেলা পর্যায়ের নেতাদের এ প্রত্যয়গুলোর অর্থ জিজ্ঞাসা করলে কেউই লেখককে এর প্রত্যয়সমূহের অর্থ বলতে পারেননি।

১০. এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করা হলেও পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এর দ্বারা যারা শুধু সুন্নি ইসলামের বিভিন্ন ধারার অনুসারী শুধু তাদের স্বার্থ ও পরিচয় রাষ্ট্র বহন করবে এটি প্রচ্ছন্নভাবে বিধৃত হয়েছে। ফলে পাকিস্তানি জনগোষ্ঠীর প্রায় ২০ শতাংশ শিয়া ইসলামের অনুসারী হওয়ায় তারা শুধু নিজেদের রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বিযুক্তই ভাবেনি, পাশাপাশি বিভিন্ন সময় তারা রাষ্ট্র এবং নানা সুন্নি সংগঠন কর্তৃক নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার হলেও রাষ্ট্রকে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে তেমন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। একই সঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্র আহমদিয়া জামাত এবং যারা ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করেন না তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষায় কখনো অপারগ এবং কখনো ব্যর্থ হয়েছে। কম-বেশি বাংলদেশেও আমরা একই চিত্র প্রত্যক্ষ করেছি।

পরিবেশ

বাংলাদেশের লোকায়ত জলবায়ুবিজ্ঞান : একটি প্রতিবেশ-নারীবাদী আলাপ

পাভেল পার্থ

সারসংক্ষেপ

বর্তমান প্রবন্ধে তাই প্রতিবেশ-নারীবাদী চিন্তাধারাকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগণের জলবায়ু পরিবর্তনসম্পর্কিত নিজস্ব লোকায়ত ভাবনা এবং অবস্থানকে পাঠ করেছে। চাকমা সমাজের রাধামন-ধনপুদী, মান্দি সমাজের দিগ্গি-বান্দি বা শেরানজিং, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সমাজের রাসপালা, হাজং সমাজের জাখামারা গীত বা সুন্দরবনের গাজীর পট, বিল এলাকার মনসামঙ্গল, হাওর জনপদের ধামাইল বা বান্ধা কি মৈমনসিংহ গীতিকা বা কিসসা-কাহিনি-পই-প্রবাদ-ডাক-ডিঠান-শোলক বা খনার বচন পরিবর্তনশীলতাকে ঠাহর করে রচনা করে নিম্নবর্গের যাপিত জীবনের ইতিহাস। নিম্নবর্গের সেই যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই চলতি আলাপ বাংলাদেশের নানা প্রান্তের জলবায়ুবিজ্ঞানকে পাঠ করেছে। এখানে দেশের নানা প্রান্তের আদিবাসী ও বাঙালি জাতির জলবায়ু ধারণাকে একত্র করা হয়েছে। অভিযোজনের নামে করপোরেট বাণিজ্য ও বৈশ্বিক জলবায়ু-রাজনীতিকে নিম্নবর্গের বহমান লোকায়ত চর্চার জায়গা থেকে দেখা হয়েছে। বাংলাদেশের লোকায়ত জলবায়ুবিজ্ঞান নিয়ে চলতি লেখাটি বৈশ্বিক জলবায়ু-ডিসকোর্সে সম্পূর্ণ এক নয়া সংযোজন। দীর্ঘ সময়ের একান্ত মাঠ-অভিজ্ঞতা ও দেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গের লোকায়ত জিজ্ঞাসাকে সঙ্গে নিয়েই লেখাটি তৈরি হয়েছে। জলবায়ু-বিপর্যয় মোকাবিলায় বাংলাদেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গের এই লোকায়ত ধারণা ও চর্চা মূলধারার জলবায়ু সুরক্ষা উদ্যোগে স্বীকৃতিসহ যুক্ত হোক, বর্তমান এটি দাবি রাখা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : লোকায়ত জলবায়ুবিজ্ঞান, প্রতিবেশ নারীবাদ, করপোরেট অভিযোজন বাণিজ্য, নিম্নবর্গ, বাংলাদেশ।

চিগেলবাড়িওয়ারিখুট্টি নামের এক জঙ্গল পাহাড় দ্বীপে মান্দিদের জন্ম। মান্দিরা ওই সময় হা.চেক (পর্বত) এ বড় বড় গাছে থাকতেন। তখনকার দিনে রোদ, বৃষ্টি,

তাপ, বাতাস থেকে বাঁচবার জন্য কত কী করতে হয়েছে। ধীরে ধীরে কখনো তাপ আরও বাড়ল, কখনো শীত শুরু হলো ভয়াবহ। রূরূপা ককথকপা (হেজা/শজারু) এসে একদিন মান্দিদের বলল, তোমরা ঘর বানাতে পারো না? প্রকৃতির পরিবর্তনগুলোতে শরীর খাপ খাইয়ে নিলেও মান্দিরা ঘরের মতো এমন কোনো কিছুই চাইছিল। মান্দি সমাজে বালফং নকমা চিপং রাচ্চা (বনের ছড়ার কাঁকড়া) পয়লা ঘর বানিয়ে দেখিয়েছিল। তারপর মেএনপা চেকসেনপা (গলগাঠ্ঠি পোকা) বাঁশের পাতার ছাউনি দেওয়া ঘর তৈরি করে দেখায়, সারাম্মা দুসিনেম নামের শালবনের এক পাখি দেখায় কীভাবে ঘরে থাকতে হয়। তারপর মান্দিরা নিজেরা ঘর তৈরি করে এবং ঘরে থাকা শুরু করে, মান্দি কুসুকে (মান্দি ভাষায়) এই ঘরের নামই নকমান্দি। যে ঘর তৈরি হয়েছে প্রতিবেশের পরিবর্তনগুলোকে জানা-বোঝার ভেতর দিয়ে, যেখানে প্রকৃতি জীবনের সংস্কৃতি থেকে কোনো একক বিচ্ছিন্ন অংশ নয়।[১]

'জলবায়ু পরিবর্তন' কোনো 'নতুন' এবং 'নিরপেক্ষ' ধারণা নয়

সম্প্রতি 'জলবায়ু পরিবর্তন' এবং জলবায়ুর নিয়ামকসমূহের তারতম্য নিয়ে নানান পরিপ্রেক্ষিতে নানান আঙ্গিকে আলাপ বাহাস শুরু হলেও বাংলাদেশের প্রান্তিক জীবনের লোকায়ত জ্ঞানকাণ্ডে এই ধারণা কোনো নতুন কিছু নয় এবং কোনোভাবেই এই ধারণা তার বৈশিষ্ট্য এবং স্থানিকতার বিবেচনায় নিরপেক্ষ নয়। জলবায়ুর পরিবর্তনকে এই জনপদের মানুষেরা ধারাবাহিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া হিসেবেই পাঠ করেন এবং এর সঙ্গে নানান নিয়মে নানান কায়দায় সংলগ্ন থেকে প্রকৃতির ইতিহাসকে বিরাজমান করে তোলেন। সারা দুনিয়ার প্রত্নজলবায়ুর একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, পরাগরেণু-সামুদ্রিক প্লাংটনসমূহ থেকে প্রাপ্ত পৃথিবীর ৬০০০ বছরের জলবায়ুতেই নিরন্তর এক ধরনের পরিবর্তন ঘটে চলেছে।[২] জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিভিন্নজন বিভিন্ন রকমের উপাত্ত, কারণ ও দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করেছেন বিদ্যায়তনিক প্রাতিষ্ঠানিক ডিসকোর্সের ভেতর। অনেকেই বলেছেন, পৃথিবী নামক এই গ্রহের কক্ষপথের পরিবর্তন ঘটায় সূর্যরশ্মি গ্রহণের ক্ষেত্রে পৃথিবীপৃষ্ঠের স্থানিক পরিবর্তন ঘটেছে, ফলে জলবায়ুতে এর প্রভাব পড়েছে। পাশাপাশি সূর্যের প্রখরতার পরিবর্তন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, অ্যারোসল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের নির্গমন এবং গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্বের তারতম্য এই কারণগুলোকেও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য গুরুত্ব দিয়েই আলোচনা করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানীদের মতে, প্রাকৃতিকভাবেই প্রতি ১১ বছর পর পর প্রতিফলিত সূর্যকিরণের তারতম্য ঘটে প্রায় ০.১ শতাংশ।[৩] সূর্যকিরণের এই তারতম্য এবং প্রখরতার ফলে পৃথিবীর জলবায়ুতে দেখা দেয় ধারাবাহিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া।

বিগত ২০০০ বছরের ভেতর মধ্যযুগীয় জলবায়ু অনিয়মের যুগে (৯০০-১৩০০ খ্রি.) পৃথিবীর তাপমাত্রা আপেক্ষিকভাবে অনেক উষ্ণ ছিল। পরবর্তী সময়ে ক্ষণিক-খুদে বরফ যুগে (১৫০০-১৮৫০ খ্রি.) পৃথিবীর তাপমাত্রা বর্তমান সময়ের চেয়ে ২ ডিগ্রি ফারেনহাইট ঠান্ডা ছিল। বিগত এক শ বছরের ভেতর 'শিল্পায়নের যুগে' পৃথিবীর তাপমাত্রা হঠাৎ করেই অনেক বেশি উষ্ণ হয়ে উঠেছে, অনেকেই মানুষের কার্যকলাপ এবং মাত্রাতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকে এর জন্য দায়ী মনে করেন।[৪] এম কে দাভালিকার তাঁর *First farmers of the Deccan (1998)* পুস্তকে দেখিয়েছেন, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মহারাষ্ট্রের একটি এলাকায় যেখানে তাম্র-প্রস্তর যুগে কৃষিসভ্যতা গড়ে উঠেছিল; সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন করে খ্রিষ্ট জন্মের প্রায় ২০০ বছর আগের একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে চিহ্নিত করে। খ্রিষ্ট জন্মের ২০০ বছর আগে সেখানে বৈচিত্র্যময় শস্য ফসল আবাদ করে গড়ে উঠেছিল স্বনির্ভর বিকাশমান কৃষিজীবন এবং কৃষিভিত্তিক স্থায়ী বসতি। কিন্তু তাম্র-প্রস্তর যুগে গড়ে ওঠা এই স্থায়ী কৃষিবসতিই ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছিল এক যাযাবর পশুপালনজীবী সম্প্রদায়ে। মানুষ খুব দ্রুত স্থায়ী আবাসভূমি ছেড়ে বিচ্ছিন্ন, খুদে খুদে অস্থায়ী কুঁড়ে তৈরি করে বসবাস করতে শুরু করল এবং জীবনযাপনের জন্য ভেড়া ও ছাগল পালনকে বেছে নিল। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা একটি স্বনির্ভর কৃষিজীবন থেকে হঠাৎ করে যাযাবর পশুজীবী সম্প্রদায়ে কোনো জনগোষ্ঠীর স্থানান্তরের এই ঘটনাটিকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হিসেবে আখ্যায়িত করে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র ও প্রমাণ হাজির করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন ওই এলাকায় সেই সময়ে জলবায়ুর অবনতি ঘটেছিল এবং একধরনের অস্থায়ী শুষ্ক অবস্থা তৈরি হয়েছিল, যা শস্য ফসল চাষাবাদের জন্য উপযোগী ছিল না। চাষাবাদ না করতে পেরে বাধ্য হয়ে কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠী জীবন বাঁচাতে পশুজীবী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আরও বলেছেন, এই ঘটনা জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে অধিক সম্পদ আহরণের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না, বরং এর সঙ্গে সেই সময়ের শুষ্ক প্রান্তিক এলাকার জলবায়ুতে ভয়াবহ পরিবর্তনই ছিল এর কেন্দ্রীয় কারণ।[৫]

এই জনপদের নিম্নবর্গের কৃষিবিজ্ঞানী খনা সেই হাজার বছর আগেই পরিবেশ-প্রতিবেশ এবং জলবায়ুর পরিবর্তন এবং এর সঙ্গে মানুষের নানা রকমের অভিযোজনিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন। যা আজও এই জনপদের নানা প্রান্তের সমতল অঞ্চলের বাঙালি কৃষিজীবনের নিজস্ব পাঠ্য নির্ঘণ্ট। খনার বচনে আছে, যদি বর্ষে আগনে রাজা যায় মাগনে। মানে অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি হলে কৃষির বিনাশ হয়, রাজাকেও খাদ্যসংকটে পড়তে হয়। খনা আরও বলেছেন, পৌষে যত

কুয়াশা হয় বৈশাখে তত বৃষ্টি হয়। জ্যৈষ্ঠে শুকো আষাঢ়ে ধারা, শস্যের ভার না সহে ধরা। খনার আবহাওয়া বিজ্ঞান অনুযায়ী, পৌষ মাসে যত দিন কুয়াশা হয় বৈশাখে তত দিন বৃষ্টি হয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে খরা, আষাঢ়ে বর্ষা হলে শস্য ফসল ভালো হয়। আজকের আলাপে আমরা খনার ভাষ্য টেনে এনেছি এই জনপদের আবহাওয়া পরিবর্তনের ইতিহাসকে বুঝতে। খনা তাঁর সময় থেকেই দেখেছেন প্রকৃতির পরিবর্তনগুলো কী নিয়মে প্রভাবিত করে জনজীবন এবং এর সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত থাকতে হয়। অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি না হওয়ার কথা থাকলেও সেটি খনার আমলেও হতো আর তাই খনা এই পরিবর্তনের প্রভাবগুলোকে আঁচ করতে পেরেছিলেন। খনার বচনে অভ্যস্ত এই জনপদের মানুষ জলবায়ুর পরিবর্তনগুলোকে নিজেদের চিন্তা ও মনস্তত্ত্বে ধরতে পারলেও বিগত ৮০-৯০ বছরের জলবায়ুগত পরিবর্তনকে তাঁরা নিজেরা নিজেদের ঐতিহাসিক প্রকৃতিসংলগ্ন বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হিমশিম খাচ্ছেন। এই সময়ে আবহাওয়া এবং জলবায়ুতে এমন দ্রুত কিছু পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, যা কৃষিপঞ্জিকানির্ভর প্রান্তিক জনগণের হিসাবে নানা রকমের গরমিল তৈরি করছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিদ্যায়তনিক কাঠামোতে এই ধরতে না পারা পরিবর্তনকেই যদি সম্প্রতি 'জলবায়ু পরিবর্তন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তবে এতে জনগণের চিন্তাপদ্ধতিও শামিল থাকে, অন্যথায় নয়।

ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে এখন পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ০.৬ ডিগ্রি থেকে ০.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক ছিল সবচেয়ে উষ্ণ দশক। ১৮৬১ থেকে তাপমাত্রা রেকর্ড সংরক্ষণ প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে ১৯৯৮ সাল ছিল সবচেয়ে উষ্ণ বছর। প্রাচ্য এশিয়া ছাড়া উত্তর গোলার্ধের মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশে বার্ষিক মহাদেশীয় বৃষ্টিপাত বেড়েছে প্রতি দশকে প্রায় ০.৫ থেকে ১ শতাংশ। অপরদিকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে মহাদেশীয় বৃষ্টিপাত কমেছে প্রতি দশকে প্রায় ০.৩ শতাংশ। বিশ শতকের প্রথম দশকগুলো থেকে সম্প্রতি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ০.৩ শতাংশ বেড়েছে। ১৯৮০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে প্রায় ১০ শতাংশ জলীয় বাষ্প বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬০ সালের পর থেকে পৃথিবীর বরফ আচ্ছাদন এলাকা প্রায় ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।[৬] পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের নির্গমন গত আড়াই শ বছরে প্রায় ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, মিথেন গ্যাসের পরিমাণ ১৭৫০-এর পর থেকে এখন পর্যন্ত ১৫০ ভাগ বেড়েছে, প্রাক-শিল্পবিপ্লব থেকে এখন পর্যন্ত নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা ১৬ ভাগ বেড়েছে।[৭] বিশেষজ্ঞরা আরও জানিয়েছেন, গত ১০০০ বছরের ভেতর পৃথিবীর তাপমাত্রা বিভিন্ন সময়ে ওঠানামা করেছে। উত্তর গোলার্ধের তাপমাত্রা অনিয়মিত কিন্তু নিশ্চিতভাবে শীতল হয়েছে।

এর মধ্যে একাদশ শতক থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর পঞ্চদশ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত তাপমাত্রা কমে আসতে দেখা গেলেও তার পর থেকে তাপমাত্রা আবারও বৃদ্ধি পেয়েছে।[৮]

জলবায়ু পরিবর্তনের যে ধারণা নতুনভাবে দুনিয়াময় উচ্চারিত হয়েছে, সেখানে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে মানুষের বিগত ২০০ বছরের কর্মকাণ্ডকে, যেসব কর্মকাণ্ড একইভাবে নিরপেক্ষ এবং ক্ষমতাকাঠামোবিহীন ছিল না। মূলত উত্তরের ধনী দেশের পুরুষতান্ত্রিক ভোগ-বিলাসিতার জীবনই মাতৃদুনিয়াকে এমন এক দুর্বিষহ জলবায়ু পরিবর্তিত অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে। অবধারিতভাবে যার সব থেকে বড় ভোগান্তি টানতে হচ্ছে দক্ষিণের গরিব দেশগুলোর মানুষ-ভূমি এবং প্রাণসম্পদের ঐতিহাসিক সম্পর্ককে। বাংলাদেশ এই দক্ষিণের এক গরিব দেশ, যার বুকের ওপর উত্তরের ধনী দেশের ভোগ-বিলাসী জীবনের সর্বনাশা কার্বন-পদচ্ছাপ পড়ছে প্রশ্নহীন কায়দায়। ঐতিহাসিকভাবে যে জনপদ জলবায়ুর প্রাকৃতিক পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে, বিরাজিত থেকেছে প্রতিবেশের প্রতিটি টুকরো টুকরো তারতম্যের সঙ্গে, সেই বাংলাদেশকেই আজ কর্তৃত্ববাদী ধনী দেশের হিসাবহীন কার্বন পোড়ানো জীবনের পোড়া দাগগুলো নিজেদের শরীর ও স্বাস্থ্যে নিয়ে আবারও টিকে থাকার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এর নামই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নিয়ন্ত্রক ও নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক প্রশ্নহীন সম্পর্ক। এই জনপদের প্রান্তিক জীবনে নিরন্তর এই সম্পর্ক পরিবর্তনের লড়াই চলে, চলে পরিবর্তিত প্রতিবেশকে আগলে বিরাজিত হওয়ার নিজস্ব অনুশীলন। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সম্প্রতি মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নির্গমনকেই কেন্দ্রীয় মনোযোগে রাখা হয়েছে। ১৮০০ সাল থেকেই শিল্প-কারখানাভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের নির্গমন বাড়িয়ে তুলেছে, যা বিদ্যমান বাস্তুসংস্থান এবং পৃথিবীর সামগ্রিক প্রতিবেশব্যবস্থার জন্য একটি সমস্যা তৈরি করছে।[৯] পৃথিবী গ্রহের চারধারে ওজোন গ্যাসের একটি চাদর আছে, এই চাদর মানুষের মাত্রাহীন কার্বন ব্যবহারে দিন দিন ফুটো হয়ে যাচ্ছে। ওজোন স্তরের ক্ষতি করছে এমন রাসায়নিকদের একত্রে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (সিএফসি) বলা হচ্ছে। মূলত রেফ্রিজারেটর (ফ্রিজ) এবং তাপানুকূল যন্ত্রে (এসি) ব্যবহারের জন্য ১৯৩০-এর দশকে সিএফসি রাসায়নিকসমূহ বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য উদ্ভাবিত হয়। E I du Pont de Nemours & Company সিএফসিকে বাণিজ্যিকভাবে ফ্রেয়ন নাম দিয়ে তাদের পণ্যে ব্যবহার করে বাজারজাত করে। ফোম ইনস্যুলেশনে ব্যবহৃত আরেকটি সিএফসি দ্রব্য Dow chemical company, যা তাদের পণ্যে ব্যবহার করে স্টাইরোফোম নামে। এসব সিএফসি রাসায়নিকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ওজোন স্তরে ছিদ্র তৈরি করছে এবং সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে

মাটি-পানি-প্রাণবৈচিত্র্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে।[১০] বাংলাদেশে পার ক্যাপিটা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের নির্গমন মাত্র ১৩৫ কেজি (১৯৯০), যেখানে জাপানে ২.২ টন, আমেরিকাতে ৫.৩ টন এবং সারা দুনিয়ায় গড়ে ১.২ টন। বাংলাদেশে শিল্প খাতে ৬৫ ভাগ, শক্তি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১৭ ভাগ, যানবাহনে ১১ ভাগ এবং কৃষিক্ষেত্রে ৪ ভাগ কার্বন নির্গমন হয়।[১১] জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ভেতর এই যে মানুষের কার্বন ব্যবহারে জলবায়ুর এক অনির্দিষ্ট ভিন্ন অবস্থা, এর প্রভাব থেকে কার্বন কম ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে কোনোভাবেই বাংলাদেশ বাদ যাবে না। বরং জলবায়ুগত এই সাম্প্রতিক পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা পাড়ি দিতে হবে বাংলাদেশকেই।

General Circulation Model (GCM) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেখা গেছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ২০৩০ সালের ভেতর বাংলাদেশের তাপমাত্রা বর্ষাকালে ০.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়বে এবং শীতকালে ১.৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়বে। পাশাপাশি ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০৩০ সালে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১১ ভাগ বৃদ্ধি পাবে এবং শীতকালে ৩ ভাগ কমে যাবে। জিসিএম প্রক্রিয়ার সাহায্যে দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশের শীতকালকে আরও বেশি শুষ্ক করে তুলবে, মাটির উপরিভাগের পানি আরও বাষ্পীভূত হবে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে লবণাক্ততা আরও বৃদ্ধি পাবে।[১২] জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দিনে দিনে আরও উষ্ণ হলে পৃথিবী, পৃথিবীর জমে থাকা বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়িয়ে দেবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩.২ ফুট বাড়লে বাংলাদেশের মোট স্থলভূমির ১৭.৫ ভাগ উপচে পড়া পানির তলায় ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[১৩] মিলিমান এবং তাঁর সহযোগীরাও অনুমান করে দেখিয়েছেন, ২০৫১ সালের ভেতর বাংলাদেশের সমুদ্র সমতলের উচ্চতা প্রায় ২০৯ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাবে।[১৪]

আমরা এতক্ষণ জলবায়ু পরিবর্তনকে ঘিরে বিদ্যায়তনিক প্রাতিষ্ঠানিক কিছু সাধারণ ধারণা এবং চিন্তার কথা জানলাম। আমাদের আজকের আলাপের কেন্দ্রীয় ভিত্তি হচ্ছে এই জনপদের প্রান্তিক জীবনের পুস্তকবিহীন জ্ঞানকাণ্ড, যে জ্ঞানকাণ্ডের ধারণায় জলবায়ু পরিবর্তনকে কী কায়দায় এবং কী আমেজে চিহ্নিত করা হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের অবস্থানগুলোর ছিটেফোঁটা আঁচকে একত্র করা। জলবায়ু পরিবর্তনসম্পর্কিত জনগণের ধারণা এবং অবস্থানকে আলাপে হাজির করার আগে কিছু চলতি বাহাস সেরে ফেলা জরুরি এই কারণে যে তা না হলে জনগণের জ্ঞানজমানার সীমানায় শামিল হওয়া শেষমেশ একটা বলপ্রয়োগী প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়াবে। 'জনগণ' বলতে আমরা রাষ্ট্রের জনগণের সেই অংশের কথা বলছি যারা একটি অধিপতি প্রক্রিয়ার ভেতরে থেকেও নিরন্তর এই প্রক্রিয়াকে নিজস্ব কায়দায় প্রশ্ন করে এবং সামগ্রিক পরিবর্তনকে চলমানতা হিসেবে পাঠ করে

জীবনের সঙ্গী করে এবং রাষ্ট্রের ভেতরে থেকেও যারা রাষ্ট্রকে একটি 'দেশ' হিসেবেই পাঠ করে। আজকের আলাপে জনগণের ভাবনা বলতে আমরা কেবল রাষ্ট্রের জাতিগতভাবে অধিপতি বাঙালি চিন্তাকেই হাজির করছি না, পাশাপাশি রাষ্ট্রের কোচ-হাজং-ডালু-বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি-মৈ তৈ মণিপুরি-লালেং-চাকমা-ত্রিপুরা-রাখাইন-ম্রাইনমা-খাসি-মান্দি-বানাই-খাড়িয়া-মাহালি-লুসাই-ম্রো-পাংখো-বম-মুন্ডা-সাঁওতাল-ওঁরাও-ভূমিজ-লেঙাম-দেশোয়ালি-কর্মকার-রবিদাস-হদি-রাজবংশী-ক্ষত্রিয় বর্মণ-পাঙন-চাক-তঞ্চঙ্গা-খুমি-খিয়াং-কোল-মাহাতো-বেদে-মুসহর-পাহাড়ি, মালো, কন্দসহ দেশের ৪৫ বা তারও কম-বেশি জাতিগত প্রান্তিক আদিবাসী জনগণের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক ভাবনাকেও আলাপে একই কায়দায় শামিল রাখছি। আমরা প্রথমেই স্পষ্ট করে নিচ্ছি এই দেশের জনগণের নিজস্ব চিন্তাকাঠামো এবং জীবনযাপন অভিন্ন নয় এবং জনগণের এই বহুমাত্রিক ভাবনাকে কোনোভাবেই একক এবং খণ্ডিত করে পাঠ করা কর্তৃত্ববাদী প্রক্রিয়ারই অংশ হয়ে দাঁড়ায়। জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে একজন ওঁরাও নারী যেমন একভাবে ভাবেন, আবার একজন ম্রো পুরুষের চিন্তায় সেখানে ভিন্নতা রয়েছে, এই ভিন্নতা অঞ্চল, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স ও পেশাভেদে ভিন্ন ভিন্ন। আমরা প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি, জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ে জনগণের ভাবনা এবং অবস্থান কী এই বিষয়ে আমাদের হাতের ধারে-কাছে তেমন কোনো তথ্য দলিল নেই। তাই এই আলাপ শুরুই করছে জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ে জনগণের লোকায়ত ভাবনা এবং বৈচিত্র্যময় অবস্থান কী ধরনের, সেই বিষয়ে সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক জনদলিলের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখেই।

জনগণের ধারণা ও প্রতিবেশগত চিন্তার ঐতিহাসিক সূত্র

কি কর শ্বশুর লেখাজোখা
মেঘেই দেখো জলের রেখা।
কোদালে-কুড়ুলে মেঘের গাঁ
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা।
কৃষককে বলোগে বাঁধতে আল
আজ না হয় হবে কাল।

(মহামতি খনা বলেছেন, মেঘের মধ্যেই বৃষ্টির প্রকৃতি বোঝা যায়। যদি মেঘের মধ্যে কোদাল-কোদাল ছোপ ছোপ হয় এবং বাতাস বয়ে যায় তবে বোঝা যায় আজকালের ভেতর বৃষ্টি হবে। এই খনার বচনটি সংগ্রহ করা হয়েছে শ্রী শান্তি রায় (৮০), সবুজবাগ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার থেকে)

পরিবেশ এবং প্রতিবেশ বিষয়ে ভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দার্শনিক চিন্তাকাঠামো রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের জনগণের ভাবনা এবং চিন্তাগুলোকে জানাবোঝার জন্য অতিসংক্ষেপ হলেও আমাদের প্রতিবেশগত

নানান চিন্তাকাঠামোর ঐতিহাসিক সূত্রগুলোকে কিছুটা সমন্বয় করা জরুরি। তা না হলে এটি স্পষ্ট হয় না যে কোন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পাটাতন থেকে আমরা জনগণের ভাবনাকে পাঠ করছি বা জনগণের ভাবনারও যে নানান ঐতিহাসিক ভিন্নতা সংঘর্ষ-নির্মাণ আছে সেই বিষয়গুলোও অনিবার্যভাবেই আড়াল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বিদ্যমান বিদ্যায়তনিক চিন্তাগুলোকে পাঠ করার জন্য আমরা কানিংহ্যাম ও অন্যদের (২০০৩) একটি পরিবেশবিষয়ক পুস্তক[১৫] বেছে নিয়েছি। মানবতাবাদ এবং মানুষকেন্দ্রিক ধারণার ক্ষেত্রে 'মানুষকে' প্রধান কেন্দ্র করে প্রকৃতির ভেতর মানুষকেই একক প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রচলিত ধর্মপুস্তকসমূহে দেখা যায়, প্রকৃতির অসীম প্রাণ ও সম্পর্কের ভেতর মানুষকেই 'সৃষ্টির সেরা জীব' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। লিন হোয়াইট ১৯৬৭ সালে The historic roots of our ecological crisis নামের একটি গবেষণাপত্রে দেখান, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে পৃথিবীর পানি, বাতাস এবং জীবের ওপর মানুষকে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব করার কথা বলা হয়েছে। পরিবেশ-প্রতিবেশভিত্তিক মতবাদে এই ধরনের চিন্তা ও দর্শনকে মানবতাবাদ ও মানুষকেন্দ্রিক মতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

পৃথিবীর অনেক আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কোনো এলাকার নিয়ন্ত্রক বা শাসক হিসেবে নিজেদের মনে না করে সেই এলাকার ব্যবস্থাপনা ও যত্নের মাধ্যমে সেই এলাকার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে। তারা নিজেদের প্রকৃতির অংশ মনে করে এবং নিজেদের প্রকৃতির বাইরের অংশ মনে করে না, পাশাপাশি জনগোষ্ঠীরা নিজেদের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক নয়, বরং সহবাসী মনে করে। রেনে ড্যুবস এবং ওয়েনডেল বেরি সমসাময়িক কৃষকদের ভেতরও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ককে বিবেচনা করেছেন এবং বলেছেন, গ্রামীণ ভূমি ও জনগণের সংস্কৃতির এই অনবদ্য সম্পর্ককে কোনো স্থায়িত্বশীল প্রক্রিয়ায় বিবেচনা করা জরুরি। পরিবেশ ডিসকোর্সে এই ধরনের মতবাদ তত্ত্বাবধান মতবাদ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

অনেক পরিবেশবাদী মানবতাবাদ ও মানুষকেন্দ্রিক মতবাদ, তত্ত্বাবধান মতবাদের সমালোচনা করে প্রাণকেন্দ্রিক মতবাদের সূচনা করেছেন। তাঁরা জন ম্যুইর এবং অ্যালডো লিওপোল্ডের মানবজাতির সামাজিক ও রাজনীতিক মতবাদকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, সব জীবিত প্রাণের (উদ্ভিদ-প্রাণী) ভেতরই রয়েছে বিকাশমান সহজাত মূল্যবোধ ও অধিকার। কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রা এবং অর্থনৈতিকভাবে কাজে লাগে এমন প্রজাতি ছাড়া আর সব প্রজাতিই মনোযোগের বাইরে থেকে যায়। এই যে কেবল মানুষের প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে কোনো প্রজাতির ক্ষেত্রে মানুষের বিশেষ মনোযোগ এবং কোনো প্রজাতির ক্ষেত্রে

মনোযোগহীনতা, এই বিষয়টিকে প্রাণকেন্দ্রিক মতবাদে সমালোচনা করে দুনিয়ার সব প্রাণপ্রজাতির ক্ষেত্রেই সমান মনোযোগের কথা বলা হয়। অনেক প্রাণকেন্দ্রিক দার্শনিক প্রাণবৈচিত্র্যকে প্রকৃতির সর্বোচ্চ নীতিগত প্রেরণা মনে করেন। প্রজাতি এবং প্রজাতিসংখ্যা প্রাণবৈচিত্র্যের মূল একক, যা উত্তরাধিকার মূল্যবোধের কেন্দ্রীয় অঞ্চল।

প্রাণীর অধিকারভিত্তিক মতবাদে বিশ্বাসী অনেকেই এককভাবে প্রাণীর অধিকারের দাবি তুলে প্রাণীদের ধরা, মারা, শিকার, খাওয়া এবং বাণিজ্যবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছেন। তাঁরা প্রজাতি এবং প্রজাতির সংখ্যাকে বিতর্কের জায়গায় এনে বলতে চান, কোনো প্রজাতির একটি সদস্যই তাঁর নিজের জীবনযাপন করে, সেখানে এই একটি সদস্যকে বিবেচনা করারও দাবি জানিয়েছেন প্রাণীপ্রেমিকেরা। অপরদিকে অনেক প্রতিবেশবিদ কোনো প্রজাতি বা প্রজাতির কোনো একক সদস্যের চেয়ে প্রতিবেশের সামগ্রিক প্রক্রিয়া ও বৈচিত্র্যকে বিবেচনা করতেই বেশি আগ্রহী। এই ধারণাটি সম্প্রতি প্রতিবেশকেন্দ্রিক মতবাদ হিসেবে পরিচিত। কোনো বড় ধরনের প্রতিবেশীয় প্রক্রিয়া যেমন: বিবর্তন, অভিযোজন এবং মহা ভূপ্রাণরাসায়নিক চক্রের ক্ষেত্রে প্রকৃতির সামগ্রিক ভূমিকাকে বিবেচনা করেন প্রতিবেশবাদীরা। যখন কোনো প্রজাতির একটি সদস্য মারা যায় বা তাকে মারা হয় তখন প্রকৃতিতে আবার সেই শূন্যস্থান পূরণ হতে কিছুদিন সময় লাগে কিন্তু যখন কোনো প্রজাতিকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করা হয় তখন প্রকৃতিতে এই শূন্যস্থান পূরণ সব সময় সম্ভব হয় না বা হলেও দীর্ঘ সময় নেয়।

পরিবেশ ও প্রতিবেশসম্পর্কিত বিদ্যমান দর্শন ও চিন্তাকে ঘেঁটে নারীবাদীরা দেখিয়েছেন, পরিবেশসম্পর্কিত কোনো মতবাদেই পরিবেশ বিষয়টির নিশ্চিত সুরাহা হয় না। কারণ এসব মতবাদ গড়ে উঠেছে একটি পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো এবং বলপ্রয়োগকারী প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গি চালু রাখে যে পুরুষ নারীর চেয়ে প্রধান, মন শরীরের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সংস্কৃতি প্রকৃতির চেয়ে উচ্চ। বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামোতে কর্তৃত্ব এবং বলপ্রয়োগের জায়গায় নারীবাদীরা নারী, শিশু, সংখ্যালঘু, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং প্রকৃতিকে নিকট-সম্পর্কিত এবং পারস্পরিক আহাজারির ভেতর দিয়ে ঐক্যবদ্ধ মনে করেন। পরিবেশ ডিসকোর্সে নারীবাদীদের এই চিন্তা সম্প্রতি প্রতিবেশনারীবাদ (ইকোফেমিনিজম) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রতিবেশনারীবাদীরা সব ধরনের কর্তৃত্ব ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে। বহুপক্ষীয় সম্পর্ক এবং শ্রেণীহীন দুনিয়াতে বিশ্বাসী এই মতবাদ কোনো ধরনের কর্তৃত্ব ছাড়া মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার আহ্বান জানায়। যেখানে অন্যান্য পুরুষতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কর্তৃত্ব এবং বলপ্রয়োগসমূহ জিইয়ে থাকে। কারেন ওয়ারেন, বন্দনা শিবা, ক্যারোলিন মারচেন্ট, রুজমেরি রুথার প্রতিবেশনারীবাদী

ধারণার ভিন্নতা দিয়ে পরিবেশ-প্রতিবেশ এবং জীবনযাপনের জটিল সম্পর্কের চিন্তাকাঠামোর শরীরকে অন্যান্য মতবাদের চেয়ে অনেক বেশি সংগঠিত, স্পষ্ট ও মূর্ত করে তুলেছেন।

বাংলাদেশের জনগণ জুম, কৃষি, জলাভূমি ও বন থেকে সংগ্রহ ও শিকারের ভেতর দিয়েই (আমরা জীবনযাপনের আরও নানা রকম এবং ধরনকে অস্বীকার করছি না) গড়ে তুলেছেন জীবনযাপনের ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি। জনগণের চিন্তাসূত্র এবং ভাবনার জগৎও তৈরি হচ্ছে নিরন্তর স্থানিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তনশীলতা ঘিরেই। জনগণের প্রান্তিক অংশ যেভাবে নিজেদের অস্তিত্বশীল জ্ঞানকাণ্ডের মাধ্যমে সম্পর্কিত হয়েছে প্রকৃতির এক জটিল চলমানতার ভেতর এবং গড়ে তুলেছে পরস্পরধর্মী এক নিরবচ্ছিন্ন প্রাতিবেশিক বাস্তুসংস্থান জনগণের এই বহুপক্ষীয় যাপিত জীবনের পাঠ পরিবেশসম্পর্কিত বিদ্যায়তনিক কাঠামোতে 'প্রতিবেশনারীবাদ' দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর দিয়ে অনেকখানি সংলগ্ন হয়ে করা সম্ভব। আজকের আলাপে আমরা তাই প্রতিবেশনারীবাদী চিন্তাধারাকে সঙ্গে নিয়েই বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগণের জলবায়ু পরিবর্তনসম্পর্কিত নিজস্ব লোকায়ত ভাবনা এবং অবস্থানকে পাঠ করতে শামিল হয়েছি। চাকমা সমাজের রাধামন-ধনপুদী, মান্দি সমাজের দিগ্নি-বান্দি বা শেরানজিং, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সমাজের রাসপালা, হাজং সমাজের জাখামারা গীত বা সুন্দরবনের গাজীর পট, বিল এলাকার মনসামঙ্গল, হাওর জনপদের ধামাইল বা বান্ধা কি মৈমনসিংহ গীতিকা বা কিসসা-কাহিনি-পই-প্রবাদ-ডাক-ডিঠান-শোলক বা খনার বচন যেভাবে পরিবর্তনশীলতাকে ঠাহর করে রচনা করে নিম্নবর্গের যাপিত জীবনের ইতিহাস। সেই যাপিত জীবনের ঝাঁজ থেকেই জনগণের ভাবনার ভাষা এবং সূত্রগুলোকে জানাবোঝা করা জরুরি। কারণ বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামোকে স্বীকার করে বা মেনে নিয়ে কখনোই প্রান্তিকজনের ভাবনাকে জানাবোঝার জায়গা তৈরি হয় না। এই জনপদের প্রান্তিক জীবনের নিজস্ব ভাবনার সূত্রসমূহ সব অধিপতি ঝাঁজকে প্রশ্ন করতে জানে নিজস্ব ভঙ্গিমায়, জানে প্রকৃতির নিরন্তর চলমান অস্তিত্বময়তার সঙ্গে কোনো ধরনের অধিপতি আচরণ না করে এই সম্পর্ক বিরাজমান এবং বিকাশমান করে তুলতে হয়। আর জনগণের ভাবনার এই জায়গাটি অনেকখানিই ধরতে পারে পরিবেশসম্পর্কিত বিদ্যায়তনিক কাঠামোর প্রতিবেশনারীবাদীদের চিন্তা ও কাজ। মহামতি খনা যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, যাঁর বচনকে কৃষিজীবনের পাঠ্য করে এখনো জনগণের নিজস্ব ভাবনার চলমানতা বেঁচেবর্তে আছে। কিন্তু জনগণের সেই অভ্যস্ত জীবনের পাঠ দিয়ে সাম্প্রতিক আবহাওয়া-জলবায়ু এবং পরিবেশীয় পরিবর্তনগুলোকে আর যেন জানাবোঝা করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ভেতর এই যে এক অনিয়মিত পরিবর্তনের চিহ্ন এসবকে জনগণ যাপিত জীবন দিয়ে আঁচ এবং ঠাহর

করতে পারলেও এই পরিবর্তন জনগণের জীবনে দুর্ভোগ এবং অস্থিতিশীলতাই তৈরি করছে, যা কেবল নিজস্ব অনুশীলন দিয়ে টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। জলবায়ুতে সাম্প্রতিক এসব অনিশ্চয়তা, তারতম্য এবং জনগণের জলবায়ুপঞ্জিকা ভিন্ন এসব ঘটনাকেই 'জলবায়ু পরিবর্তন' বিষয়ে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগণের লোকায়ত ভাবনা হিসেবে পাঠ করার সাহস করা যায়।

রাষ্ট্রের 'নিরাপত্তাকে' নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এডওয়ার্ড অ্যাজর এবং চুং-ইন-মুন মূল্যবোধ এবং পরিচয়ের ভেতর দিয়ে নিরাপত্তাকে ব্যাখ্যা করেছেন। পাশাপাশি ক্যারোলিন থমাস অর্থনৈতিক দিকগুলোকে নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। পরিবেশ ও উন্নয়ন ঘরানায় নয়াবাস্তববাদী ধারণার ক্ষেত্রে ব্যারি বুজান এবং অন্যরা রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে ব্যাখ্যা করার জন্য পরিবেশ প্রসঙ্গকেও বিবেচনা করেছেন। ব্যারি বুজানদের মতে, রাষ্ট্রের প্রচলিত সামরিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি পরিবেশগত অবক্ষয়কে সমন্বয় করে কোনো রাষ্ট্রের 'নিরাপত্তা' প্রসঙ্গ পুনর্ব্যাখ্যা করা জরুরি।[১৬] দক্ষিণের গরিব রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকেও আজ রাষ্ট্রের নিরাপত্তাবিষয়ক ধারণা এবং চিন্তাপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা জরুরি। উত্তরের ধনী রাষ্ট্রের কার্বন-বাণিজ্যের কারণে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বুকে যে ভয়াবহ কার্বন-পদচ্ছাপ পড়ছে, সেখান থেকে এই দরিদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কী হবে, তা আজ রাষ্ট্রকে ভাবতে হবে এবং এই ভাবনায় জনগণের চিন্তা ও জ্ঞানের প্রবাহকেই ভিত্তিভূমি হিসেবে বিবেচনা করা জরুরি হবে। কারণ রাষ্ট্রের পরিবেশগত নিরাপত্তা কেবল রাষ্ট্রের জনগণের সম্মিলিত অনুশীলনের ভেতর দিয়েই সম্ভব। রাষ্ট্রের পরিবেশগত নিরাপত্তার স্বার্থে জলবায়ু পরিবর্তনসম্পর্কিত দেশের নানা প্রান্তের বৈচিত্র্যময় যাপিত জীবনের ভাবনা এবং অবস্থানগুলোর ভেতর দিয়ে আসুন আমরা আমাদের সমন্বিত পরিকল্পনার উদ্যোগ তৈরি করি।

লোকায়ত জলবায়ু বিজ্ঞান : বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের জলবায়ু-ভাবনা

সন ১৩২৬ সালে
৭ই আশ্বিন বুধবার
হইল রে তুফান।
দিনে করে হুর হরা হুর
রাত্র করে আয়োজন।
ঘর বাড়ী সব ত্যাজ্য করে
জংগলে করিল গমন।[১৭]

(চান্দারবিল এলাকায় সংঘটিত ১৩২৬ বাংলার তুফান নিয়ে রচিত ধুয়া গানের অংশবিশেষ)

প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাজগতে বলা হয়, জলবায়ু ও পরিবেশগত পরিবর্তনগুলো বৃক্ষের বর্ষাবলয়, পরাগরেণু, ফসিল, মাটি, আবহাওয়ামণ্ডলে তার ছাপ এবং

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ রেখে দেয়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগণ কেবল বস্তুগতভাবে নয়, নিজেদের যাপিত জীবনের গল্প কথা গান বাদ্যে জীবনের কথ্য ইতিহাসেও সেসব প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের কাহিনিগুলোর প্রমাণ বংশপরম্পরায় চর্চার ভেতর দিয়ে বাহিত করে। এটিই এই জনপদের পরিবেশ ও আবহাওয়ার ইতিহাস এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে স্থানান্তরের কায়দা ও অনুশীলন।

জলবায়ু পরিবর্তনসম্পর্কিত জনগণের ভাবনা ও অবস্থান নিয়ে খুব বেশি গবেষণা কাজের নজির নেই। সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তন ডিসকোর্সে এই প্রসঙ্গ ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে যে জলবায়ু পরিবর্তনকে ঘিরে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভাবনাচিন্তা এবং উদ্যোগসমূহকে উন্নয়নধারায় যুক্ত করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের নানা সূচক ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে আদিবাসী ও লোকায়ত জনগোষ্ঠীর জ্ঞানকে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হচ্ছে বেশ জোরেশোরেই।[১৮]

সম্প্রতি নীতিনির্ধারকেরাও এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অভিযোজন-প্রক্রিয়ায় জনগোষ্ঠীর স্থানীয় জ্ঞান অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করা এবং গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা জরুরি। বাংলাদেশে দুই বছর স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে দলীয় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক নীতিনির্ধারক জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন-প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিজস্ব খাপ খাওয়ানোর পদ্ধতি এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর প্রস্তাব করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা প্রচলিত 'ওপর থেকে নিচ'—এই ধরনের উন্নয়ন অভিযোজনব্যবস্থাকে খারিজ করে 'তৃণমূল থেকে শীর্ষ' এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে স্থানীয় জ্ঞানের সমন্বয় করে জনগোষ্ঠীর অভিযোজনের জন্য একটি পরিকল্পিত স্বায়ত্তশাসিত অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন নীতি গ্রহণের প্রস্তাব তুলেছেন।[১৯]

কিন্তু এখন পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তনকেন্দ্রিক স্থানীয় জনগণের ভাবনা এবং অবস্থান বিষয়ে তেমন কোনো জনদলিল তৈরি হয়নি। এ ক্ষেত্রে আর্কটিক অঞ্চল, কালাহারি মরুভূমি, আমাজন অরণ্য এবং ভারতের হিমালয় পাদদেশের জনগণ কীভাবে নিজেদের লোকায়ত ধারণা দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেন, সেই সম্পর্কিত কিছু কাজের হদিস পাওয়া যায়। ভেডওয়ান (২০০৬) ভারতের হিমাচল প্রদেশের কুল্লু উপত্যকার আপেলচাষিদের ভেতর দেখিয়েছেন, স্থানীয় আপেলচাষিরা নিজেদের স্থানীয় জ্ঞানের মাধ্যমে আবহাওয়া এবং জলবায়ুসম্পর্কিত জনগোষ্ঠীর ধারণা ব্যাখ্যা করেন পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার ভেতর দিয়ে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর ধারণার ক্ষেত্রে আপেলচাষিরা স্থানীয় এলাকায় তুষারপাতের পরিমাণ এবং সময়ের তারতম্যকে

ব্যাখ্যা করেছেন। কুল্লু এলাকার বিভিন্ন ভৌগোলিক বিন্যাস এবং স্থানে বছরের বিভিন্ন সময়ে তুষারপাতের পরিমাণ বেড়ে এবং কমে গিয়ে আপেল চাষের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। স্থানীয় পাহাড়ি নদী বিয়াসে পান্ডুহ বাঁধ নির্মাণ পাহাড়ি এলাকায় মেঘ জমতে সমস্যা তৈরি করছে এবং প্রাকৃতিক বনপাহাড়ে সরকারের আগ্রাসি চিল (পাইন) বনায়ন ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ হ্রাস করে দিচ্ছে। পাইনের ব্যাপক পরাগরেণু আপেলের পরাগায়নে সমস্যা তৈরি করছে। স্থানীয় আপেলচাষিরা তাঁদের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী এই পরিবর্তনসমূহকে পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন হিসেবে ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন, এর ফলে তাঁদের আপেল চাষ বিঘ্নিত হচ্ছে এবং আপেলকেন্দ্রিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ছে।[২০]

ভেডওয়ান এবং রোধাস (২০০১) জলবায়ু পরিবর্তনকে জনগোষ্ঠীর চিন্তা ও অবস্থানের ভেতর দিয়ে বোঝার সাপেক্ষে ১৯৬২ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত তুষারপাত ও বৃষ্টিপাতের প্রাতিষ্ঠানিক উপাত্তের সঙ্গে জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাকে তুলনা করে দেখিয়েছেন, জনগোষ্ঠীদের ভেতর জলবায়ু পরিবর্তন সরাসরি তাদের নিত্যদিনের কৃষি অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত। আবহাওয়াচক্রে নিত্যনতুন পরিবর্তন, যা স্থানীয় জনগণ নিজেদের আবহাওয়া পঞ্জিকার সঙ্গে মেলাতে পারেন না সেসব ঘটনাকেই জলবায়ু পরিবর্তন বলে আখ্যায়িত করেছেন। পাশাপাশি স্থানীয় কৃষকেরা এটি স্পষ্ট করেছেন যে এই ধরনের পরিবর্তনশীলতা তাঁদের কৃষিজীবনকে প্রভাবিত করছে এবং তাঁরা নানাভাবে এই পরিবর্তনের সঙ্গে যুগ যুগ ধরে খাপ খাওয়ালেও সম্প্রতি এই পরিবর্তনের মাত্রা এবং ভিন্নতা অনেকখানিই উল্টেপাল্টে গেছে।[২১]

একটি সময় পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া নির্ভর করত খাদ্যের উৎস, খাদ্যের প্রাচুর্য, খাদ্য প্রাপ্তি, খাদ্য বিনিময়ের ওপর। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র আমাদের জানান দেয় যে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে জনজীবনের ধারাবাহিকতা বিকশিত হয়েছে। এর ভেতরে মানুষসহ অনেক প্রজাতি, অনেক উদ্ভিদ প্রাণ, শস্য ফসল বিলুপ্ত হয়েছে, অনেক কিছু রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। যাযাবর শিকারজীবী সমাজ থেকে জুম ও কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার ভেতর দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোজনিক সম্পর্ক চিহ্নিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সম্প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক ডিসকোর্সে বেশ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। আদিবাসীরা তাপমাত্রার পরিবর্তন, বৃষ্টি ও তুষারপাতের পরিবর্তন, ঋতু ও জলবায়ু-প্রভাবিত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তন, বাতাস-স্রোত-ঝড়ের পরিবর্তন, বার্ষিক পরিবর্তন, হিমবাহ-বরফ

আচ্ছাদন-নদী-জলধারার পরিবর্তন, প্রজাতি বৈচিত্র্যের পরিবর্তনশীলতার ভেতর দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেন, যা জলবায়ু পরিবর্তনের সূত্র এবং ধারাকে ভালোভাবে বুঝতে সহায়তা করে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অভিযোজনকেন্দ্রিক আদিবাসীদের অবস্থানও স্থানীয় প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্যকে জানাবোঝার ভেতর দিয়েই নিরন্তর স্থানীয় কায়দায় বিরাজিত হয়।[২২] আন্দিজ অঞ্চলের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্থানীয় জ্ঞান ও জলবায়ু অভিযোজন শীর্ষক লেখায় কিরল্যান্ড (২০১২) জানান, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আবহাওয়াসম্পর্কিত ধারণা, ফসলবৈচিত্র্য, কৃষিচর্চা, জল ব্যবস্থাপনা, নির্মাণশৈলী ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব জ্ঞান তাদের বিশুদ্ধ জীবন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার দিকনির্দেশনা দেয়।[২৩] আফ্রিকার মধ্য তাঞ্জানিয়ার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্থানীয় জ্ঞান কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ অভিযোজন কর্মসূচি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, নায়েস (২০০৭) তাঁর একটি উপস্থাপনায় সেটি দেখিয়েছেন।[২৪] জলবায়ু বিপর্যয়ের প্রভাবকে সামলে অভিযোজনের ক্ষেত্রে স্থানীয় জ্ঞানের ভূমিকাকে স্বীকার করে এ জ্ঞানকে সর্বস্তরে বিস্তার, চর্চা ও এর প্রায়োগিক গুরুত্ব তুলে ধরার ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিশেষ ভূমিকা আছে বলে মনে করেন কালাস ও ফিনলে (২০০৯)।[২৫]

উন্নয়ন সমন্বয় নামের এক বেসরকারি উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের ৫৪টি জেলার ১৪৬টি উপজেলায় এবং পরবর্তী সময়ে ২০০২-২০০৩ সালে পঞ্চগড়-কুড়িগ্রাম-সুনামগঞ্জ-টাঙ্গাইল-নোয়াখালী-বরগুনা-ঢাকা-যশোর-সাতক্ষীরা এলাকার কৃষক-জেলেসহ বিভিন্ন পেশাজীবী জনগণের ভেতর আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনবিষয়ক সাধারণ জনগণের ধারণার ওপর একটি সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন, সমীক্ষা অঞ্চলের জনগণ বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু বদলে যাচ্ছে, এ বিষয়ে নানা মতামত দিয়েছেন। অপেক্ষাকৃত কম গরম, গরম বেশি, বৃষ্টিহীন বর্ষা, হেমন্তে বৃষ্টি, উধাও শরৎ, নিষ্ঠুর শীতকাল, পাখির গানহীন বসন্ত এভাবে সমীক্ষা অঞ্চলের মানুষেরা আবহাওয়ার পরিবর্তনকে বুঝিয়েছে।[২৬]

সেন এবং অন্যরা (২০০৭) দেখিয়েছেন, দেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষকেরা বুঝতে পারেন প্রতিবছর কী হারে খরা হবে এবং দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকেরা বৃষ্টিপাতের আগামবার্তা টের পান। কক্সবাজার জেলার রাখাইন আদিবাসীরা ব্যাঙের পায়ের দাগ দেখে বর্ষার আগাম সংকেত ধারণা করতে পারেন। বন্যাপ্রবণ সিরাজগঞ্জের অনেক কৃষক বাড়ির উঠোনে বীজতলা বা নৌকার মধ্যে ভাসমান বীজতলা করে, সিরাজগঞ্জের বসাক-মাহাতো-সিং-ওঁরাও আদিবাসীরা বাড়ির উঠোনকে বৃষ্টির

পিচ্ছিলতার হাত থেকে রক্ষা করতে মেঝেতে ঝিনুকের খোলস বিছিয়ে, সাতক্ষীরার জলাবদ্ধ এলাকায় ভাসমান সবজিবাগান করে বা কনকনা পদ্ধতির মাধ্যমে লবণাক্ততার ভেতর মিঠাপানিকে সংরক্ষণ করে, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জলাবদ্ধ এলাকার মানুষেরা বাগনু বাসা তৈরি করে জীবনকে নানা বিপর্যয় ও দুর্যোগের ভেতর টিকিয়ে রাখছেন।[২৭]

ইমরান (২০০৮) তাঁর একটি লেখায় দেখিয়েছেন, সাতক্ষীরা, যশোর, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালী এলাকার কৃষকেরা জলবায়ু পরিবর্তনকে নিজেদের কৃষিজীবনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বিবেচনা করে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের একটি 'স্বাদ' আছে।[২৮] জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানের তারতম্য এবং জলবায়ুগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বর্তমানে 'অভিযোজনকে' কেন্দ্রীয় বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে। অনেকেই অভিযোজনের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীকেন্দ্রিক অভিযোজনকেই সর্বাধিক কার্যকর এবং স্থায়িত্বশীল মনে করেন। ঢাকার করপোরেট র‍্যাডিসন ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে ২৪-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কশপ অন কমিউনিটি-বেজড অ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ কর্মশালায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের সংকটাপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য জনগোষ্ঠীকেন্দ্রিক অভিযোজনের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[২৯] বাংলাদেশের জনগণ চারপাশের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও প্রতিবেশে নিরন্তর যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে সেসব পরিবর্তনকেই জলবায়ু পরিবর্তন হিসেবে দেখেন। স্থানীয় বাস্তুসংস্থান, আবহাওয়াচক্র এবং প্রাণবৈচিত্র্যের নানা সাড়া ও নির্দেশনা থেকে এই পরিবর্তনের চিহ্নগুলো তাঁরা আঁচ করতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের জনগণের ভাবনা ও অবস্থান বিষয়ে যেসব কাজের নজির পাওয়া যায়, সেখানে জনগণের চিন্তাকাঠামোকে অনেকটাই একপক্ষীয় ও এককবৈশিষ্ট্য হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে। ভারত, বাংলাদেশ, কেনিয়া ও পেরুর গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিশেষত গ্রামীণ নারীর স্থানীয় জ্ঞান কৃষিসহ দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে সম্পর্কিত তা আলোচনা করে আবেকা ও অন্যদের (২০১২) একটি গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রামীণ নারীর স্থানীয় জ্ঞান জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার ক্ষেত্রে স্থানীয় অভিযোজন কৌশল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জামালপুর, বান্দরবান ও খুলনা অঞ্চলের উদাহরণ টেনে সাদিয়া আনোয়ার ও অমৃতা রেজিনা রোজারিও দেখিয়েছেন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কৃষি, প্রাণীসম্পদ, মৎস্য ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ নারীর জ্ঞানের দিকগুলো। সেখান থেকেই তারা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অভিযোজনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীর ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন।[৩০]

নিচের ছকে বাংলাদেশের জনগণের জলবায়ু পরিবর্তনসম্পর্কিত নির্দেশনাগুলোকে সংক্ষেপে হাজির করছি :

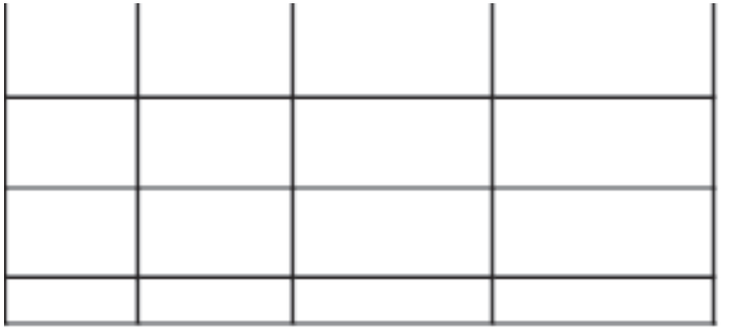

(বি.দ্র. উল্লিখিত ছকটি চলমান এবং পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার অংশ। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের জনগণের জলবায়ুকেন্দ্রিক নিজস্ব নির্দেশনা ও কারিগরির ভেতর দিয়ে এ ছকটি রূপান্তরিত হবে। যা সামগ্রিক জলবায়ু বিপর্যয়ের রূপ ও ধরন বুঝতে আমাদের সহযোগিতা করতে পারে)

বাংলাদেশের জনগণ একসময় দেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয়টি ঋতুকে নিজেদের যাপিত জীবনের ভেতর দিয়ে আঁচ করতে পারত কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই এই অবস্থা সাম্প্রতিক সময়ে পাল্টে গেছে। বর্তমানে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতকাল বাদে আর কোনো ঋতুকে টের পাওয়া যাচ্ছে না। দেশে শুষ্ক শীতকাল পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাস। এই সময় দেশের উত্তর-পশ্চিম কোণে গড় তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সে. এবং উপকূলীয় এলাকায় তা প্রায় ২০ ডিগ্রি সে.।

প্রাক-মৌসুমি উষ্ণ গ্রীষ্মকাল ফাল্গুনের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই সময়ে উপকূলীয় অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ২৭-২৯ ডিগ্রি সে.। গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বর্ষাকাল জ্যৈষ্ঠের শেষ থেকে আশ্বিনের শেষ পর্যন্ত। এই সময়ে দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে গড় তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সে. এবং পূর্বাঞ্চলে ২৭ ডিগ্রি সে.। শরৎকাল কার্তিকের প্রথম থেকে অগ্রহায়ণের শেষ পর্যন্ত। এই সময়ের গড় তাপমাত্রা ২৩-২৫ ডিগ্রি সে.।[৩১] স্থানিক প্রতিবেশের সঙ্গে সংলগ্ন থেকেই এখানকার জলবায়ুর পরিবর্তনগুলোকে এক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তন হিসেবে পাঠ করে এ দেশের প্রান্তিক জনগণ। জনগণের যাপিত জীবনের এই অনন্য বিজ্ঞানভাবনা দিয়ে এবার আমরা জলবায়ু পরিবর্তনকেন্দ্রিক দেশের নানা প্রান্তের কিছু টুকরো অভিজ্ঞতার আওয়াজ শুনব, যেখানে জনগণের জলবায়ুপঞ্জিকাতে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু গরমিল তৈরি হচ্ছে এবং এর প্রভাব স্থানীয় প্রাণবৈচিত্র্যসহ জীবন-জীবিকার সবখানেই পড়ছে।

ব্যাঙ নেই, বৃষ্টি নেই! মেঘ নেই, ব্যাঙ নেই!!

ব্যাঙ ডাকে ঘন ঘন
শীঘ্র হবে বৃষ্টি যেন।।

(খনার বচনে বলে যে ব্যাঙের ডাক বৃষ্টি হওয়ার লক্ষণ।)

ব্যাঙাই ব্যাঙির বিয়া
ষোল্ল মুটুক দিয়া
ও ব্যাঙাই মেঘ আন গিয়া।
ব্যাঙাই ব্যাঙির মাগো
এক ফোঁটা পানি দেও মেঘে ভিইজ্যা যাই
খাল নাই পানি বিল নাই পানি
আসমান ফাটিয়া পড়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি।

(সজনার হাওর এলাকার হরিপুর গ্রাম থেকে ব্যাঙের বিয়ের এই গীতটি সংগ্রহ করা হয়েছে। হরিপুর, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ)

আমাদের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ব্যাঙের উপস্থিতি এবং ব্যাঙের ডাক প্রকৃতির এক প্রতিবেশীয় সূচক এবং আবহাওয়ার এক অনন্য নির্দেশক। মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের লাউয়াছড়া বনে অবস্থিত লাউয়াছড়া খাসিয়াপুঞ্জির পানজুমিয়াদের কাছে বনের নানা প্রজাতির ব্যাঙ হচ্ছে পরিবেশের নানা তারতম্যের নির্দেশক। লাউয়াছড়া বনে একটি সবুজ ব্যাঙ প্রজাতি যা বনের আর্দ্রতা ঠিক থাকার নির্দেশক ছিল বর্তমানে বিলুপ্ত হয়েছে। ব্যাঙ বিলুপ্তির ফলে পানজুমিয়া খাসিয়ারা এখন অনেক ক্ষেত্রেই ঠাহর করতে পারেন না বনের আর্দ্রতার পরিমাপ, কিন্তু পানজুমের জন্য একটি স্থিতিশীল আর্দ্রতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জের হাওর জনপদের বাঙালিদের ভেতর বৃষ্টির প্রার্থনায় ব্যাঙের বিয়ের আয়োজন করা হয়। অনাবৃষ্টি এবং খরার সময় গ্রামের কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েরা মিলে গ্রাম ঘুরে ঘুরে এই পর্ব পালন করে বৃষ্টির প্রার্থনায়। টাঙ্গাইলের মধুপুরের শালবনের মান্দি জনগোষ্ঠীর ভেতর জুম চাষের সময় বীজ লাগানোর পর বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা হয়, এই ধরনের প্রার্থনা খাগড়াছড়ির ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর ভেতরও আছে। হাওর জনপদের মানুষেরা জানালেন, ব্যাঙ যদি ডাকে তবে বোঝা যায় বৃষ্টি হবে। কিন্তু বর্তমানে ব্যাঙ যেমন নেই সেটিও সত্য আবার বৃষ্টি কখন না কখন হয় সেটিরও ঠিক নেই। এই যে প্রতিবেশের একটি প্রাণীর অনুপস্থিতি, একেই হাওর জনপদের মানুষেরা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ভেতর জলবায়ুগত পরিবর্তনশীলতার একটি ঘটনা হিসেবে পাঠ করে। এই ঘটনাটি স্থানীয় জনগণের আবহাওয়াপঞ্জিকাতে নির্দেশ করে বৃষ্টিপাতের আগমন এবং পরিমাণ।

ব্যাঙ এবং বৃষ্টিপাতের এই যে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখার জায়গা এটিই হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের প্রতিবেশকেন্দ্রিক ধারণা ও চিন্তাজগতের পাটাতন। স্থানীয় জনগণ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংলগ্ন থাকলেও করপোরেট মুনাফা বাজার কিন্তু ব্যাঙদের আর ভারসাম্যের বাস্তসংস্থানে থাকতে দেয়নি। ব্যাঙ নেই বলে যে বৃষ্টিপাতের ধরন এবং আগমনকেই কেবল পাঠ করা যাচ্ছে না তা নয়, ব্যাঙের অনুপস্থিতি প্রাকৃতিক বাস্তসংস্থানের ভারসাম্য বিপন্ন করেছে। দেশে অনেক জনগণের খাদ্যের উৎস ছিল এই ব্যাঙ, ব্যাঙের বিলুপ্তি অনেক জনগণের খাদ্যাভ্যাস এবং খাদ্যসংস্কৃতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। ব্যাঙ কৃষি ও জুমের অনেক পোকামাকড় খেয়ে কৃষকের শস্য ফসলকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু করপোরেট ব্যাঙের পা বাণিজ্যের জন্য এই ব্যাঙ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর আমাদের কৃষকের ধানখেতে পোকামাকড় মারতে সমানে দোকান খুলেছে মনসান্টো, সিনজেন্টা, বায়ার ক্রপ সায়েন্স, বিএএসএফের মতো বড় দশাসই করপোরেট বিষ কোম্পানি। বাংলাদেশের গ্রাম জনপদ থেকে একটা সময় ব্যাঙ হত্যা করে ব্যাঙের পা দেশের বাইরে উত্তরের ধনী দেশগুলোর জন্য রপ্তানি করা হয়েছে। সেসব ব্যাঙ কারবারি দেশগুলোর জন্যই আজ পৃথিবীর জলবায়ু বদলে গিয়ে অনেক বেশি উষ্ণ হয়ে পড়ছে। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত ১২ বছরের একটি গড় হিসাবে দেখা যায়, ভারত থেকে প্রতিবছর ২৭৭০ মেট্রিক টন সোনা ব্যাঙের পা আমেরিকা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, জার্মানিতে খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য রপ্তানি হয়েছে। ৬০টি ব্যাঙের পা একত্র করলে ওজন হয় মাত্র এক কেজি। ২৭৭০ মেট্রিক টন ব্যাঙের মাংসের জন্য প্রতিবছর ভারতে হত্যা করা হয়েছে চার কোটি ১০ লাখ ব্যাঙ।[৩২] একটি ব্যাঙ গড়ে প্রতিদিন ১০০ গ্রাম পোকামাকড় খায়, ব্যাঙ না থাকায় কৃষি জমির পোকামাকড়দের মারার জন্য কী ব্যাপক পরিমাণ করপোরেট বিষ ঢালতে হয়েছে সেটি কি ভাবা যায়?

কিন্তু বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগণ বরাবরই নির্বিচার ব্যাঙ হত্যা এবং করপোরেট ব্যাঙ বাণিজ্যের বিরোধিতা করেছে। ১৯৭৯ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে দেশে প্রচণ্ড খরা হয়। পুকুর, খাল, বিল শুকিয়ে যায়। বোরো ধান হয়নি, আউশ বপন করা যায়নি। বোনা পাট মরে যেতে থাকে। কাপ্তাই হ্রদে পানি শুকিয়ে যাওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। তাপমাত্রা ৪৩.৩ ডিগ্রি সে. পর্যন্ত ওঠে। গরমে ও পানির অভাবে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার মরতে থাকে। এমতাবস্থায় গাইবান্ধায় গ্রামবাসী ব্যাঙশিকারিদের আক্রমণ করে। তাদের ধারণা শিকারিরা ব্যাঙ ধরে ফেলছে, সে জন্য দল বেঁধে ব্যাঙ ডাকতে পারছে না, ফলে বৃষ্টিও হচ্ছে না।[৩৩]

দেখা যায় না তেতস্লাং! মাটি ফুঁড়ে বেরোয় না দামবং[৩৪]!!

যদি বলা হয় বজ্রপাতের প্রাণবৈচিত্র্য নির্দেশক কী? বাংলাদেশের খাসিয়া ও মান্দি আদিবাসীরা বলবেন তেতস্লাং এবং দামবংয়ের মতো জঙ্গলে মাটি ফুঁড়ে বেরোনো প্রাকৃতিক ছত্রাক বা মাশরুম হলো বজ্রপাতের প্রাণবৈচিত্র্য নির্দেশক। মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার কালেঞ্জি খাসিয়াপুঞ্জির জনগণের লোকায়ত ধারণা, যখন আকাশে বিজলি চমকায় এবং বজ্রপাত হয় তখনি বনের ভেতর মাটি ফুঁড়ে বেরোয় তেতস্লাং নামের মাশরুম। এই ধারণা টাঙ্গাইলের মধুপুর শালবনের মান্দিদের ভেতরও একই, বজ্রপাতের পরপরই জঙ্গলে দেখা মেলে সুস্বাদু মাশরুম দামবংয়ের। মাতৃসূত্রীয় খাসিয়া এবং মান্দি জনগণ বর্তমানে জঙ্গলে আর তেমন একটা প্রাকৃতিক মাশরুম খুঁজে পান না। মাশরুমদের এই অনুপস্থিতিকে তাঁরা বজ্রপাত হওয়া না হওয়ার পরিবর্তনশীলতা হিসেবে পাঠ করেন। পাশাপাশি প্রাকৃতিক বনের বিলুপ্তি এবং প্রাতিবেশিক উপাদানে স্থিতিশীলতা না থাকাও এসব মাশরুম না পাওয়া যাওয়ার কারণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। খাসিয়া ও মান্দিরা প্রাকৃতিক বন কেটে বন বিভাগের আগ্রাসী প্রজাতির বাণিজ্যিক বাগান করাকে প্রাকৃতিক মাশরুম বিলুপ্তির একটি প্রধান কারণ বলে মনে করেন। মাশরুম না পাওয়া যাওয়ায় একই সঙ্গে বজ্রপাতের হিসাবেও গরমিল হচ্ছে বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁরা নিজেদের লোকায়ত বিজ্ঞান দিয়ে বজ্রপাত এবং স্থানীয় মাশরুমদের মধ্যে একটি যোগসূত্র খুঁজে পান। তাঁদের অনেকেই বর্তমানে চাষ করা যায় এমন মাশরুম নিরীক্ষা করে দেখেছেন, সেসব মাশরুম গজানোর সঙ্গে বজ্রপাতের কোনো সম্পর্ক নেই। এই যে বজ্রপাত জানান দিচ্ছে প্রকৃতিতে মাশরুমের উপস্থিতি এবং মাশরুম জানান দিচ্ছে বজ্রপাত হয়েছে—এসবই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিবেশগত ধারণার অংশ। মাশরুমের দেখা না পেলেও স্থানীয় জনগণ জানালেন, বর্তমানে বজ্রপাতের পরিমাণ এবং বজ্রপাত হওয়ার এলাকা বদলে গেছে।

সুনামগঞ্জের হাওর এলাকায় হিরালপ্রথা বলে একটি প্রথা আছে এবং গোপালগঞ্জের চান্দারবিল এলাকায় শিরালী বলে একধরনের পেশা আছে। এই হিরাল ও শিরালীদের কাজ ছিল এককালে বজ্রপাত এবং শিলাবৃষ্টি থেকে হাওর ও বিলের শস্য ফসলকে রক্ষা করা। তাঁরা বছরের একটা সময় নিয়ম মেনে হাওর এবং বিলের একটি এলাকা মন্ত্রবাণ মেরে সেই এলাকায় শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতকে আটকে দিতেন এবং প্রার্থনা করতেন যাতে বজ্রপাত না হয়। শস্য ফসল যাতে রক্ষা পায়। গোপালগঞ্জের শিরালীদের মতে, বর্তমানে বজ্রপাত আর আগের মতো আগের ঋতুতে হয় না। এখন বজ্রপাত হওয়ার কোনো বাছবিচার নেই, সময় এবং জায়গা বদলে গেছে। এখন বিল-হাওর এলাকায় বজ্রপাতের

পরিমাণ অনেক বেশি কমে গেছে, বরং বাংলাদেশের উত্তর-দক্ষিণাঞ্চলে বজ্রপাত বেড়েছে। শিরালীদের ধারণা, দিন দিন যে হারে মোবাইল কোম্পানির টাওয়ার বাড়ছে তার ফলেই বজ্রপাত কোথাও বেড়েছে, কোথাও কমেছে, মানে বজ্রপাতের ধরন ও চরিত্র পাল্টে গেছে। এই যে স্থানীয় এলাকায় আবহাওয়াচক্রের পরিবর্তন তা স্থানীয় পরিবেশভিত্তিক পেশানির্ভর জনগণকে পেশা ও জীবন টিকিয়ে রাখতে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করছে। চান্দারবিলে যেহেতু এখন বজ্রপাতের প্রসঙ্গগুলো বদলে গেছে, তাই স্থানীয় শিরালীরা এখন চান্দারবিল এলাকা ছেড়ে পেশা ও জীবিকা টিকিয়ে রাখতে খুলনাসহ আরও দক্ষিণ এলাকায় যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

পোকারা ডাকে না! ঋতুর ডাকও বোঝা যায় না[৩৫]!!

বান্দরবান সদর উপজেলার ৫ নম্বর টংকাবতী ইউনিয়নের টাকের পানছড়া মৌজার এমপুপাড়া গ্রামের ম্রোরা জানিয়েছেন, ম্রো শ্রেণীকরণবিদ্যা অনুযায়ী প্রতিটি পোকামাকড়েরই আলাদা নাম আছে। প্লং মানে উড়তে পারে এমন পোকামাকড়। যেমন প্লং ক্যাং মানে সবুজ ঘোড়াফড়িং, এর পেটে যখন ডিম থাকে তখন এটি খেতে খুবই সুস্বাদু। ম্রোরা জীবনযাপনের বিজ্ঞান দিয়ে পোকামাকড়দের প্রতিবেশব্যবস্থার এক অনন্য নির্দেশক হিসেবে শনাক্ত করেছেন। এক এক পোকার উপস্থিতি, এক এক পোকার ডাক মানে এক এক ঋতু এবং ঋতুবদলের নির্দেশনা। এক এক পোকার উপস্থিতি এক এক প্রতিবেশীয় বাস্তুসংস্থানকেও নির্দেশ করে। পোকামাকড়েরা ম্রোদের জীবনে একধরনের দিনপঞ্জিকা হিসেবেও কাজ করে। পাহাড়ে পোকাদের ডাকের ভেতর দিয়েই ম্রোরা বুঝতে পারেন কোন ঋতু এসেছে। একেক পোকার ডাক মানে একেক ঋতু। এপ্রিল-মে এই দুই মাস পাহাড়ে ঝিঁঝি পোকা ডাকে মূলত দিনের বেলায়। ম্রোরা বুঝতে পারেন প্রাতলা মাস এসেছে। আর এই মাসেই জুমে বীজ বোনার সময়। ম্রোরা ঐতিহ্যগতভাবে জেনে এসেছেন কুয়াই ঝেং ঝেং (ঝিঁঝি) পোকারা ডাকলে 'চাসতখিনের (ধান বোনা)' সময় আসে। ঝিঁঝি পোকাদের ডাক বন্ধ হলে আর বীজ বোনা যায় না জুমের পাহাড়ে পাহাড়ে। পাহাড়ে লাইক্লাং পোকা ডাকতে শুরু করলে ম্রোরা বুঝতে পারেন জুলাই-অক্টোবর মাস চলছে। ম্রোদের ঐতিহ্যবাহী খাদ্যনিরাপত্তাকে নিশ্চিত করা এই পোকাদের ডাক শেষ হওয়া মানে জুমের ধান কাটার সময় চলে আসা। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ডাকতে থাকে তংথের পোকা, মাটির ভেতর থাকা এই পোকারা রাতের বেলায় ডাকে আর ওই সময় চামরামএ্যাত নামের পোকারা ডাকে দিনের বেলায়। জুমের ওপর নির্ভরশীল ম্রো নারীরা জানান, বর্তমানে পোকাদের ডাকাডাকিতেও পরিবর্তন এসেছে, এক ঋতু পেরিয়ে অন্য

মাস এলেও দেখা যায় পোকারা ডাকতে শুরু করেনি। পাহাড়ে পাহাড়ে এই পরিবর্তনগুলো প্রবীণ আদিবাসীদের জীবনে একেবারেই নতুন। স্থানীয় আদিবাসীদের ধারণা, পাহাড়ে প্রাকৃতিক বন উজাড় করে বন বিভাগের সেগুনসহ বিভিন্ন বিদেশি প্রজাতির বাগান করা, পাহাড়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক স্থাপনা, সামরিক প্রশিক্ষণসহ বহিরাগতদের নির্বিচারে পাহাড়ে প্রবেশ পরিবেশের ওপর চাপ তৈরি করেছে। ফলে প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থান পোকাদের জন্য সহনীয় হচ্ছে না। পোকামাকড়ের উপস্থিতি এবং ডাকাডাকিতে হেরফেরের ভেতর দিয়ে ম্রোরা ঠিকই আঁচ করতে পারেন, আবহাওয়াচক্রে এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। পোকাদের অনুপস্থিতি বা ডাকাডাকির তারতম্য যেমন ঋতুর পরিবর্তনকে জানান দেয়, একই সঙ্গে বদলে যাওয়া জলবায়ুর প্রভাবও পোকামাকড়ের ওপর পড়ে বলে ম্রোরা ধারণা করেন।

পাশাপাশি শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার রাংটিয়া শালবনের কোচ আদিবাসীরা মনে করেন, উইপোকার উপস্থিতি গরম বোঝায় এবং এটি নির্দেশ করে বৃষ্টি হতে পারে। ঠাকুরগাঁওয়ের মুজার্বনী সাঁওতাল আতোর (গ্রাম) মানুষের বিশ্বাস, যদি মাটিতে লাল এবং কালো পিঁপড়ার সারি দল বেঁধে ঘুরতে দেখা যায় তবে বোঝা যায়, বর্ষা আসতে আর বেশি দেরি নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারা মনে করেন, যদি পাহাড়ি পিঁপড়ার সারেকে দ্রুত কোনো এলাকা থেকে স্থান পরিবর্তন ও স্থানান্তরিত হতে দেখা যায় তবে এটি নির্দেশ করে, বর্ষা এবং বড় বন্যা হতে আর দেরি নেই। এই যে পোকামাকড়ের সঙ্গে আমাদের জলবায়ুজীবনের এক অনন্য সম্পর্ক, তা দিনে দিনে আড়াল করে দেওয়া হচ্ছে। পোকাবৈচিত্র্যকে নিশ্চিহ্ন করতে আজ করপোরেট বিষ কোম্পানিরা আমাদের গ্রামে গ্রামে দোকান খুলেছে। সারা পৃথিবীতে মাত্র ১০টি শীর্ষ বিষ কোম্পানি পৃথিবীর কৃষকদের কৃষিপঞ্জিকা এবং কৃষি অনুশীলনকে গায়েব করে প্রাণবৈচিত্র্য এবং জলবায়ুবিনাশী বাণিজ্য করে যাচ্ছে। পোকামাকড় মারার জন্য যত বেশি বিষ তৈরি হবে কারখানায় ততই বাড়বে পৃথিবীতে কার্বন ডাই-অক্সাইড, যত বেশি কার্বন তত বেশি গরম হয়ে বদলে যাবে পৃথিবীর জলবায়ু। আর পরিবর্তিত জলবায়ুর সর্বনাশা ঘানি টেনে খাপ খাওয়াতে বাধ্য হতে হবে আমাদের মতো গরিব দেশের কৃষকদেরই। পতঙ্গ হত্যাকারী এসব কোম্পানির ভেতর বায়ার ক্রপ সায়েন্স ২০০৬ সালে ৪৬,৯০০ কোটি টাকার কৃষিরাসায়নিক বিষের বাণিজ্য করেছে, সিনজেন্টা করেছে ৬,৪০০ মিলিয়ন ডলার, মনসান্টো ৩,৩০০ মিলিয়ন ডলার। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক বীজ কোম্পানি মনসান্টো ২০০৬ সালে ডেল্টা অ্যান্ড পাইন ল্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে ৪,৪৪৬ মিলিয়ন ডলারের কৃষিবিষের বাণিজ্য করেছে।[৩৬]

তাপ বাড়ছে তাপ! সাপ মরছে সাপ!!

পৌষে গরম বৈশাখে জারা
প্রথম আষাঢ়ে ভরে গাড়া
খনা বলে শোন হে স্বামী
শাওন ভাদরে নাইকো পানি।

(খনার এই বচনে বলা হচ্ছে পৌষ মাসে যদি গরম পড়ে এবং বৈশাখে যদি শীত হয়, আষাঢ় মাসে যদি অধিক বৃষ্টি হয় তবে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে অনাবৃষ্টি এবং খরা হবে।)

বিশেষজ্ঞরা ২৬.৭-৩২.২ ডিগ্রি পর্যন্ত মৃদু দাবদাহ, ৩২.২-৪০.৬ ডিগ্রি পর্যন্ত মাঝারি এবং ৪০.৬-৫৪.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রাকে মারাত্মক দাবদাহ হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৩৭] বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে তাপমাত্রার তারতম্য থাকলেও বর্তমানে এটি তাপ বাড়ার দিকেই এগিয়েছে। 'গরমকাল' আমাদের দেশের জন্য একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার অংশ কিন্তু হঠাৎ করে গরম বেড়ে যাওয়াকে জনগণ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় আবহাওয়াচক্রের বিপর্যয় হিসেবেই দেখেন। 'গরমের' মতো একটি আবহাওয়াগত ধারণাকে 'কাঠফাটা গরম', 'ভ্যাপসা গরম', 'ভোমা গরম', 'অস্বস্তিকর গরম', 'চরম গরম', 'দমবন্ধ গরম', 'মাত্রাতিরিক্ত গরম', 'বিরক্তিকর গরম', 'অস্বাভাবিক গরম', 'বেসম্ভব গরম', 'দুঃসহ গরম' হিসেবে চিহ্নিত করার ভেতর দিয়ে আমরা টের পাই, জনগণ আবহাওয়ার পরিবর্তনগুলো কীভাবে আঁচ করেন এবং এই পরিবর্তনকে নিজেদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করেন। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের জনগণ গরমকে দুঃসহ, অস্বাভাবিক, মাত্রাতিরিক্ত, অসহ্য—এই শব্দগুলো দিয়ে চিহ্নিত করার মানে হচ্ছে এমন একটা সময় ছিল যখন 'গরম' ছিল সহ্যের ভেতর, স্বাভাবিক, মাত্রার ভেতর কিন্তু এই অবস্থাটি বর্তমানে পাল্টে গেছে। আর আবহাওয়ার এই পাল্টে যাওয়া প্রভাবিত করেছে মানুষের ভাষা ও শব্দ প্রয়োগের ধরনকেও। ২০০২ সালের ২৭ মে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সাতক্ষীরাতে (৩২.৬ ডিগ্রি সে.)। আর ওই দিন সাতক্ষীরা থেকে মাত্র ৭০ কি.মি. দূরে যশোরে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (২০ ডিগ্রি) রেকর্ড করা হয়। আবার ঠিক পরের দিনই ২৮ মে ২০০২ তারিখে যশোরে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (৩৩.২ ডিগ্রি) রেকর্ড করা হয়। কয়েক বছর ধরে যশোর ও রাজশাহীর চারপাশে মাত্র ৫০-৬০ কিলোমিটারের মধ্যে একই দিনে দেশের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করেছে এবং এসব অঞ্চলে তাপমাত্রার দৈনিক ব্যবধান হচ্ছে ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি।[৩৮] ২০০৩ সালের ৭ এপ্রিল রাজশাহীতে একসঙ্গে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (৩৭.২ ডিগ্রি) এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (২০.২ ডিগ্রি) রেকর্ড করা হয়। গ্রীষ্মকালে একই স্থানে একই দিনে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড বাংলাদেশে বিরল। এই দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ব্যবধান ১৭ ডিগ্রি সে., যা সাধারণত মরু অঞ্চলেই দেখা যায়। ২০০৩ সালের মে

মাসের মোট ১৭ দিন যশোরে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা অবস্থান করার পর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেও যশোরে তিন দিন ও চুয়াডাঙ্গায় এক দিন দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দেখা যায়। ২০০৩ সালের ৮ জুনও যশোরে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.২ ডিগ্রি সে.।[৩৯]

গোপালগঞ্জের চান্দারবিল এলাকার কৃষকেরা জানালেন, আগে গরমের দিনে বিলের পানিতে কচুরিপানার ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়িয়ে শৈল মাছ পানির তাপ নিত। শালুক কুড়ানোর দিনে বিলের মাটিতে পা দিলে পা নরম কাদায় দেবে যেত এবং ধবধব করে শব্দ হতো। এই মাটির জন্য বুননি ধানের বীজ মাটির দলার ভেতর ভরে ঢিল দিয়ে দিয়ে ফেলা হতো বিলে, তাতেই গজাত ধান, তাতেই ফসল। কিন্তু দিনে দিনে তাপ বেড়ে যাওয়াতে বিল এলাকার মাটি শক্ত হয়ে গেছে এবং যান্ত্রিক সেচভিত্তিক উফশী ধানের চাষ আসার পর বিলের মাটি আর আগের মতো নেই। মাটি দিনে দিনে শক্ত হয়ে গেছে। এখন বিলে যে পরিমাণ তাপ থাকে আর মাটি যে শক্ত কোনো বুননি ধান আর জন্মেও এই চান্দারবিলে হবে না বলে জানান কৃষকেরা।

অতিরিক্ত তাপ বাড়ার কারণে মাছ, পশু-পাখিসহ মানুষই কেবল মরছে না, অনেক শস্য ফসলের জাতও এই গরমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। গরমের দিনে দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোতে মিরপুর চিড়িয়াখানায় বন্দী প্রাণীদের করুণ সব ছবি ছাপা হয়, পাশাপাশি দাবদাহে মানুষের করুণ মৃত্যুর খবরও ছাপা হয়। এই তাপ কেবল জীবন নয়, বিপর্যস্ত করে কৃষিসহ সব পেশাকেই। অতিরিক্ত গরমের ক্ষেত্রে একটি প্রাণবৈচিত্র্য নির্দেশকের কথা বলেন বাংলাদেশের জনগণ, সেটি হলো গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাপের উপস্থিতি এবং তখনই নিজস্ব বাসস্থান ছেড়ে বেরিয়ে আসা সাপ মানুষের হাতে নির্মম কায়দায় মারা পড়ে অনায়াসে। চা-বাগানেও অতিরিক্ত গরমে সাপেরা বাইরে চলে আসে এবং অনেক সাপ চা-বাগানিদের হাতে মারা পড়ে। সাপ বুকে হেঁটে চলা সরীসৃপ প্রাণীদের ভেতর আবহাওয়ার পরিবর্তনকে আঁচ করতে পারে অনেক আগ থেকেই। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের গ্রামে গরমের সময় সাপের চলাচল বেড়ে যায়, ফলে এই সময় সাপ থেকে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। বর্তমানে যে হারে সাপ নিশ্চিহ্ন হয়েছে, এখন আর তাপের তারতম্য বোঝার জন্য যেমন সাপকে দেখা যায় না, পাশাপাশি তাপের তারতম্যও সাপেদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে ভিন্ন কায়দায়। আবহাওয়াচক্রে তাপ বেড়ে যাওয়ার মানে হলো সাপেদের জন্য অনিরাপত্তা তৈরি হওয়া, সাপেদের মৃত্যু মানে বাস্তুসংস্থানে বিপর্যয়, যা পরোক্ষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনকে আরও অনেক বেশি নেতিবাচক করে তুলতে পারে।

গ্রাম পাহাড়ের মানুষেরা ধারণা করেন, রাসায়নিক সার-বিষ-সেচযন্ত্র-উফশী ও

হাইব্রিড ফসলের মাধ্যমে প্রবর্তিত কৃষিব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক বন কেটে আগ্রাসী গাছের বাণিজ্যিক বাগান, অপরিকল্পিত তেল-গ্যাস-পাথর-বালু খনন, নদী-জলাশয়ের মৃত্যু, পাহাড় কাটার ফলেই স্থানীয় এলাকার তাপমাত্রায় তারতম্য ঘটেছে। টাঙ্গাইলের মধুপুর প্রাকৃতিক শালবন কেটে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে জলবায়ু পরিবর্তন এবং জনস্বাস্থ্যবিষয়ক একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, জনগণ গত ২০ বছরের জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের স্বাস্থ্য সমস্যার বিষয়গুলোও তুলে ধরেন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নিত্যনতুন বিভিন্ন রোগ এবং স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে জনগণ মনে করেন।[৪০] বাংলাদেশের জনগণও আবহাওয়াজনিত পরিবর্তনের ফলে নিত্যনতুন রোগকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ হিসেবে ধারণা করছেন। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়ন ও পরামর্শে যখন রাবার বাগান তৈরি করা হয় তখন থেকেই স্থানীয় এলাকায় গরম অনেক বেড়ে গেছে। ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে টাঙ্গাইলের মধুপুরের পীরগাছা রাবার বাগানের গরমে স্থানীয় নেংড়াবাজার ভবানীরটেকী গ্রামের দরিদ্র রাবার বাগানের ট্যাপার হোসনা বেগম মারা যান, ওই সময় তিনটি গরুও মারা যায়। মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জের চা-বাগান শ্রমিকদের মতে, চা-বাগানে প্রশ্নহীন কায়দায় করপোরেট কোম্পানির বিষ এবং বাগানে কোনো প্রাকৃতিক বন না রাখার কারণে বাগানে আগের চেয়ে গরম অনেক বেড়ে গেছে। আর গরমের দিনে চা-বাগানগুলোতে পানিসংকট দেখা দিচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে নানা রোগ। তীব্র গরম ও পানিসংকটে ডায়রিয়ায় ভোগে মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার চা-বাগানগুলোতে ২০০৭-২০০৮ সালে মারা যান প্রায় ৪০ জন চা-বাগানি।

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর, ধরমপাশা উপজেলার যাদুকাটা নদী টাঙ্গুয়ার হাওর পাড়ের হাজং জনপদ এখন পাহাড়ি বালু এবং পাহাড়ি ঢলে নিশ্চিহ্ন হওয়ায় কৃষিভূমি থেকে উদ্বাস্তু হাজংয়েরা জীবন টিকিয়ে রাখতে জীবনের সবটা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে যান উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয় রাজ্যের বিভিন্ন পাথর ও কয়লাখনিতে। কয়লা ও পাথরখনির ফলে সীমান্তবর্তী এলাকায় দিনে দিনে তাপমাত্রার তারতম্য হচ্ছে বলে জানালেন হাজংয়েরা। কয়লাখনি এলাকায় একধরনের গ্যাস তৈরি হয়, এর ফলে অনেকে মারাও গেছেন। অনেকে পাথরখনি ধসে মারা যান। অথচ দরিদ্র জনগণকে বিপর্যস্ত করেই মুনাফার বাজার গড়ে তুলেছে লাফার্জের মতো করপোরেট সিমেন্ট কোম্পানি। হাজংরা জানালেন, আগে এই এলাকায় এত বেশি মশার উপদ্রব ছিল না, দিনে দিনে গরম বাড়ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মশার সংখ্যা বাড়ছে এবং এখানে ম্যালেরিয়া রোগ দ্রুত ও ভয়াবহ হারে ছড়িয়ে পড়ছে। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির ফলেও স্থানীয় এলাকায় তাপমাত্রাতে পরিবর্তন এসেছে, পাশাপাশি বাতাস অনেক বেশি ভারী হয়ে গেছে

বলে স্থানীয়রা ধারণা করেন। এভাবেই বায়ুদূষণের ফলে ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে বেলজিয়ামের মিউস উপত্যকায় পাঁচ দিন ধরে গোটা এলাকা দূষিত হয়ে ৬৩ জন মারা যায় এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে প্রায় ৬০০০ মানুষ।[৪১] বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকার কৃষি ও পরিবেশ উদ্বাস্তু কত মানুষ ভারতের পাথর ও কয়লাখনির বিষাক্ত গ্যাস ও বাতাসের ভেতর কাজ করে মারা যান, আক্রান্ত হন কত না ভাবেই, তার কোনো হদিস কি রাখে দেশ!

বসন্তে ডাকে না কোকিল! ডুমুর মেলে না ডালে!!

আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া গেল রে
মরার কোকিলে
আমায় উদাসী করিয়া গেল
বসন্তেরই কালে
(রে) মরার কোকিলে...।

(বাংলাদেশের শিল্পী মমতাজের গাওয়া বাঙালি জনপদে বেশ জনপ্রিয় একটি গান)

টাঙ্গাইলের মধুপুর শালবনে একসময় ছিল দুদি (ময়ূর), দুদিরা পেখম মেললেই মান্দি আদিবাসীরা বুঝতেন বৃষ্টি নামবে। বর্তমানে দুদিও নেই আর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও সময়ও বদলে গেছে। এই জনপদের লোকায়ত বিজ্ঞান বলে যে কোকিল বসন্তকালের আগমনী বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। কোকিলের ডাক বসন্ত ঋতুর প্রাতিবেশিক চিহ্ন। গ্রাম পাহাড়ের জনগণের পর্যবেক্ষণ কোকিলের সংখ্যা যেমন কমেছে, তেমনি এখন আর কোকিল বসন্তে ডাকে না। এই যে কোকিল বসন্তে ডাকে না বা এখন কোকিলের ডাক শোনা যাচ্ছে না, এই ঘটনাটির ভেতর দিয়ে প্রান্তিক জনগণ দুটি বিষয়কে স্পষ্ট করেন। একটি হচ্ছে আবহাওয়াগত পরিবর্তন এবং আরেকটি হচ্ছে প্রাণবৈচিত্র্যের বিনাশ। জনগণের ধারণা, আবহাওয়া ও প্রাণবৈচিত্র্য খুবই নিকট সম্পর্কযুক্ত। এর একটির পরিবর্তন আরেকটির শরীরে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। তাই কোকিল আবহাওয়ার পরিবর্তনগুলো আঁচ করে বুঝতে পারে, বাংলাদেশের জলবায়ুতে এখন আর কোনো ডাকার মতো বসন্তকাল বিরাজ করছে না, পাশাপাশি জলবায়ুগত পরিবর্তন কোকিলের নিজস্ব বাস্তুসংস্থানে বিরূপ প্রভাব ফেলায় প্রজাতি হিসেবে কোকিলও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবগুলো প্রাণবৈচিত্র্যের শরীর এবং জীবনে সরাসরি প্রভাব তৈরি করে, পাশাপাশি প্রাণবৈচিত্র্যের পরিবর্তনও জলবায়ুর চক্রকে প্রভাবিত করে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রজাতির ব্যাপ্তি এবং বিচরণ এলাকার ওপর বিরূপ প্রভাব তৈরি করে, ফলে অনেক প্রজাতি এই পরিবর্তিত জলবায়ুতে টিকতে বা খাপ খাওয়াতে না পেরে সুবিধাজনক অন্য কোনো প্রতিবেশের জন্য আগের এলাকা

ছেড়ে চলে যায়।[৪২]

কোনো বনের সুস্বাস্থ্যের নির্দেশক সেই বনের বিভিন্ন রকমের বানর প্রজাতি, এটি চিরসবুজ বনভূমির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সিলেট বন বিভাগের অধীন মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জ উপজেলায় বিস্তৃত পশ্চিম ভানুগাছ সংরক্ষিত বন, যা দেশে লাউয়াছড়া বন নামে বেশি পরিচিত সেখানকার লজ্জাবতী বানর (*Nycticebus bengalensis*), বানর (*Macaca mulata*), ছোটলেজি বানর (*Macaca nemestrina*), মুখপোড়া বানর (*Trachypithecus pileatus*), চশমাপরা বানর (*Trachypithecus phayrei*), উল্লুকদের (*Hylobates hoolock hoolock*) বাসস্থান এবং সংখ্যা দিনে দিনে সংকটাপন্ন হচ্ছে। পর্যটন, শিকার, সেনাপ্রশিক্ষণ, গ্যাস খনন, আগ্রাসী প্রজাতির বনায়নকে তিনি পশ্চিম ভানুগাছ বনের বানর প্রজাতির জন্য হুমকি বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সেই বনে ১৯৯৭ সালের ১৪ জুন মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্রে অক্সিডেন্টাল কোম্পানির মাধ্যমে আগুন লাগার ফলে বনভূমির পরিবেশ এবং বানরদের বাসস্থান কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৪৩] বর্ষারণ্য হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত দেশের এই বনভূমি বারবার করপোরেট মার্কিন গ্যাস কোম্পানির মাধ্যমে রক্তাক্ত হয়েছে। ১৯৯৭ সালে অক্সিডেন্টাল বনভূমি পুড়িয়েছে, ২০০৫ সালে ইউনোকল বনের ভেতর পাইপলাইন বসিয়েছে, ২০০৮ সালে শেভরন বনের ভেতর ত্রিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপের নামে[৪৪] বনের ভেতর ২০০০ বোমা বিস্ফোরণ করেছে। লাউয়াছড়ার আশপাশের বননির্ভর খাসিয়া, ত্রিপুরী, মান্দি ও দরিদ্র বাঙালিরা বলেছেন, এর ফলে বনের বাস্তুসংস্থান উল্টেপাল্টে গেছে। পাশাপাশি এটি বনের স্থানিক আবহাওয়ার ওপরও প্রভাব ফেলেছে, দেশের সর্বাধিক বৃষ্টিপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও লাউয়াছড়া বনে গত ১৯৯৭ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত এক ব্যক্তিগত হিসাবে দেখা গেছে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, বৃষ্টি হওয়ার দিনসংখ্যা, সময় ও ঋতু অনিয়মিত হয়েছে এবং অনেক সময়েই অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছে।

মহামতি খনা তাঁর একটি বচনে বলেছেন, জমিনে লাগানো ধান গাছ বেয়ে যদি শামুক ওপরের দিকে ওঠে এবং বনবিড়াল যদি উচ্চস্বরে ডাকে তবে শিগগিরই বৃষ্টি হওয়ার আভাস পাওয়া যায়। ধানগাছ বেয়ে শামুকের শীর্ষমুখী চলন বৃষ্টিপাতের আগাম সংকেত নির্দেশ করে। খনার বিবরণ অনুযায়ী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের এই ধারণাকে বর্তমানে আর কোনোভাবেই একই রকম কায়দায় পাঠ করা সম্ভব নয়। এটি কেবল শামুকের মতো একটি প্রজাতির বিলুপ্তিকেই নির্দেশ করে না, এটি একই সঙ্গে শামুকের অভ্যাস বদলের মাধ্যমে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তনকেও সূচিত করে।

ডুমুর বাংলাদেশের প্রায় জায়গাতেই জন্মানো একটি উদ্ভিদ, যার উপস্থিতি একই সঙ্গে প্রাণবৈচিত্র্যের সহাবস্থানগত সম্পর্ককে নির্দেশ করে। বট, ডুমুর, পাকুড়, অশ্বত্থ বৃক্ষ নানা জাতের লতা-ফার্ন-পরগাছা-পাখি-পতঙ্গদের আবাসভূমি। শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলার রাংটিয়া শালবননির্ভর কোচ জনগোষ্ঠীদের ভেতর ডুমুর এক পবিত্র বৃক্ষ, কোচ জনগণ ডুমুরগাছের পাতা ঝরে পড়া, বোটার পরিবর্তন, পাতার রঙের পরিবর্তন, ডুমুরের ডালে ফলের আবির্ভাব এবং ফলের রঙের পরিবর্তন দেখে ঋতুর পরিবর্তনসমূহ আঁচ করতে পারেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ডুমুর গাছে এই পরিবর্তনসমূহ আর আগের মতো একটি ধারাবাহিক নিয়ম মেনে তৈরি হচ্ছে না, পাশাপাশি ডুমুরের ডালে ফাল্গুন মাস থেকেই ফলের গুটি আসার কথা কিন্তু আসছে না দেখে কোচরা ধারণা করছেন, প্রকৃতিতে একটি পরিবর্তন তৈরি হয়েছে। ফাল্গুন মাসের তাপে ডুমুরের ডালে গুটি আসার কথা থাকলেও এই তাপের ধরন এবং সময় বদলে গেছে বলে কোচেরা জানালেন। আর এই যে ডুমুরের ডালে ফল আসার সময়ের পরিবর্তন, এটির ভেতর দিয়েই কোচেরা আবহাওয়ার পরিবর্তনের ধরনকে বুঝতে পারেন, যা প্রাতিবেশিক বাস্তুসংস্থানের সঙ্গে জনগোষ্ঠীর এক জটিল সম্পর্ককেই প্রকাশ করে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আয়তনের ম্যানগ্রোভ বনভূমি বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তের সুন্দরবননির্ভর মৌয়াল ও বাওয়ালিরা বনের ভেতর বৃক্ষ-পতঙ্গ-পাখি-প্রাণীদের আচরণ দেখে বুঝতে পারেন আবহাওয়ার পরিবর্তনগুলো। বনের কোনো প্রাণবৈচিত্র্যের কোনো ধরনের উপদ্রব না করে বননির্ভর জনগণ বনের কাছে প্রবেশ এবং বেঁচে থাকার জন্য প্রাণসম্পদ সংগ্রহের অনুমতি প্রার্থনা করেন। বনবিবি, গাজী কালু চম্পাবতী, আলীবদর, খোয়াজখিজির, দুখে, শাহ জঙ্গলী, রায়মণি, বড় খাঁ এদের কাছে প্রার্থনা করা হয়, যাতে বাদায় কোনো বিপদাপদ না ঘটে। গুনিন বাওয়ালিরা খিলান মন্ত্র, ছুকে মন্ত্র, চালান মন্ত্র দিয়ে বনের সুন্দরীগাছের গায়ে 'মাল' করেন। এটি বনের কাছে বনজ দ্রব্য সংগ্রহের অনুমতি প্রার্থনার প্রথম কৃত্য। সুন্দরবন রক্ষাকারী বনবিবি এই 'মাল' কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত করেন, মালের সীমানায় কোনো আপদবিপদ ঘটে না এবং এই সীমানার ভেতর থেকেই বনজ দ্রব্য আহরণের প্রথাগত অনুমতি দেন বনবিবি। পেশাগত মৌয়ালদের সঙ্গে সুন্দরবনের মৌমাছিদের যে সম্বন্ধ তা কখনোই সুরক্ষা হবে না উভয়ের পারস্পরিক ঐতিহাসিক সম্পর্ক ছাড়া। মৌয়ালদের মৌনির্ভর চর্চা বাদে যেমন সুন্দরবনে মৌমাছিদের স্থায়িত্বশীল বিস্তৃতি সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি মৌমাছি বাদেও মৌয়ালদের ঐতিহ্যগত বননির্ভর জীবন সম্ভব নয়। ঠিক তেমনি বাওয়ালিরা জানেন গোলের কোন পাতা কীভাবে কখন কাটতে হয়, গাছের কোন অংশ কাটতে হয়। জেলেরা যেমন জানেন কোন মাছ কখন কীভাবে ধরতে হয়, এমনি জীবনের

বিজ্ঞান দিয়েই তো বননির্ভর মানুষের সঙ্গে সুন্দরবনের ঐতিহাসিক সম্পর্ক। ১৫ নভেম্বর ২০০৭ তারিখের ঘূর্ণিঝড় সিডরের হামলা সবচেয়ে বেশি সইতে হয়েছে পূর্ব সুন্দরবনকে, পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা ও চাঁদপাই রেঞ্জের প্রায় দুই লাখ ৪৫ হাজার হেক্টর বনভূমি নিজের শরীরে সিডরের জখম নিয়ে বাঁচিয়েছে উপকূলীয় জনপদ। সুন্দরবনের প্রতিটি প্রাণ নিজেদের দিনলিপিতে সিডরের চিহ্ন রেখে দিয়েছে, যা বননির্ভর জনগণ পাঠ করতে পারেন। বননির্ভর মৌয়াল এবং বাওয়ালিরা মনে করেন, দিনে দিনে সুন্দরবন এলাকায় তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে চলেছে এবং বাড়ছে লবণপানি। তাপমাত্রার অনিয়মিত ওঠানামা বনের মৌমাছিসহ সব প্রাণের জন্যই ক্ষতিকর। মৌয়ালরা দেখেছেন, গরম বাড়লে মৌমাছিরা বাঁচে না, মধুর পরিমাণও কমে যায়। বাংলাদেশে প্রায় ৭০ প্রজাতির মৌমাছি এবং ৯০ প্রজাতির বোলতা দেখা যায়। উচ্চ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা উভয়েই উষ্ণমণ্ডলীয় মৌমাছিদের উৎপাদনকে ব্যাহত করে।[৪৫] কেবল সুন্দরবন নয়, বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকায় কমে গেছে মৌমাছিদের চাক ও সংখ্যা। এর প্রধান কারণ হিসেবে জনগণ চিহ্নিত করেছেন ফসলের জমিতে প্রশ্নহীন করপোরেট বিষ প্রয়োগের বিষয়টিকে। রৌবিকের (১৯৯৫) বিবরণ অনুযায়ী দেখা যায়, প্রায় ২৯৪ রকমের রাসায়নিক বিষ, যা শস্য ফসলে কীটনাশক হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন করপোরেট কোম্পানি বিক্রি করে তা পরাগায়ন এবং মৌমাছিদের জন্য খুবই ক্ষতিকর।[৪৬]

চট্টগ্রামের হালদা নদীতে বর্ষার পয়লা বৃষ্টির ছলকানি মা মাছেদের পানিতে ডিম ছাড়ার প্রাকৃতিক প্রতিবেশ তৈরি করে দেয়। হালদা নদীনির্ভর স্থানীয় জেলে সম্প্রদায় তাদের দীর্ঘদিনের আবহাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন, বর্তমানে হালদা নদীতে বর্ষাপাতের সময় বদলে যাচ্ছে. তাই মা মাছেরা আর ডিম ছাড়ছে না, এই ঘটনা হালদা নদী থেকে পোনা সংগ্রহকারী জেলেদের জীবনে এক দুর্দিনও তৈরি করেছে বলে জেলেরা জানান। এই যে বৃষ্টিপাতের আওয়াজ এবং ঝরঝরের সঙ্গে মা মাছের ডিম পাড়ার সম্পর্ক এবং এটি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার ঘটনা দিয়েই স্থানীয় জেলে সম্প্রদায় জলবায়ুগত পরিবর্তনকে পাঠ করেন।

নোয়াখালী এলাকার গ্রামীণ নারীরা জানালেন, বর্তমানে আবহাওয়া পরিবর্তনে একেক সময় ঠান্ডা গরম কম-বেশি হচ্ছে এবং এর ফলে হাঁস-মুরগি আর আগের মতো ডিম দেয় না এবং ডিমে তা দেওয়া মুরগির অভ্যাসেও কিছু পরিবর্তন এসেছে বলে স্থানীয় নারীরা লক্ষ করেছেন। রাজশাহী বরেন্দ্র এলাকার কৃষকেরা বলেছেন, দিনে দিনে গরম এত বাড়ছে যে এর প্রভাব গরু-মহিষের শরীর-স্বাস্থ্য এবং আচরণ দেখলেও বোঝা যায়, বরেন্দ্র এলাকায় ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকা খরার কারণে স্থানীয় গরুদের দুধের পরিমাণ অনেক কমে গেছে বলে স্থানীয়রা জানান। গরু-ছাগলের

ডাক শুনে বোঝা যায় গরম না ঠান্ডা পড়েছে। স্থানীয়রা গরু-ছাগলের ডাকের ভেতর দিয়েও আবহাওয়ার পরিবর্তনসমূহ ধরতে পারেন।

আবহাওয়া ও জলবায়ুগত পরিবর্তন যেমন প্রভাব ফেলে প্রাণবৈচিত্র্যের শরীরের প্রতিটি কণায়, প্রতিটি জিনগত বৈশিষ্ট্যে, ঠিক তেমনি প্রাণবৈচিত্র্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে দুনিয়া থেকে বৈচিত্র্যময় জেনেটিক পঞ্জিকার গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলো হারিয়ে যায়। পাশাপাশি জলবায়ুগত পরিবর্তন বা জলবায়ুর উপাদানসমূহের তারতম্যের কারণে প্রাণবৈচিত্র্যে ঘটে আমূল পরিবর্তন ও নিশ্চিহ্নকরণ। এই নিশ্চিহ্নকরণ-প্রক্রিয়া সরাসরি প্রভাবিত করে জনগণের যাপিত জীবনকে। যেমন একটা সময় সিলেটের সীমান্তবর্তী জলাভূমি বন থেকে স্থানীয় লালেং (পাত্র) আদিবাসীরা সংগ্রহ করতেন অকুং এবং নাফাং, যা দিয়ে লালেংদের বৈশিষ্ট্যময় উৎসব অকুংলারাম ও নাফাংলারাম পালিত হতো। কিন্তু বর্তমানে এসব আর পাওয়া না যাওয়ায় এই কৃত্যগুলো আর পালন করা হয় না। ঠিক যেমন চাঁপাইনবাবগঞ্জের ওরাঁওদের ভেতর সোহরাই নামের পর্ব, যা প্রায় পুরোটাই বননির্ভর শিকারকেন্দ্রিক উৎসব, সেই উৎসব বন এবং বন্য প্রাণীর নিশ্চিহ্নকরণে পাল্টে গিয়ে ভিন্ন এক পরিবর্তিত রূপ নিয়েছে। নেত্রকোনার কলমাকান্দার সীমান্তবর্তী লেঙাম আদিবাসীদের ভেতর এখন আর আগের জুম ধানের চাষ নেই, তাই সেই এলাকায় বীজ ধান সংগ্রহের 'বামতচ্যা' কৌশলটিও আর নতুন প্রজন্মের কাছে কোনো পরিচিত বিষয় নয়।

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার এলাকা সরে যাচ্ছে দক্ষিণে

শ্রীমঙ্গল বাংলাদেশের সর্বাধিক বৃষ্টিপ্রবণ এবং শীতলতম এলাকা বলে পরিচিত। আগস্ট মাসে এখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে ৩২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং জানুয়ারিতে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে, ১১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই এলাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আর সর্বনিম্ন থাকছে না। ১৯৬৭ সালে রশিদ এখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করেছিলেন ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া স্টেশন ১৯৮৮ সালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আহসান ১৯৮৯ সালে রেকর্ড করেন ৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ১৯৯৭ সালের জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে ফিরোজ রেকর্ড করেছেন ৪.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শ্রীমঙ্গলের বিগত দশ বছরের আর্দ্রতার পরিমাপ ঘেঁটে দেখা যায়, এখানে সেপ্টেম্বর মাসে সর্বোচ্চ আর্দ্রতা থাকে গড়ে ৮৬.৮% এবং মার্চ মাসে সবচেয়ে কম ৭১.২%।[৪৭] কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে শ্রীমঙ্গলে আর দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকছে না। দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার এলাকা রাজশাহী ও যশোরে বেশ কয়েক বছর দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করেছে।

বিগত ৫৪ বছরের ভেতর দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করেছে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে। কিন্তু দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার এলাকা ক্রমেই দেশের দক্ষিণে সরে আসছে। এক-দেড় দশক ধরে ঈশ্বরদীতে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দেখা যাচ্ছে। ১৯৯০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত শ্রীমঙ্গলে চারবার এবং ঈশ্বরদীতে পাঁচবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করেছে। ১৯৯০ থেকে ২০০৩-এর ভেতর দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল রাজশাহীতে, ২০০৩ সালের ২৩ জানুয়ারি রাজশাহীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩.৪ ডিগ্রি সে.।[৪৮]

২০০২ সালের ২৭ মে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সাতক্ষীরাতে (৩২.৬ ডিগ্রি সে.)। আর ওই দিন সাতক্ষীরা থেকে মাত্র ৭০ কি.মি. দূরে যশোরে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (২০ ডিগ্রি) রেকর্ড করা হয়। আবার ঠিক পরের দিনই ২৮ মে ২০০২ তারিখে যশোরে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (৩৩.২ ডিগ্রি) রেকর্ড করা হয়। কয়েক বছর ধরে যশোর ও রাজশাহীর চারপাশে মাত্র ৫০-৬০ কিলোমিটারের মধ্যে একই দিনে দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করেছে এবং এসব অঞ্চলে তাপমাত্রার দৈনিক ব্যবধান হচ্ছে ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি। ২০০৩ সালের ৭ এপ্রিল রাজশাহীতে একসঙ্গে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (৩৭.২ ডিগ্রি) এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (২০.২ ডিগ্রি) রেকর্ড করা হয়। গ্রীষ্মকালে একই স্থানে একই দিনে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড বাংলাদেশে বিরল। এই দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ব্যবধান ১৭ ডিগ্রি সে., যা সাধারণত মরু অঞ্চলেই দেখা যায়।

কমছে বৃষ্টি! বাড়ছে লবণ!!

পাঁচ রবি মাসে পায়
ঝরায় কিবা খরায় যায়।

(খনার এই বচনটি বলছে যদি কোনো মাসে পাঁচটি রোববার হয় তবে সেই মাসে ফসল ঝরে নষ্ট হবে এবং অনাবৃষ্টি হয়ে খরা হবে।)

চাঁদের সভার মধ্যে তারা
বর্ষে পানি মুষলধারা।

(খনার বচন অনুযায়ী চন্দ্রসভার সময়ে যদি আকাশে তারা দেখা যায় তবে বর্ষা মুষলধারে হয়। ১৩৮৫ বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাসের এক সন্ধ্যায় ক্ষুদ্রাকৃতির এক চন্দ্রসভায় তারা দেখা যাওয়ার পর দিন থেকে পুরো জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হয়েছিল।[৪৯])

১৯৬১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তাপমাত্রা ০.০০৭২ ডিগ্রি সে. বৃদ্ধি পেলেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৪.৬৯০৯ মিলিমিটার। অর্থাৎ এক দশকে বাংলাদেশে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ হলেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সমানুপাতে হয়নি।[৫০] পাশাপাশি ১৯৯৮ সালে গরমকালে বৃষ্টি ও হঠাৎ বন্যা, ১৯৯৮-১৯৯৯

সালে শীতে ঘন কুয়াশা এবং ফসলের ক্ষতি, ১৯৯৬ সালে শীতকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে প্রচুর শিলাঝড়, নীলফামারীতে শীতকালে তুষার পড়েছিল আঁশ আঁশ আকারে।[৫১] জলবায়ুর পরিবর্তনে বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় অতীতের চেয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের পানজুমনির্ভর খাসিয়াদের পান উৎপাদন কমছে, কমছে মাটির উর্বরতা শক্তি, বাড়ছে রোগ-বালাই এবং বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ নানা শোষণ ও হয়রানির কারণে তাদের জীবন-জীবিকা, পরিবেশ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, প্রথা আজ হুমকিযুক্ত। এ প্রসঙ্গে ফেই খংলা বলেন, জুন-জুলাই মাসে পান জুমে পানের চারা রোপণ করে থাকি আমরা। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে বৃষ্টির পরিমাণ এত কম যে আমরা প্রয়োজন ও চাহিদামাফিক নতুন চারা রোপণ করতে পারি না। উপরন্তু নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ এত কম যে জুন-জুলাই মাসে রোপণকৃত ওই পানের চারাগুলো খরায় মরে যায়। ফলে প্রতিবছর আমরা আর্থিক ক্ষতির শিকার হই। পানজুমে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করি সেই পরিমাণ উৎপাদন হয় না। তিনি বলেন, ইদানীং শীতকালে কুয়াশার পরিমাণ অনেক বেশি। কুয়াশায় পানের পাতাগুলো সহ্য করতে না পেরে এগুলো অকালে মাটিতে ঝরে যায়। তিনি বলেন, শীতকালে বৃষ্টি না হওয়ায় এমনিতেই পানগাছ নতুন পাতা দিতে পারে না, আবার কুয়াশায় এভাবে পাতাগুলো রাঙা (পেকে) হয়ে ঝরে যায় বলে আমরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। তিনি আরও বলেন, এ বছর শিলাবৃষ্টি হওয়ার ফলে এ এলাকার প্রায় ৬০ ভাগ পানজুম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একই অভিজ্ঞতার কথা জানান ভারত লামিন। তিনি বলেন, চার-পাঁচ বছর থেকেই শীতকালে খুব শীত আর গ্রীষ্মকালে খুব গরম পড়ে। এতে করে আমাদের মতো প্রকৃতিনির্ভর চাষিরা দুদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্তের শিকার হই। একদিকে বৃষ্টির পরিমাণ কম হওয়ায় জুমে পান উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, অন্যদিকে নিত্যনতুন রোগ-বালাই দেখা দিচ্ছে।[৫২] বৃষ্টি কমে যাওয়ায় উত্তরবঙ্গের কৃষকেরা দীর্ঘ সময় খরার ভেতর পড়েন এবং এই খরা দিন দিন বেড়েই চলেছে। উত্তরবঙ্গের কৃষকেরা উজানে ফারাক্কা বাঁধ, প্রশ্নহীন বরেন্দ্র বহুমুখী সেচ উন্নয়ন প্রকল্পকে স্থানীয় এলাকার বর্তমান খরা সমস্যার কারণ হিসেবে বলেন অনেকেই।

বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ার পাশাপাশি দক্ষিণ অঞ্চলের মাটি ও পানিতে বাড়ছে লবণ। এই লবণাক্ততার মাত্রা দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে এবং লবণাক্ততার এলাকা ক্রমেই বিস্তৃত হয়ে পড়ছে খুলনা-সাতক্ষীরা-বাগেরহাট-পিরোজপুর-বরগুনা-পটুয়াখালী-ঝালকাঠি ছাড়িয়ে যশোর-নড়াইল-গোপালগঞ্জ এলাকা পর্যন্ত। কৃষিক্ষেত্রে লবণাক্ততার সহনশীলতার মাত্রা ১-১.৫ পিপিটি (পিডিও-আইসিজেডএমপি, ২০০৪) কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে লবণাক্ততার গড় মাত্রা ৩-৬ পিপিটি। বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ২০০০ সালে প্রকাশিত

জরিপ অনুযায়ী, দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের নদীগুলো শতকরা ৫৬ ভাগের বেশি লবণাক্ততায় আক্রান্ত।[৫৩] লবণাক্ততা যে দক্ষিণাঞ্চলের জনজীবনেই প্রভাব তৈরি করেছে তা নয়, এটি ক্রমেই সুন্দরবনকেও বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সুন্দরবনের ভেতর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশে উদ্ভিদ প্রজাতির ভিন্নতা দেখা যায়। তিনটি প্রধান প্রতিবেশ এলাকার ভেতর ওলিগোহ্যালাইন, মেসোহ্যালাইন ও পলিহ্যালাইন এলাকার ভেতর ওরিগোহ্যালাইন এলাকাতেই উদ্ভিদপ্রজাতির সংখ্যা বেশি। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে লবণাক্ততার মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন থাকে। বর্ষা মৌসুমে গড়াই নদীর মাধ্যমে সুন্দরবনে বেশি পরিমাণে উজানের মিঠা পানি প্রবেশ করে, ফলে শীত ঋতুর চেয়ে বর্ষা মৌসুমে লবণাক্ততা কম থাকে।[৫৪] কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, সুন্দরবন এলাকাতেও লবণ পানি বেড়ে যাচ্ছে এবং লবণের মাত্রা বাড়ার ঋতু ও সময়ে পরিবর্তন ঘটেছে। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ উত্তরে উজানে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ, বাণিজ্যিক চিংড়িঘের এবং লবণসহিষ্ণু দেশি জাতের ধানের আবাদ বাদ দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে উফশী ও হাইব্রিডের প্রচলনকে লবণের মাত্রা বাড়ার পেছনের কারণ মনে করেন। পাশাপাশি তাঁরা আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে এই লবণ পানির সম্পর্ককেও আঁচ করতে পারেন, লবণ বাড়লে আবহাওয়া বদলায়। আবার আবহাওয়া বদলালে লবণ বাড়ে। বৃষ্টি না হলে লবণের মাত্রা বেশি থাকে, হলে কম।

‘করপোরেট অভিযোজন বাণিজ্য’ ও পুরুষালি উন্নয়ন বলপ্রয়োগ

পূর্বের আফাল বায় বান
দক্ষিণে আফাল খায় ধান।

(হাওর ভাটি এলাকায় আফাল মানে বড় ধরনের ঝড়সহ পানির ঢেউ, খনার এই বচনে বোঝা যায় দক্ষিণ থেকে আসা আফাল ধানের জমিন তলিয়ে দেয়।)

মৌলভীবাজারের হাইল হাওর এলাকার জনগণ দেখিয়েছেন, স্থানীয় এলাকায় দিনে দিনে দুর্যোগের ধরন ও সময় পাল্টে গেছে। হাইল হাওরে ২০০০-২০০৩ সাল পর্যন্ত পাহাড়ি ঢল ও বন্যায় ফসল তলিয়ে যায়, ২০০৪ সালে অকালবন্যায় ফসল নষ্ট হয়, ২০০৫-২০০৬ সালে ফসল নষ্ট হয় শিলাবৃষ্টিতে। ১৯৩৪ সালে হবিগঞ্জ জেলার নাগুরা এলাকায় স্থাপিত হয়েছিল উপমহাদেশের প্রথম গভীর পানির ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা বর্তমানে ব্রির আঞ্চলিক কার্যালয় হিসেবে কাজ করছে। এই প্রতিষ্ঠান তৈরির প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল হাওর এলাকার জন্য বন্যা ও গভীর পানি সহনশীল ধান জাত উদ্ভাবন, কিন্তু আজ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান তা করতে পারেনি। কিন্তু হাওর এলাকা থেকে সংগ্রহ করেছে নানা প্রজাতির গভীর পানি সহনশীল দেশি ধানের জাত, যার একটিও আজ হাওর এলাকায় তেমনভাবে চাষ করা হয় না। ঠিক একইভাবে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ইরি)

সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ পেট্টা এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) যৌথভাবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জন্য লবণাক্ত সহনশীল ধানজাত বাছাইয়ের জন্য এক বিরাট প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের লবণসহিষ্ণু দেশি ধানজাতগুলো সংগ্রহ করে। এই দুটি প্রকল্পই কৃষকের হাতে দেশি জাতের বন্যাসহিষ্ণু ও লবণসহিষ্ণু ধানজাত তুলে দিতে পারেনি। হাওর ও দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার অনেকেই ধারণা করেন, এই প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে বন্যা ও লবণসহিষ্ণু দেশি ধানের জাতসমূহ এবং এদের জেনেটিক বৈশিষ্ট্য ও তথ্য করপোরেট কোম্পানির বাণিজ্যিক গবেষণায় চলে যেতে পারে। এবং পেটেন্ট হয়ে যেতে পারে। কারণ জলবায়ুজনিত পরিবর্তনকে ব্যবহার করে এসব কোম্পানি সমানে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তারা যেকোনো ধরনের পরিবেশগত চাপসহিষ্ণু এবং জলবায়ুসহনশীল বীজ বানাতে সক্ষম। তাদের কাছে লবণ কি খরা বা বন্যা বা তাপ কি ঠান্ডা বা কুয়াশা—সব সহিষ্ণু শস্য ফসলের বীজ আছে।

দুনিয়ার ধনী দেশের ভোগ-বিলাসিতার কারণে পরিবর্তিত জলবায়ুগত বিপন্ন সময়ের সবচেয়ে বড় ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে দক্ষিণের গরিব দেশগুলোকে, যারা সবচেয়ে কম গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ঘটান নিজেদের জীবন-জীবিকার ভেতর দিয়ে। দক্ষিণের গরিব দেশসমূহ ইতিমধ্যেই উত্তরের ধনী দেশগুলোর মহাবড় কার্বন-পদচ্ছাপে পদদলিত মথিত হয়ে নিজেদের সাংঘাতিক রকমের টিকে থাকার উৎসাহ ও অনুশীলন নিয়ে বেঁচেবর্তে আছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের এই বিষয়টিকে কাজে লাগিয়ে করপোরেট কোম্পানিরা তৈরি করছে ভিন্ন ভিন্ন বাণিজ্য কৌশল। তারা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিপন্ন দক্ষিণের গরিব দেশের কৃষকদের অভিযোজনের জন্য তৈরি করে দিচ্ছে নানান অভিযোজনের কৌশল (যেমন যেকোনো জলবায়ুগত পরিবর্তনেই টিকে থাকে এমন বীজ)। তারা সরকারকে বাধ্য করাচ্ছে করপোরেট কোম্পানির এই নয়া-অভিযোজনিক বাণিজ্য মেনে নিতে। সরকার যাতে দেশের জলবায়ু-উদ্বাস্তু এবং বিপর্যস্ত কৃষকদের অভিযোজনের জন্য এসব করপোরেট পরামর্শ গ্রহণ করে কৃষকদের কোম্পানির বীজ কিনতে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। জলবায়ুগত পরিবর্তনের এই সময়ে 'জলবায়ু পরিবর্তন' ইস্যুটিকে কব্জা করে গড়ে উঠছে বিভিন্ন করপোরেট কোম্পানির একক বাণিজ্য। দুনিয়ার ১০টি শীর্ষ বীজ কোম্পানি, যারা দুনিয়ার বীজের বাজারের ৫৭ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে, তারাই এই 'জলবায়ু পরিবর্তন' ইস্যুটিকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করতে তৎপর হয়েছে। যেকোনো ধরনের পরিবেশগত বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত তাদের জলবায়ু সংবেদনশীলতার জন্য প্রস্তুত জিন (ক্লাইমেট রেডি জিন) এবং বীজ দিয়ে বাণিজ্য করার পাঁয়তারা করছে এসব দুনিয়াকাঁপানো করপোরেট কোম্পানি। জার্মানির বিএএসএফ, আমেরিকার মনসান্টো, জার্মানির বায়ার ক্রপ সায়েন্স,

সুইজারল্যান্ডের সিনজেন্টা, আমেরিকার ডুপন্ট কোম্পানি ইতিমধ্যেই খরা-তাপ-ঠান্ডা-বন্যা-লবণাক্ততা প্রতিরোধী তথাকথিত 'জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতকৃত জিনের' পেটেন্ট করার জন্য ৫৩২টি পেটেন্ট দলিল জমা দিয়েছে। এর ভেতর খরা, লবণাক্ততা, পরিবেশগত চাপ, ঠান্ডা এবং তাপ প্রতিরোধী জিন পেটেন্ট করার জন্য জার্মানির বিএএসএফ কোম্পানি বিশ্ব বুদ্ধিস্বত্ব সংস্থার (ডব্লিউআইপিও) কাছে ২১টি পেটেন্ট অনুমোদন জমা দিয়েছে। সিনজেন্টা সাতটি, মনসান্টো ছয়টি, বায়ার ক্রপ সায়েন্স পাঁচটি পেটেন্ট অনুমোদন জমা দিয়েছে। এসব কোম্পানির ভেতর বায়ার ক্রপ সায়েন্স ২০০৬ সালে ৪৬,৯০০ কোটি টাকার কৃষি রাসায়নিক বিষের বাণিজ্য

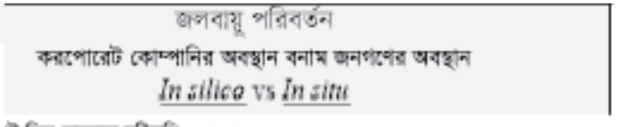

টি জিন-দস্যুদের দৃষ্টিভঙ্গি

করেছে, সিনজেন্টা করেছে ৬,৪০০ মিলিয়ন ডলারের আর মনসান্টো ৩,৩০০ মিলিয়ন ডলারের। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক বীজ কোম্পানি মনসান্টো ২০০৬ সালে ডেল্টা অ্যান্ড পাইন ল্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে ৪,৪৪৬ মিলিয়ন ডলারের কৃষিবিষের বাণিজ্য করেছে। আমেরিকার ডুপন্ট কোম্পানি ঘোষণা দিয়েছিল, ২০১২ সালের ভেতর তারা জিন প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত বিকৃত ভুট্টার বীজ বাজারে নিয়ে আসবে, যা খরাপ্রতিরোধী। International Devlopment Research Centre of Canada, The New Partnership for Africa's Devlopment (NEPAD), Bill & Melinda Gates foundation, Buffett foundation, African Agricultural technology foundation, Asian Devlopment Bank (ADB), Japanese government, japanese International Research Centre for Agricultural Sciences এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা ও বহুপক্ষীয় ব্যাংকসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সহনশীল কৃষি ফসলের জাত উদ্ভাবনের জন্য National agricultural research programs of Kenya-Uganda-Tanzania-South Africa, CIMMYT, IRRI, Africa rice center এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। মাইক্রোসফটের মালিক দুনিয়ার শীর্ষ ধনী Bill & Melinda Gates foundation National agricultural research programs of Kenya-Uganda-Tanzania-South Africa, CIMMYT কে খরা প্রতিরোধী ভুট্টা তৈরির জন্য ৩২৯ কোটি টাকা (৪৭ মিলিয়ন ডলার) দিয়েছে, এই ভুট্টায় আমেরিকার মনসান্টো এবং জার্মানির বিএএসএফ কোম্পানির স্বত্বমুক্ত বাণিজ্য অংশীদার আছে। পারিবেশিক চাপ সহনশীল ধান তৈরির জন্য Bill & Melinda Gates foundation ১৩৩ কোটি টাকা (১৯.৮ মিলিয়ন ডলার) সাহায্য দিয়েছে IRRI এবং Africa rice center কে।[৫৫]

জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা সামাল দিতে যখন গরিব দেশগুলোর জনগণ হন্যে হয়ে তার প্রতিবেশ এবং প্রাণপ্রক্রিয়ার দিকে হাতড়ে মরছে, তখন এই জলবায়ু পরিবর্তন ঘটনাটিকে কাজে লাগিয়ে করপোরেট কোম্পানিরা নানা মুনাফার বাজার তৈরি করেছে। এর নাম দিচ্ছে কৃষিতে জনগণের অভিযোজন ও প্রশমন। পাশাপাশি গরম বা বৃষ্টি বা ঠান্ডাকে কাজে লাগিয়ে আরও প্রসারিত হয়েছে করপোরেট বাজার। এই বাজার দক্ষিণের গরিব দেশ হিসেবে বাংলাদেশের শহরের মধ্যবিত্ত বাঙালিদের কাছেও চলে এসেছে। বৈদ্যুতিক পাখা, ফ্রিজ, এসি, জেনারেটর, আইপিএসের বাজার তৈরি হয়েছে বাংলাদেশেও। জলবায়ু পরিবর্তিত এই সময়ে হেইজ অ্যান্ড হেয়ার, স্যামসাং, র‍্যাংগ্স, সিঙ্গার, গ্রি, ওয়ালটন, হুন্দাই কোম্পানিরা তাদের পণ্য উৎপাদন বাড়িয়ে দিয়েছে। করপোরেট কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত এই তথাকথিত মুক্তবাজারব্যবস্থা এসব করপোরেট বাণিজ্যের ভেতর দিয়ে বোঝাতে চাইছে, পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তিত হবেই আর কৃষককে এবং শহরের মানুষকে

একেকভাবে এর সঙ্গে একেক রকম করে খাপ খাইয়ে নিয়ে অভিযোজিত হতে হবে। এটিই হলো সাম্প্রতিক করপোরেট অভিযোজন-প্রক্রিয়া। জলবায়ু পরিবর্তিত পৃথিবীতে কৃষকের জন্যও যেখানে করপোরেট বাজারের জলবায়ু সহনশীল বীজ ও কৃষিসামগ্রী থাকছে এবং পাশাপাশি শহরের মানুষের ভোগ-বিলাসিতার সামগ্রীগুলোও থাকছে। মানে এই জলবায়ু পরিবর্তিত অবস্থায় খাপ খাইয়ে নিতে হবে করপোরেট বাজারের পণ্য, পদ্ধতি এবং মর্জি অনুযায়ী। জলবায়ু বিপর্যস্ত জনজীবনের প্রতি নয়া-উদারবাদী দুনিয়ার এসব অভিযোজন বাণিজ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি শ্রেণিসমাজ কাঠামোর ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্গে আগাপাছতলা জড়িত। জনগণের প্রান্তিক লোকায়ত জলবায়ুবিজ্ঞানকে দাবিয়ে রেখে এ ধরনের করপোরেট উন্নয়নবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষতান্ত্রিক বলপ্রয়োগেরই আরেক মারদাঙ্গা রূপ। চলতি আলাপ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সব ধরনের পুরুষতান্ত্রিক উন্নয়ন বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে জনগণের লোকায়ত জলবায়ু-ইশতেহারের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে।

লোকায়ত জলবায়ুবিজ্ঞানের প্রান্তিকতা ও জলবায়ু ন্যায়বিচার

দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা
পূর্ব দুয়ারী তার প্রজা।
পশ্চিম দুয়ারীর মুখে ছাই
উত্তর দুয়ারীর খাজনা নাই।

(খনার বচন। খনার এই বচনটি আমাদের জানান দেয় প্রান্তিক জনগণ তার গৃহনির্মাণ থেকে শুরু করে জীবনযাপনের সব ক্ষেত্রেই স্থানীয় প্রতিবেশ এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেন। যেমন গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগণ স্থানিক প্রকৃতিকে বিবেচনা করেন, পাশাপাশি শহরের ভোগ-বিলাসী জীবন জলবায়ু পরিবর্তিত অবস্থায় আরামের জন্য করপোরেট কোম্পানিরা কোনো পণ্য যেমন বৈদ্যুতিক পাখা বা তাপানুকূল বা এসিকে গৃহনির্মাণের একটি অংশ হিসেবে মনে করেন।)

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনগণের ক্ষেত্রে 'অভিযোজন', 'প্রশমন', 'খাপ খাওয়ানো', 'আত্তীকরণ'—এ রকম নানান উন্নয়ন সম্পর্কের কথা আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এসব উদ্যোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনগণের নিজস্ব কায়দা ও চিন্তাভাবনা অনুযায়ী হচ্ছে না বা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেশের জনজীবনের নিয়ত পরিবর্তনশীল জলবায়ুবিজ্ঞানকে উন্নয়নবাদী ক্ষমতাকাঠামোতে আরও বেশি প্রান্তিক করে তোলা হচ্ছে। উন্নয়নবিদ বা নীতিনির্ধারকেরা অধিকাংশ সময়ই জনগণের স্বর ও আহাজারিকে বোঝার জন্য সময় ও পরিস্থিতি তৈরি করছেন না। তাই দেখা যাচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নানা প্রশমন উদ্যোগ যেমন নবায়নযোগ্য কোনো শক্তি প্রকল্প[৫৬] বা বনায়ন কর্মসূচি যখন নেওয়া হয় তখন দেখা যাচ্ছে সেসব উদ্যোগের ফলে আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের বাস্তু ও প্রতিবেশের অধিকার হারায়। বিমান যানের কারণে মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নির্গমন প্রশমনে ডাচ

কোম্পানি ২০০২ সালে উগান্ডাতে একটি বনায়ন কর্মসূচি শুরু করে। উগান্ডার ফরেস্ট্রি স্টেওয়ার্ডশিপ কাউন্সিল (এফএসসি) ১৯৯৯-২০০২ পর্যন্ত সাত হাজার হেক্টর এলাকায় এই বনায়ন কর্মসূচি অনুমোদন করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে দি উগান্ডান ওয়াইল্ডলাইফ অথরিটি (ইউডব্লিউএ) এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার জন্য নানাভাবে বল প্রয়োগ করে, প্রায় ৫০ জন আদিবাসী ২০০৪ সালে মারা যায়। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াতে বায়ুফুয়েল তৈরির জন্য আগ্রাসী পামবাগানের জন্য নানাভাবে উচ্ছেদ হচ্ছেন।[৫৭]

পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় এলাকায় খরা ও বন্যা প্রতিরোধে নিম, শিরীষ, অশ্বত্থ, বট, ভারতীয় রাবার, কদম, বকুল, সোনাঝুরিগাছ লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বিশেষজ্ঞদের তরফ থেকে।[৫৮] এ ক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলাদেশের বিবেচনায় রাখা জরুরি কী ধরনের গাছ কোথায় কোন অঞ্চলে লাগানো হবে, তার পরামর্শ যখন জনগণ না দিয়ে বিশ্বব্যাংক কিংবা এডিবি দেয় তখন তা কীভাবে প্রাকৃতিক বনকে রাবার বা আগ্রাসী ম্যাঞ্জিয়াম-ইউক্যালিপটাস-একাশিয়ার বাণিজ্যিক বাগানে পরিণত করে। জলবায়ু পরিবর্তনকেন্দ্রিক প্রশমনের জন্য বন সংরক্ষণ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগসমূহ বরাবরই বননির্ভর জনগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের বাদ দিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে। যেমন: ইকো পার্ক, সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা, গেম রিজার্ভ, অভয়ারণ্য, অভয়াশ্রম, জাতীয় উদ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে যত না বেশি জনগণসহ প্রাণবৈচিত্র্য বা প্রতিবেশের উপকার হয় তার চেয়ে বেশি তা পর্যটন কোম্পানির বাণিজ্য স্বার্থকেই চাঙা করে।

আদিবাসীরা মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নির্গমনের জন্য কোনোভাবেই দায়ী নন। গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়াতেও আদিবাসীদের কোনো ধরনের সর্বনাশা ভূমিকা নেই। দুনিয়ার ৩৭০ মিলিয়ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী স্থায়িত্বশীল কার্বননিরপেক্ষ এবং অনেক জনগোষ্ঠী একেবারেই খুব কম কার্বন পুড়িয়ে জীবনযাপন করেন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য গৃহীত প্রশমন উদ্যোগসমূহ বিশেষ করে কার্বন ফার্টিলাইজেশন, নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের সময় আদিবাসীদের অবাধ, স্বাধীন, পূর্ব অনুমতি ও সম্মতি থাকে না বা নেওয়া হয় না।[৫৯]

পৃথিবীব্যাপী এখন পর্যন্ত তালিকাভুক্ত প্রায় দুই লাখ ৫০ হাজার সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রায় ৩০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ মানুষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। এই ৩০০০ প্রজাতির ভেতর মাত্র ২০০টি প্রজাতি মানুষ চাষ করে, যার ভেতর মাত্র ১৫-২০টি প্রজাতি অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।[৬০] পুস্তকি গবেষকেরা বলে থাকেন, একটা সময় সারা দুনিয়ার মানুষ প্রায় আশি হাজার উদ্ভিদ প্রজাতি থেকে নিজেদের বৈচিত্র্যময় খাবার জোগাড় করত। চলতি দুনিয়ায় মানুষের খাদ্যসামগ্রীর প্রায় পঁচাত্তর শতাংশেরই সরবরাহ আসছে হাতে গোনা মাত্র আটটি বাণিজ্যিকভাবে

ব্যবহৃত উদ্ভিদ প্রজাতি থেকে। ১৯০০ সালের পর থেকে দুনিয়ায় নানা শস্য ফসলের বৈচিত্র্যময় জাতসমূহকে নানা কায়দায় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, এ পর্যন্ত শস্য ফসলের নানা জাতের ৭৫ শতাংশই বিলুপ্ত হয়েছে। সারা দুনিয়ায় কৃষিপ্রাণসম্পদের এই নিশ্চিহ্নকরণ ঘটেছে ১৯৬০-এর দশকে প্রবর্তিত তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে। কৃষকদের ঐতিহাসিক যে কৃষি আবহাওয়ামণ্ডলে সবচেয়ে কম কার্বন ছাড়ত, সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে চালু হওয়া রাসায়নিক কৃষি আবহাওয়াচক্রে কার্বন ছাড়ছে অনেক গুণ বেশি। যেখানে কৃষকদের ন্যূনতম কোনো ভূমিকা নেই। বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগণ এখনো পর্যন্ত তার নিজের সারা জীবনে সবচেয়ে কম কার্বন ব্যবহার করে, অনেকে কার্বননিরপেক্ষ জীবন যাপন করে, অনেকে হিসাব করার চেয়েও কম গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন ঘটায়। বাংলাদেশের জনগণ এখনো কম কার্বনভিত্তিক খাদ্যতালিকা গ্রহণ করে, কম কার্বন কৃষি-জুম অর্থনৈতিক জীবন যাপন করে এবং বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগণ এখনো পর্যন্ত দুনিয়ার সাম্প্রতিক উষ্ণ হয়ে ওঠা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী নয়, কারণ এই দেশের জনগণ কোনো সর্বনাশা 'কার্বন-পদচ্ছাপ'[৬১] এখনো রাখেনি এই মাতৃ-দুনিয়ার বুকে। অথচ এ দেশের প্রান্তিক মানুষ এটি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেন না যে পরিবর্তনের জন্য নিজেরা আমরা দায়ী নই, আমাদেরই কেন সেই পরিবর্তন মোকাবিলায় জান-প্রাণ-সম্পদ দিয়ে দিতে হবে?

পরিবেশগত পরিবর্তনে সাড়া দেওয়া এবং পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ে এই জনপদের জনগণ জান দিয়েছেন, রক্ত ঝরিয়েছেন। নেত্রকোনার সুসংদুর্গাপুরে হাজং জনগণ সুসং রাজার হাতি বাণিজ্যের বিরুদ্ধে হাতীখেদা আন্দোলন করে জান দিয়েছে, মধুপুর শালবন বাঁচাতে মান্দি যুবক পীরেন স্লান শহীদ হয়েছেন, উৎপল নকরেক তাঁর শরীর দিয়ে বাঁচিয়েছেন বন, মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার ফুলতলা চা-বাগানের অবিনাশ মুড়া বুকের রক্ত ঢেলে পাহাড় জনপদ রক্ষা করেছেন, সুনামগঞ্জের হাওর এলাকায় ভাসান পানির আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ হাওর জলাভূমির প্রাতিবেশিক সার্বভৌমত্ব দাবি করে রাষ্ট্রের জুলুম সয়েছে, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের বালিশিরা পাহাড় বাঁচানোর জন্য স্থানীয় বাঙালি জনগণ আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং পাহাড় বাঁচাতে শহীদ হয়েছেন সালিক মিয়া ও ধনু মিয়া। পরিবেশ আন্দোলনের ক্ষেত্রে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত 'র‍্যাডিক্যাল' প্রতিক্রিয়াকে অনেকে[৬২] গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, আবার অনেকে[৬৩] গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। কিন্তু তার পরও এ দেশের জনগণ প্রতিবেশ প্রক্রিয়ায় তার অবস্থান ও সাড়াকে নানা প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন।

জলবায়ু পরিবর্তনকে ঘিরেই এই জনপদের কৃষি কি জুম কি জীবন 'অভিযোজিত (এই শব্দটি নিয়ে বিদ্যায়তনিক কাঠামোতে বাহাস থাকতে পারে, আমরা আপাত

নিরপেক্ষতা বজায় রেখে শব্দটি ব্যবহার করেছি) হয়েছে। জনগণ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনের সঙ্গে নিজস্ব ঐতিহাসিক কায়দায় চলমান অভিযোজনের ইতিহাস শামিল রাখতে আগ্রহী। আর এটাই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই জনপদের প্রান্তিক মানুষের অবস্থান। এই অবস্থান 'কম কার্বন অর্থনীতির'[৬৪] পক্ষে, 'কম কার্বনভিত্তিক খাদ্যতালিকা'[৬৫] এবং জীবনধারণের পক্ষে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য নানা প্রশমন ও অভিযোজন উদ্যোগের জন্য নেওয়া হচ্ছে নানা প্রকল্প এবং খরচ করা হচ্ছে কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে যেকোনো ধরনের খাপ খাওয়ানোর সূত্রসমূহ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং প্রাণবৈচিত্র্যর ভেতরেই রয়েছে। প্রান্তিক জনগণের লোকায়ত বিজ্ঞান এবং জীবন অনুশীলন সেসব সূত্র পাঠ করতে জানে, তাই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত যেকোনো ধরনের উদ্যোগের ক্ষেত্রে একমাত্র জরুরি কাজ হবে জনগণের লোকায়ত ধারণা এবং চর্চার দিকে কেন্দ্রীয় মনোযোগ নিয়ে তাকানো এবং জনগণের ভাবনা এবং চিন্তার ভেতর দিয়েই এই সর্বনাশা কার্বন-পদচ্ছাপ পাড়ি দেওয়া সম্ভব। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপন্ন দুনিয়ায়, যখন ধারণা করা হচ্ছে উষ্ণতার কারণে গলে যাবে বরফ আর বরফগলা পানিতে ডুবে যাবে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক অঞ্চল তখন বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগণের একটাই দাবি, ধনী দুনিয়ার মানুষের 'স্বভাব' বদলানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বাংলাদেশের জনগণ চায় জলবায়ু পরিবর্তন অবশ্যই একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই ঘটতে থাকুক, যেখানে পরিবর্তনের তারতম্যগুলো জনগণের জীবনযাপন দিয়ে পাঠ করা সম্ভব হয় এবং পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের ঐতিহাসিক অভিযোজনের চলমানতা বিরাজিত রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু যেকোনো ধরনের সর্বনাশা কার্বন-পদচ্ছাপের বিরুদ্ধেই বাংলাদেশের জনগণের অবস্থান। আর এই সর্বনাশা কার্বন-পদচ্ছাপ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেই জনগণের লোকায়ত প্রতিরোধ প্রস্তুত, কারণ বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগণ ঐতিহাসিকভাবেই কার্বন-নিরপেক্ষ জীবন যাপন করে।

জলবায়ু বিপর্যয় মোকাবিলা ও দায়

জলবায়ু বিপর্যয়ের বৈশ্বিক দায় আমরা কীভাবে সামাল দেব? যে দেশের গ্রামীণ জনগণের কোনো ভূমিকা নেই এ বিপর্যয়ে। অথচ বাংলাদেশকে এ বিপর্যয়ের অনিবার্য আঘাত সইতে হচ্ছে। বৈশ্বিক জলবায়ু দেনদরবারে জীবনের ঐতিহাসিক বহমানতা অস্বীকার করে জলবায়ু-বিপর্যস্ত মানুষের রক্তাক্ত আখ্যানকে মুদ্রানির্ভর অর্থনীতির মনস্তত্ত্ব দিয়ে দরদাম করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে 'জলবায়ু-দরকষাকষি'। 'অভিযোজনের' নামে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটার পর একটা ক্ষমতার চোখরাঙানি। কিন্তু আমাদেরও এ বৈশ্বিক দায় থেকে মুক্তির জন্য জলবায়ু-সংগ্রামে প্রস্তুতির কারিগরি ও রাজনৈতিক দর্শনকে স্পষ্ট করে তোলা জরুরি। আন্তর্জাতিক

জলবায়ু সম্মেলনগুলোতে কেবল বৈশ্বিক জলবায়ু-দেনদরবার নয়, আমাদের কিছু প্রাথমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ নিজস্ব কাজ ও দায়িত্বও আছে। যেমন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের নানা প্রান্তের সব জনগণের ঐতিহাসিক ধারণা, লোকায়ত প্রক্রিয়াকে স্বীকৃতি দিয়ে বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধারাবাহিক 'জাতীয় জলবায়ু জনদলিল' প্রকাশ করা জরুরি। পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতির ভেতর বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগণের টিকে থাকার লড়াই ও কার্যকৌশলসমূহ সম্মতি ও অনুমোদনক্রমে নথিভুক্ত করা দরকার। বাংলাদেশের স্থানীয় প্রজাতি, স্থানীয় প্রাণসম্পদ ও বৈচিত্র্য এবং জনগণের লোকায়ত কৃষি-জুম ও উৎপাদন সম্পর্ককে সার্বিকভাবে বিবেচনা করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশের নিজস্ব মোকাবিলা উদ্যোগ তৈরি করা। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার নামে, করপোরেট অভিযোজন বাণিজ্য, পরিবেশ-স্বাস্থ্য-জীবিকা-স্থানীয় অর্থনীতি এবং সার্বিক জীবনব্যবস্থাকে ন্যূনতম প্রভাবিত ও বিপন্ন করে এমন কোনো ধরনের বাণিজ্য-প্রকল্প-স্বার্থ-উদ্যোগকে রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও বাতিল করা জরুরি। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জনগণের গণ-উদ্যোগসমূহকে জোরদার ও ইতিবাচকভাবে গণমাধ্যমসমূহে প্রচার ও প্রকাশ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি জনগণবান্ধব রাষ্ট্রীয় সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ধারাকে প্রভাবিত করে, জলবায়ু পরিবর্তনকে উসকে দেয় বা জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে, এমন সব রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ প্রকল্প-বাণিজ্য-ব্যবস্থার জোরদার রাষ্ট্রীয় আইনি ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ-মূল্যায়ন এবং রাষ্ট্রীয় পরিবেশ আইনে বিচার ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা কার্যকর করা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নিশ্চিহ্ন, বিপন্ন, বিলুপ্ত, বিলুপ্তপ্রায়, বিলুপ্তির আশঙ্কায় থাকা প্রাণসম্পদ, বাস্তুসংস্থান, শস্য ফসলের বৈচিত্র্য, জীবিকা, ঐতিহ্যগত পেশা ও জীবনধারা, স্থানীয় সম্পদনির্ভর অর্থনীতি ব্যবস্থার ধারাবাহিক জনদলিল তৈরি এবং জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সংরক্ষণ এবং জীবনজীবিকা ও উৎপাদন সম্পর্কের ধারাবাহিকতা শামিল রাখা। জলবায়ু বিপর্যয়ের জন্য দায়ী তথাকথিত উন্নত ও ধনী রাষ্ট্রের খবরদারি ও ভোগ-বিলাসিতা ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় অবস্থান গ্রহণ। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সার্বিকভাবে দায়ী রাষ্ট্র এবং পক্ষসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক, রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক জনগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্ধারণ করা জরুরি। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দেশের ভেতর স্থানীয়-আঞ্চলিক-জাতীয় কর্মউদ্যোগ গ্রহণ এবং একইভাবে সার্ক বা দক্ষিণ এশীয় এবং একটি বৈশ্বিক জলবায়ু মোকাবিলার বন্ধুত্বপূর্ণ কর্মসম্পর্ক তৈরি। জলবায়ু পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার শিকার, বিপন্ন-নিশ্চিহ্ন প্রজাতি এবং জীবন-জীবিকা রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্থানীয় ও

অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা জোরদার করা এবং একটি রাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন ত্রাণ সহযোগিতা সেল জোরদার করা। বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ বহুপক্ষীয় ব্যাংক, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাদের গৃহীত পদক্ষেপ, ঋণ বা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তাদের নির্ধারিত উন্নয়ন পরিকল্পনাকে অবশ্যই প্রাথমিকভাবে উন্মুক্ত-অবাধ-জনগণসমর্থিত ও জনগণ অনুমোদিত হতে হবে। একটি জনগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সেসব তথাকথিত সাহায্য বা ঋণ গ্রহণ বা বর্জনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে দেশের প্রান্তিক ভূমিহীন, ক্ষুদ্র কৃষক-জুমিয়া, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, নারী, প্রবীণ, শিশু, প্রতিবন্ধী জনগণের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সবার নিজস্ব শ্রেণীগত অবস্থান সাপেক্ষে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতিমালা প্রণয়নের আগে অবশ্যই তা জনগণের সম্মতি, প্রস্তাব ও সুপারিশের ভিত্তিতে করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক, আন্তরাষ্ট্রিক, দ্বিরাষ্ট্রিক আইন, নীতি, ঘোষণা, সনদ স্বাক্ষর-সমর্থন ও অনুমোদন করার আগে তা বাংলাদেশের জনগণের কাছে উন্মুক্ত করে জনগণের সম্মতি ও অনুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক দলিলে স্বাক্ষর ও অনুমোদন করার একটি কার্যকরী রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়া থাকতে হবে। যেসব রাষ্ট্র এখনো পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দলিল ও নথিতে স্বাক্ষর করেনি বা অনুমোদন ও সমর্থন করে না, সেসব রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সম্পর্ককে সুস্পষ্ট করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার শপথ, সাহস, শক্তি, সম্ভাবনা, সম্পদ, অভিজ্ঞতা, কৌশল কেবল দেশের গরিব জনগণের ভেতরেই ঐতিহাসিকভাবে বহমান। ঐতিহাসিকভাবেই ঔপনিবেশিক ক্ষমতাকাঠামো জনগণের এই লড়াকু জীবন ও সম্পদকে গুরুত্ব না দিয়ে বারবার তছনছ করেছে এবং জনগণের যাপিত জীবনের জলবায়ু পঞ্জিকাকে উল্টেপাল্টে দিয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনের পর থেকে এই দীর্ঘ সময়েও গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে নানা সবক ও তুবড়ি ছোটালেও পরিবেশ-প্রতিবেশের নিরাপত্তা প্রশ্নে কখনোই একদানা পরিমাণও 'গণতান্ত্রিক' হতে পারেনি রাষ্ট্র। রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে পারেনি জনগণের প্রতিবেশীয় গণতান্ত্রিক অধিকার এবং জলবায়ুগত নিরাপত্তা। অথচ রাষ্ট্র ঐতিহাসিকভাবে জনগণের রাষ্ট্রকে বারবার এক অনিবার্য বিপর্যয় এবং পুরুষতান্ত্রিক বাণিজ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। চলতি সময়ের এই অসহ্য জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশের গরিব জনগণ কোনোভাবেই দায়ী না হলেও জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের সব ধাক্কা ও সর্বনাশ প্রশ্নহীনভাবে সামাল দিতে হচ্ছে বাংলাদেশের গরিব জনগণকেই। এই প্রক্রিয়া বদলানো দরকার। সব ঔপনিবেশিক চাপ, করপোরেট-বাণিজ্য, প্রশ্নহীন ক্ষমতা এবং পৃথিবীকে নিয়ে

যাচ্ছেতাই গুন্ডামি করার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো জরুরি। জনগণের ঐতিহাসিক গণপ্রতিরোধ বারবার এই সাহস ও সাক্ষ্য দেয়, রুখে দাঁড়ানোর ভেতর দিয়েই এক জনগণতান্ত্রিক পরিবেশ নির্মাণ করা সম্ভব। আমাদের এই দুনিয়া কারও একার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, একে এলোপাতাড়ি ফালি ফালি করা বা দোকানে কেনাবেচা করার কোনো অধিকার কারও নেই। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য সত্যিকার অর্থেই এক জনগণতান্ত্রিক গণপ্রতিরোধ ও জলবায়ু লড়াই জরুরি। এর কোনো বিকল্প নেই। জনগণের জলবায়ু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জনগণের যাপিত জীবনের ভেতরেই আছে জলবায়ুকে আগলে রাখার প্রতিরোধী ইশতেহার।

ঋণস্বীকার

এ আলোচনাটি কোনোভাবেই সম্ভব হয়ে উঠত না, যদি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন নিজেদের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো বিনিময় না করতেন। তাঁদের সবার কাছে এই প্রবন্ধ চিরজীবনের জন্য ঋণী হয়ে রইল। মূল লেখাটির রচনাকাল ২০০৮। পরবর্তী সময়ে এই খসড়াকে কেন্দ্র করে দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন আলোচনা ও সেমিনারে বিভিন্ন মাত্রার উপস্থাপন করা হয়েছে। খসড়া লেখাটিকে হালনাগাদ করে একটি নতুন চলমান লেখায় রূপান্তর করা হয়েছে, এমনকি চলতি লেখাটির শিরোনামও পাল্টে গেছে।

তথ্যসূত্র

১. টাঙ্গাইলের মধুপুর শালবনের চুনিয়া গ্রামের প্রবীণ জুমিয়া নারী অনিতা মৃ (৭৭), প্রবীণ সাংসারেক মান্দি দার্শনিক জনিক নকরেক (৯৬), যাঁরা বেশ সময় নিয়ে মান্দি (গারো) সমাজে কীভাবে প্রতিবেশ ও জলবায়ুগত পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য নকমান্দির উদ্ভব হয়েছিল এই ইতিহাস শুনিয়েছেন ২০০৮ সালের জুলাই মাসে। টাঙ্গাইলের মধুপুর শালবনের আদি বাসিন্দা মান্দি আদিবাসীরা এক ঐতিহাসিক সভ্যতা নির্মাণ করলেও বাঙালি রাষ্ট্র, বন বিভাগ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বহিরাগত মুসলমানদের দখল, খ্রিষ্টান মিশনারির চাপ, বহুজাতিক সার-বীজ কোম্পানির বাণিজ্য, রাবার ও আগ্রাসী বাগানসহ নানান বলপ্রয়োগ মান্দিদের সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

২. Global paleoclimatic data for 6000 Yr B.P., T.Webb,111, ASC11 documentation files of NDP-011, 1985.

৩. ড. দিলীপ কুমার দত্ত, ড. সুব্রত কুমার সাহা এবং কুশল রায়, 'সহজ পাঠ : জলবায়ু পরিবর্তন' (প্রথম অংশ : ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণী), অ্যাওসেড, খুলনা, বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ২৫।

৪. দেখুন : http://www.epa.gov/climatechange/science/pastee.html

৫. Bridget Allchin, 'Early Man and Environment in South Asia 10,000 BC-AD 500,' in *Nature and the Orient : the Environmental History of South and Southeast Asia*, Edited by Richard H. Grove, Vinita Damodaran and

Satpal Sangwan, Delhi: Oxford University Press, 1998, p.47-48.

৬. ড. দিলীপ কুমার দত্ত, ড. সুব্রত কুমার সাহা এবং কুশল রায়, ২০০৪, পৃ. ২-৪।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮।

৮. আশরাফ-উল-আলম টুটু ও মিজানুর রহমান বিজয়, *পাল্টে যাওয়া জলবায়ুর উল্টো-পাল্টা খেলা*, উপকূলীয় উন্নয়ন সহযোগী (সিডিপি), খুলনা, বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ. ১৯।

৯. Manuel C. Molles Jr., *Ecology: Concepts and Applications*, NY : McGrawHill, 2002, p. 541.

১০. Roger L. DiSilvestro, 'There is an Environmental Crisis,' in *The Environmental Crisis: Opposing Viewpoints*, edited by Neal Bernards, Opposing viewpoints series, San Diego : Greenhaven press Inc, 1991, p.22-23

১১. Mahfuzul Haque, *Climate Change: Issues for the Policy Makers of Bangladesh*, Dhaka: EDA, 1996, p. 19.

১২. আশরাফ-উল-আলম টুটু, *জলবায়ু পরিবর্তন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে লবণাক্ততায় বিপন্ন দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল*, উপকূলীয় উন্নয়ন সহযোগী, খুলনা, বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ.৩৬-৩৭।

১৩. Mahfuzul Haque, 1996, p. 19.

১৪. Narottam Gaan, Environment and National Security: the Case of South Asia, Dhaka: The University press limited, 2000, p.67

১৫. Cunninnham, William P., Cunninggham, Mary Ann and Saigo, Barbara Woodworth. 2003, Environmental science : a global concern (7th edition), McGrawHill, NY, p.42-46

১৬. Gaan, Narottam. 2000, p.4-7.

১৭. চান্দারবিলের বাসুদেবপুর গ্রামের প্রবীণ কৃষক শ্রী কালীপদ মণ্ডলের (৭৫) কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করা হয়েছে। বাসুদেবপুর, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।

১৮. 'Indigenous perspectives on climate change needed, Northern researcher says,' *Science Daily*, 27 March 2005, source: http://www.sciencedaily.com/releases/2005/03/050325152457.htm

১৯. Ancha Srinivasan, 'Local Knowledge for Facilitating Adaptation to Climate Change in Asia and the Pacific : Policy Implications,' IGES-CP working paper (2004-002).

২০. Neeraj Vedwan, 'Culture, Climate and Environment : Local Knowledge and Perception of Climate Change among Apple Growers in Northwestern India,' *Jounal of Ecological Anthropology*, vol 10, 2006, p.4-18.

২১. Neeraj Vedwan and Robert E. Rhoades, 'Climate Change in the Western Himalayas of India : a Study of Local Perception and Response,' *Climate Research*, Vol 19: 109-117, 2001, source : www.int-res.com

২২. Jan Salick and Anja Byg, *Indigenous Peoples and Climate Change* (eds), Tyndall Centre for Climate Change Research, Oxford, 2007.

২৩. Emily Kirkland, 'Indigenous Knowledge and Climate Change Adaptation in the Peruvian Andes,' 5/11/2012, INTL1450: Political Economy of the Environment in Latin America, 2012.

২৪. Lars Otto Naess, 'Adaptation to Climate Change: A Role for Local Knowledge,' Tyndall Centre for Climate Change Research, Indigenous Peoples and Climate Change Symposium, April 12-13 2007, Environmental Change Institute, Oxford University Centre for the Environment.

২৫. Patrick P. Kalas and Alan Finlay, 'Planting the Knowledge Seed-Adapting to Climate Change using ICTs: Concepts, Current Knowledge and Innovative Examples,' Swiss Agency for Development and Cooperation and Open Research, Building Communication Opportunities (BCO) Alliance.

২৬. আতিউর রহমান, এম আশরাফ আলী, ফারুক চৌধুরী এবং মাহবুব হাসান, *জনপ্রতিবেদন ২০০২-২০০৩ : বাংলাদেশের পরিবেশ*, ঢাকা : উন্নয়ন সমন্বয়, ২০০৫, পৃ. ২৭৩-২৭৯।

২৭. সুকান্ত সেন, দেওয়ান মুহম্মদ আলী ইমরান, এহতেশাম রেজা, মোহাম্মদ জাহিদ হাসান ঢালী এবং সিলভানুস লামিন, *জলবায়ু পরিবর্তন : লোকায়ত জ্ঞান ও অভিযোজন*, ঢাকা : বারসিক, ২০০৭, পৃ. ১৩-৩০।

২৮. দেওয়ান মুহম্মদ আলী ইমরান, 'বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের একটি স্বাদ আছে,' বারসিকের নিয়মিত প্রকাশনা '*আমাদের পরিবেশ*' নামক পুস্তিকায় জানুয়ারি ২০০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত।

২৯. Community based adaptation to climate change bulletin (a summary of the second international workshop on community-based adaptation to climate change), V-135 : N1, 4 March 2007, IISD and IIED.

৩০. Seith Abeka, et al., *Women Farmers Adapting to Climate Change: Four Examples from Three Continents of Women's Use of Local Knowledge in Climate Change Adaptation*, Diakonisches Werk der EKD e.V. for 'Brot für die Welt' and Diakonie Katastrophenhilfe Stafflenbergstraße 76 D-70184 Stuttgart Germany, 2012.

৩১. ড. দিলীপ কুমার দত্ত, ড. সুব্রত কুমার সাহা এবং কুশল রায়, ২০০৪, পৃ. ২৩-২৬।

৩২. দীপক কুমার দাঁ, *পরিবেশ সংকটে বিপন্ন পাখি*, আগরতলা : জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ১০১।

৩৩. ড. আলী নওয়াজ, *খনার বচন কৃষি ও বাঙ্গালী সংস্কৃতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ১৯৮৯, পৃ. ১২৮।

৩৪. এই অংশটুকু লেখার জন্য মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার কালেঞ্জী খাসিয়াপুঞ্জির কবিরাজ নসিফ পথমি (৭৮), পুঞ্জিমন্ত্রী নেইত খেন্দ্রিয়াম (৫৫); টাঙ্গাইলের মধুপুর শালবনের চুনিয়া গ্রামের মান্দি বাদ্যযন্ত্র কারিগর সহিন মৃ (৮০), বেদুরিয়া গ্রামের জুমিয়া

নারী ফমন নকরেক (৬৫), গায়রা গ্রামের নইজ্জ্য নকরেক (৭৫) এবং সুনামগঞ্জ-গোপালগঞ্জের হিরাল ও শিরালীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

৩৫. এমপু পাড়ার প্রবীণ ম্রো নারী সেকরে ম্রো (৯৫), কারবারি এমপু ম্রো (৭০), নাংক্লেং ম্রো (৬৪), ইয়ারম্যান ম্রো (৩৭), ইয়াংরুং ম্রোদের (৩৭) ভাষ্য অনুযায়ী এই বিবরণ লেখা হয়েছে। এমপু কার্বারি পাড়া, বান্দরবান।

৩৬. 'Patenting the 'Climate Genes' ... and capturing the climate agenda,' *Communique*, ETC Group, May/June 2008 issue # 99, source : www.etcgroup.org

৩৭. ড. রফিক আহমেদ, *আবহাওয়া ও জলবায়ুবিজ্ঞান*, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭, পৃ. ৩৭৫।

৩৮. আশরাফ-উল-আলম টুটু, ও মিজানুর রহমান বিজয়, ২০০৩, পৃ. ৩৯।

৩৯. দৈনিক *জনকণ্ঠ*, ৯ জুন ২০০৩, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৪০. Catherine Malina, 'Are We Ready for Climate Change's Health Impacts?' source : http://green.yahoo.com/blog/climate411/95/are-we-ready-for-climate-change-s-health-impacts.html

৪১. শমিত কর, *বিপন্ন পরিবেশ বিপন্ন মানুষ*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪০৫ বাংলা, পৃ. ৮১।

৪২. *Biodiversity and Climate Change 2008*, This factsheet was compiled in 2008 by ICLEI with the support of Count-down 2010, ECNC and LAB, source : www.iclei.org/biodiversity

৪৩. M. M. Feeroz and M. A. Islam, 'Primates of the West Bhanugach Forest Reserve: Major Threats and Management Plan,' in *Bangladesh Environment 2000*, edited by M. Feroze Ahmed, BAPA, Dhaka, Bangladesh, 2000, pp. 239-253.

৪৪. দেশের ১৪ নম্বর মৌলভীবাজার গ্যাসফিল্ডের গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে মার্কিন করপোরেট তেল-গ্যাস কোম্পানি শেভরন মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল এবং কমলগঞ্জ উপজেলার সংরক্ষিত বন, জাতীয় উদ্যান, কৃষিজমি, চা-বাগান, প্রাকৃতিক ছড়া, বসতি, পানপুঞ্জি, গ্রামের ভেতর দেশে বিদ্যমান বন ও পরিবেশসংক্রান্ত সব আইন ও নীতি অগ্রাহ্য করে ১৫২ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ত্রিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপের কাজ শুরু করে প্রায় শেষ করেও এনেছে। মাটির ৭০-১০০ ফুট নিচে বোরিং এবং বোমা বিস্ফোরণের ফলে মাটির বাস্তুসংস্থান, অণুজীব, বনতলবাসীদের প্রতিবেশব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদি সংকটের ভেতর পড়বে। জরিপকাজের ফলে মাটির তলায় ঘুমিয়ে থাকা বীজসমূহ নষ্ট হয়ে তাদের অঙ্কুরোদ্গম চরিত্র এবং পরিবেশ হারিয়েছে, যা পরবর্তী সময়ে লাউয়াছড়া বনের স্বাভাবিক পুনর্বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটাবে। জরিপকাজের সময় বিচরণ এলাকা বিপদাপন্ন হওয়াতে অনেক বন্য প্রাণী বন ছেড়ে লোকালয়ে এসে পড়েছে, শ্রীমঙ্গলের সবুজবাগে একদল বানর, আশিদ্রোণ গ্রামে দুটি গন্ধগোকুলের বাচ্চা, শাহীবাগে দুটি লজ্জাবতী বানর এবং রুস্তমপুরে একটি মেছো বাঘ আটক করেছে জনগণ। জরিপকাজে বোমা বিস্ফোরণের শব্দে জান বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ৩৩ হাজার কেভি লাইনে পড়ে শহীদ হয়েছে একটি চশমাপরা হনুমান, লাউয়াছড়া বননির্ভর খাসিয়ারা

যাকে ত্রিইঞা নামে ডাকেন। বন বিভাগ অনেক লুকোছাপা করে দ্রুত একে মাটিচাপা দিয়েছে। শেভরনের জরিপকাজের ফলে খাসিয়া ভাষায় সেন-থারেঙ্গাম (লাউলতা) নামে পরিচিত সবুজ বর্ণের একটি সাপ সরীসৃপদের ভেতর সবচেয়ে বেশি মারা পড়েছে এবং পতঙ্গের ভেতর সবচেয়ে বেশি মরেছে বড় বন মাকড়সাগুলো, যাদের খাসিয়ারা ইয়াংথনিয়েম বলেন। শেভরনের এই জরিপের ফলে স্থানীয় খাসিয়া ও ত্রিপুরি আদিবাসীদের বসত এলাকা এবং পানজুম ও লেবুবাগান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় গ্রামগুলোতে ঘরবাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে।

৪৫. মো. আবদুল হান্নান, *পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা* ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ. ৫৯।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২-১৭৮।

৪৭. M. M. Feeroz and M. A. Islam, 2000, pp. 239-253.

৪৮. আশরাফ-উল-আলম টুটু ও মিজানুর রহমান বিজয়, ২০০৩, পৃ. ৫৪।

৪৯. ড. আলী নওয়াজ, পৃ. ১২১।

৫০. আশরাফ-উল-আলম টুটু ও মিজানুর রহমান বিজয়, ২০০৩।

৫১. আতিউর রহমান, আশরাফ আলী, ফারুক চৌধুরী এবং মাহবুব হাসান, ২০০৫, পৃ. ২৭৩-২৭৯।

৫২. সিলভানুস লামিন, 'জলবায়ু পরিবর্তন, বাহির ও অভ্যন্তরীণ শোষণে খাসিয়া আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন,' বারসিকের নিয়মিত প্রকাশনা *আমাদের পরিবেশ* নামক পুস্তিকায় মার্চ ২০০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৫৩. আশরাফ-উল-আলম টুটু, ২০০৪, পৃ. ১৪।

৫৪. A. K. M Nazrul Islam, 'Vegetation Dynamics, Ecological Conditions and Diversity in the Sundarban Mangrove Forest, Bangladesh,' In *Mangrove ecosystems: Natural Distribution, Biology and Management*, edited by Narayana R. Bhat, Faisal K. Taha and Afaf Y. Al-Nasser, Kuwait institute for scientific research, Kuwait, 2001, p.254.

৫৫. 'Patenting the 'Climate Genes' ... and capturing the climate agenda,' May/June 2008 issue # 99, in *Communique*, ETC Group, source : www.etcgroup.org

৫৬. এ ক্ষেত্রে মনে রাখা জরুরি, বাংলাদেশে কাপ্তাই বাঁধ কীভাবে জনগণের কোনো ধরনের পূর্ব অনুমতি এবং সম্মতি ছাড়া তৈরি হয়েছিল এবং তা প্রতিবেশ এবং জনজীবনের জন্য কী ধরনের দুর্যোগ বয়ে এনেছে। এই বিদ্যুৎ উৎপাদনপ্রক্রিয়াও নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প। ব্রিটিশ সরকার এই নদীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বেশ কিছু জরিপের পর ১৯৫২ সালে বাঁধের জন্য কাপ্তাই এলাকাকে নির্বাচন করে। বাঙালিরা তখন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে জীবন দিচ্ছে। পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার আমেরিকার কাছে অর্থ সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়। ১৯৫৬ সালে আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি বাঁধ তৈরির জন্য নিয়োগ পায়, ১৯৫৭ সালে ইউতাহ্ ইন্টারন্যাশনাল ইনকরপোরেট বাঁধ নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৬১ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর ১৯৬২ সালে নির্গমন দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যায় বসত জমি, জুম জঙ্গল, জীবন জনপদ, রাঙামাটি শহর আর চাকমা

রাজবাড়ি। মাটি ভরাট করে তৈরি করা ৬৭০.৬ মিটার দীর্ঘ এই সর্বনাশা বাঁধের ফলে ৩৬৫ বর্গমাইল এলাকা তলিয়ে যায়। এর ভেতর পাহাড়ের জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার প্রায় ৫৪ হাজার একর কৃষিজমি ছিল, যা পার্বত্য এলাকার কৃষিজমির ৪০ ভাগ। কর্তৃপক্ষ চার কোটি ১৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বললেও কেউ নগদ ক্ষতিপূরণ পাননি।

৫৭. Terry Collins, 'Indigenous Peoples Hardest Hit by Climate Change Describe Impacts,' 2008, source: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2008-04/unu-iph040108.php

৫৮. ড. সোমনাথ মিশ্র, ২০০৩, *প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রতিকার*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩২-৩৩।

৫৯. Victoria Tauli-Corpuz, and Aqqaluk Lynge, 'Impact of Climate Change Mitigation Measures on Indigenous Peoples and on Their Territories and Lands,' this paper submitted in the Permanent Forum on Indigenous Issues (7th session, special theme : 'climate change, bio-cultural diversity and livelihoods: the stewardship role indigenous peoples and new challenges'), held in New York 21 April-2 May 2008.

৬০. ড. দিলীপ কুমার দত্ত, ড. সুব্রত কুমার সাহা, এবং কুশল রায়, ২০০৪, পৃ. ২১।

৬১. Carbon footprint (কার্বন-পদচ্ছাপ) : মানুষের কার্যকলাপের দরুন যে পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয় সেই গ্যাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডকে একক ধরে যে পরিমাপ করা হয় তাই কার্বন-পদচ্ছাপ। পৃথিবীর উত্তরের ধনী দেশসমূহ আমেরিকা, ইউরোপের মাত্রাতিরিক্ত ভোগবিলাসী জীবন এবং দুনিয়াব্যাপী করপোরেট কোম্পানিসমূহের একক বাণিজ্য বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি কার্বন ছাড়ছে এবং বাংলাদেশের মতো দক্ষিণের দেশগুলোতে সেসব দেশের কার্বন-পদচ্ছাপ পড়ছে। পরিবেশ ও বায়ুমণ্ডলে মানুষের কার্যকলাপের দরুন কীভাবে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং মূলত কী পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমন ঘটে, তা কার্বন-পদচ্ছাপ পদ্ধতি দিয়ে যাচাই করা হয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের সময় প্রতিদিন প্রায় ৬৫০ কেজি কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমন করে। বড়দিনের খাবার থেকে ২৬ কেজি, যাতায়াতের জন্য ৯৬ কেজি, আলোকসজ্জার জন্য ২১৮ কেজি এবং কেনাকাটার জন্য ৩১০ কেজি কার্বন নির্গমন ঘটে একেকজনের বেলায়।

৬২. Bill Devall, 'Radical Activism Can Help Protect the Environment,' in *The Environmental Crisis: Opposing Viewpoints*, edited by Neal Bernards, Opposing Viewpoints Series, San Diego: Greenhaven press Inc, 1991, p.246-253.

৬৩. Doug Bandow, ibid, p. 254-260.

৬৪. Low-carbon economy (কম কার্বনভিত্তিক অর্থনীতি) : জলবায়ু পরিবর্তন ডিসকোর্সে 'কম কার্বনভিত্তিক অর্থনীতি' একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এখানে এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলা হয়, যেখানে সবচেয়ে কম গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন ঘটে। তবে বিশেষজ্ঞরা সব গ্রিনহাউস গ্যাসের ভেতর কার্বন ডাই-অক্সাইডের নির্গমনকেই বেশি চিহ্নিত করছেন। শিল্প-কারখানা, ভোগবিলাসী জীবন, যানবাহন, ইলেকট্রনিক এবং ডিজিটাল পণ্যের ব্যবহার, রাসায়নিকের ব্যবহার এই কার্বন নির্গমন অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি অনেক কম কার্বন নির্গমন করে। পৃথিবীর প্রায় ৪৫ ভাগ ভূমি কৃষির আওতাধীন এবং এখান থেকে মাত্র ১৩.৫ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন ঘটে। ২০০৮ সালের ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল প্রতিপাদ্যও তৈরি করা হয়েছে এই কম কার্বনভিত্তিক অর্থনীতিকে ঘিরেই।

৬৫. Low carbon diet (কম কার্বনভিত্তিক খাদ্যতালিকা) : জলবায়ু পরিবর্তন ডিসকোর্সে এটিও একটি জরুরি প্রসঙ্গ। মানুষের যাপিত জীবনে তার খাদ্যাভ্যাস এবং খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে বায়ুমণ্ডলে কী পরিমাণে কার্বন নির্গত হয় এবং এই কার্বনের পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য কীভাবে কম কার্বনভিত্তিক খাদ্যতালিকা এবং জীবনচর্চা অনুশীলনের প্রয়োজন, তা এই প্রপঞ্চ আলোচনা করে। দক্ষিণের গরিব দেশের কৃষিনির্ভর জনগণ সবচেয়ে কম কার্বনভিত্তিক খাদ্যতালিকা মেনে চলে এবং তাদের খাদ্যাভ্যাস বা খাদ্যসংস্কৃতি সব সময়ই বায়ুমণ্ডলকে কার্বন-নিরপেক্ষ রাখে। কিন্তু করপোরেট বাণিজ্য মূলত শহরের মানুষদের ভেতর যে করপোরেট বিলাসিতা তৈরি করেছে, সেখানে খাদ্যাভ্যাসের ভেতর দিয়ে ব্যাপক কার্বন বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। Bon Appetit Management Company ২০০৭ সালে দেখিয়েছে, আমেরিকার জনগণের খাদ্যাভ্যাস এবং খাদ্যতালিকা বায়ুমণ্ডলে উচ্চমাত্রায় কার্বন নির্গমন করে এবং এর পরিমাণ আমেরিকার গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের প্রায় ২০ ভাগ।

গ্রন্থপঞ্জি

Allchin, Bridget. 'Early Man and Environment in South Asia 10,000 BC-AD500.' In *Nature and the Orient : the Environmental History of South and Southeast Asia*, Edited by Richard H. Grove, Vinita Damodaran and Satpal Sangwan, Delhi: Oxford University Press, 1998.

Bandow, Doug. 'Radical Activism cannot Help Protect the Environment.' In *The Environmental Crisis : Opposing Viewpoints*, edited by Neal Bernards, Opposing viewpoints series, san Diego: Greenhaven press Inc, 1991.

Biodiversity and Climate Change. This Factsheet was Compiled in 2008 by ICLEI with the Support of Count-down 2010, ECNC and LAB, 2008. source : www.iclei.org/biodiversity

Collins, Terry. 'Indigenous Peoples Hardest Hit by Climate Change Describe Impacts.' 2008. source : http://www.eurekalert.org/pub_releases/2008-04/unu-iph040108.php

Community based Adaptation to Climate Change Bulletin (a summary of the second international workshop on community-based adaptation to climate change), V-135:N1, 4 March 2007, IISD and IIED.

Cunninnham, William P., Cunninggham, Mary Ann and Saigo, Barbara Woodworth. *Environmental Science : a Global Concern* (7th edition), New York: McGrawHill, 2003.

Devall, Bill. 'Radical Activism can Help Protect the Environment.' In *The Environmental Crisis : Opposing Viewpoints*, edited by Neal Bernards, Opposing viewpoints series, san Diego: Greenhaven press Inc, 1991.

DiSilvestro, Roger L. 'There is an Environmental Crisis.' In *The Environmental Crisis : Opposing Viewpoints*, edited by Neal Bernards, Opposing viewpoints series, san Diego: Greenhaven press Inc, 1991.

Feeroz, M.M. and Islam, M.A. 'Primates of the West Bhanugach Forest Reserve : Major Threats and Management Plan.' In *Bangladesh Environment 2000*, edited by M. Feroze Ahmed, Dhaka: BAPA, 2000.

Gaan, Narottam. *Environment and National Security: The Case of South Asia*, Dhaka: The University press limited, 2000.

Haque, Mahfuzul. *Climate Change : Issues for the Policy Makers of Bangladesh*, Dhaka : EDA, 1996.

Islam, A.K.M Nazrul. 'Vegetation Dynamics, Ecological Conditions and Diversity in the Sundarban Mangrove Forest, Bangladesh.' In *Mangrove Ecosystems : Natural Distribution, Biology and Management*, edited by Narayana R. Bhat, Faisal K. Taha and Afaf Y. Al-Nasser, Kuwait: Kuwait Institute for Scientific Research, 2001.

'Indigenous Perspectives on Climate Change Needed, Northern Researcher Says.' *Science Daily*, 27 March 2005, source: http://www.sciencedaily.com/releases/2005/03/050325152457.htm

Molles, Manuel C. Jr. *Ecology: Concepts and Applications*, New York: McGrawHill, 2002.

Patenting the ``Climate Genes'' `... and Capturing the Climate Agenda. May/June 2008 issue # 99, In : *Communique*, ETC Group, source : www.etcgroup.org

Salick, Jan and Byg, Anja. 'Indigenous Peoples and Climate Change' (eds). *Tyndall Centre for Climate Change Research*, Oxford, 2007.

Srinivasan, Ancha. 'Local Knowledge for Facilitating Adaptation to Climate Change in Asia and the Pacific : Policy Implications.' IGES-CP Working Paper (2004-002), 2004.

Vedwan, Neeraj. 'Culture, Climate and Environment : Local Knowledge and Perception of Climate Change among Apple Growers in Northwestern India.' *Jounal of Ecological Anthropology* : vol 10, 2006.

Vedwan, Neeraj and Rhoades, Robert E. 'Climate Change in the Western Himalayas of India : a Study of Local Perception and Response.' *Climate Research* : Vol 19: 109-117, 2001. source : www.int-res.com

আহমেদ, ড. রফিক। *আবহাওয়া ও জলবায়ুবিজ্ঞান*। রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭।

কর, শমিত। *বিপন্ন পরিবেশ বিপন্ন মানুষ*। কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪০৫ বাংলা।

টুটু, আশরাফ-উল-আলম। *জলবায়ু পরিবর্তন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে লবণাক্ততায় বিপন্ন দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল*। খুলনা : উপকূলীয় উন্নয়ন সহযোগী, ২০০৪।

টুটু, আশরাফ-উল-আলম ও বিজয়, মিজানুর রহমান। *পাল্টে যাওয়া জলবায়ুর উল্টো-পাল্টা খেলা*। খুলনা : উপকূলীয় উন্নয়ন সহযোগী (সিডিপি), ২০০৩।
দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ জুন ২০০৩, ঢাকা, বাংলাদেশ।

দত্ত, ড. দিলীপ কুমার; সাহা, ড. সুব্রত কুমার এবং রায়, কুশল। *সহজ পাঠ : জলবায়ু পরিবর্তন* (প্রথম অংশ : ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণী)। খুলনা : অ্যাওসেড, ২০০৪।

দাঁ, দীপক কুমার। *পরিবেশ সংকটে বিপন্ন পাখি*। আগরতলা : জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, ১৯৯৯।

নওয়াজ, ড. আলী। *খনার বচন কৃষি ও বাঙ্গালী সংস্কৃতি*। ঢাকা : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ১৯৮৯।

মিশ্র, ড. সোমনাথ। *প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রতিকার*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩।

রহমান, আতিউর; আলী, এম আশরাফ; চৌধুরী, ফারুক এবং হাসান, মাহবুব। *জনপ্রতিবেদন ২০০২-২০০৩ : বাংলাদেশের পরিবেশ*। ঢাকা : উন্নয়ন সমন্বয়, ২০০৫।

সেন, সুকান্ত; ইমরান, দেওয়ান মুহম্মদ আলী; রেজা, এহতেশাম; ঢালী, মোহাম্মদ জাহিদ হাসান এবং লামিন, সিলভানুস। *জলবায়ু পরিবর্তন : লোকায়ত জ্ঞান ও অভিযোজন*। ঢাকা : বারসিক, ২০০৭।

হান্নান, মো. আবদুল। *পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৩।

বই আলোচনা

মওদুদ আহমদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের একটি মূল্যায়ন

মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ : এ স্টাডি অব দ্য ডেমোক্রেটিক রেজিমস* ইউপিএল ২০১২

মওদুদ আহমদ বাংলাদেশের রাজনীতির একটি অন্যতম কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্র। বাংলাদেশের সমসাময়িক ইতিহাসজুড়ে তাঁর রাজনৈতিক উপস্থিতি লক্ষণীয়। তিনি কখনো নন্দিত, কখনো নিন্দিত। আমরা মওদুদ আহমদের বইয়ের আলোচনায় প্রবেশের আগে তাঁর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থান স্মরণ করে নিতে পারি। কারণ তিনি এমন একটি সময়ে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন, যখন তিনি নিজেই অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নিপীড়িত হয়েছেন। অবশ্য রাজনীতির বোদ্ধারা সাধারণত এটা কবুল করে থাকেন যে মওদুদ রাজনীতিতে কখন কী (সুবিধাবাদিতা এর অন্যতম) করছেন, আর তিনি সে সম্পর্কে কী লিখছেন, তাকে এক করে দেখা যাবে না। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে তিনি যতটা সম্ভব নির্মোহ অবস্থানে থেকে রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বিশ্লেষণের চেষ্টা করছেন।

অবশ্য দেশে তাঁর এই মিশ্র অবয়ব সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের অনেকেই, বিশেষ করে অস্ট্রেলীয়-ব্রিটিশ সাংবাদিক ও লেখক জন পিলজার—নোয়াম চমস্কি যার কাজকে বলেছেন অন্ধকারে আলোকসংকেত, আবার উইলিয়াম শোক্রসের মতে ইংরেজি ভাষার অন্যতম লেখক—মওদুদের গুণমুগ্ধ। এক-এগারোতে লেখনীর মাধ্যমে পিলজার অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মওদুদের পাশে দাঁড়ান। এমনকি তাঁর জামিন চেয়ে ফখরুদ্দীন আহমদকে পাঠানো পিলজারের ই-মেইল আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছিল। গ্রানাডা টিভির হয়ে একাত্তরে যুদ্ধ কভার করতে এসে মওদুদের সঙ্গে পিলজারের এক 'চন্দ্র অনালোকিত রাতে' দেখা হয়েছিল। ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড *ডেইলি মিরর*-এর সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকা পিলজারের চোখে মওদুদ সাহসী, আদর্শস্থানীয় রাজনীতিক। এমনকি তিনি তাঁকে টমাস পেইনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অ্যাংলো-আমেরিকান পেইন রাজনীতির তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও বিপ্লবী ছিলেন। দণ্ডিত হয়েছেন, জেল খেটেছেন বহুবার। ফরাসি বিপ্লবে যোগ দিয়েছেন, আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য লিখেছেন প্যামফ্লেট। পিলজার মওদুদের জন্য ২০০৮ সালে লিখেছেন, সেই লেখাটিই সময়োপযোগী করে পুনরায় লিখেছেন *গার্ডিয়ান*-এ (১৫ ডিসেম্বর ২০১৩)। উভয় লেখায় একজন বন্দী মওদুদের কারামুক্তির ওপরই বিশেষ জোর দিয়েছেন পিলজার। কিন্তু যেটা এখানে প্রতিপাদ্য সেটা হলো, পিলজারের বর্ণনায় মওদুদ বিরাট মাপের গণতান্ত্রিক এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধাচরণের এক অবিসংবাদিত সিপাহসালার। ধরে নিতে পারি পিলজার তাঁর বন্ধু মওদুদকে যেভাবে চিনেছেন, চিত্রিত করেছেন, সেই পরিচয়ে পরিচিত হতে, স্বীকৃতি পেতেই মওদুদের ঝোঁক থাকতে পারে। কিন্তু সেটা যে আসলে একটি খণ্ডিত চিত্র তা অনেকেই মানবেন।

মওদুদের এই বইয়ের আলোচনায় পিলজারকে প্রাসঙ্গিক করে তোলা এ কারণে যে মওদুদ নিজেকে গণতন্ত্রের বরপুত্র ভাবতে পছন্দ করেন। তাঁর ধূসর রাজনৈতিক জীবনের কোনো ব্যাখ্যা আমরা তাঁর বইয়ে পাই না। এমন একজন চিন্তাবিদের কাছ থেকে আমরা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ আলোচনা ও বিশ্লেষণ পাচ্ছি। পিলজার লিখেছেন, 'মুজিবের আমলে মওদুদ গণতন্ত্রের একজন "অতন্দ্রিত রক্ষী" হওয়ায় কারাবরণ করেছিলেন। আর পরবর্তী সময়ে হত্যা, অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের রাজনীতিতে মওদুদ নিজেকে কারাগার ও সংসদের মধ্যে ঠাঁই করে নিয়েছেন। কারাগারে থেকেও তিনি সংসদীয় আসনে জয়ী হয়েছেন। বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কালের অধিকাংশ সময় ফিউডালিস্ট ও ডেমোক্র্যাটদের এবং সম্প্রতি ফান্ডামেন্টালিস্টদের মধ্যে লড়াই চলেছে।' গণতন্ত্রের লড়াই নিশ্চয় বাংলাদেশে চলছে। মওদুদ এই লড়াইয়ে সব সময় গণতন্ত্রীদের পক্ষে ছিলেন কি? বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের নির্বিচারে জেলে পোরা কি শেখ হাসিনাই প্রথম করেছেন? কবি হাসনা মওদুদ পিলজারকে বলেছেন, বিশ্বকে জানতে হবে যে গোটা দেশটা কারাগারে পরিণত হয়েছে। এটা অসত্য নয়। কিন্তু বিএনপি আমলে যখন ঘটেছে তখন তাতে মওদুদের ভূমিকা কী ছিল।

মুক্তবুদ্ধিবৃত্তিকতার চর্চার প্রশ্নে মওদুদের এই স্ববিরোধিতার কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেন। এই পটভূমিটি মনে রেখেই তাঁর এই বইয়ের আলোচনা করা হলো।

মওদুদের আলোচ্য বইয়ে ২০টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথমটিতে তিনি ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশ গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। তবে সেটাও নিরস নয়, কারণ সেখানে তথ্য আছে যে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ১৪০ আসন পেয়ে কী উপায়ে আরও ১১টি আসন সংগ্রহ করে তাঁর প্রথম সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বামদলীয় ১৩টি আসন বিএনপির সঙ্গে যোগ দিতে রাজি ছিল কিন্তু সেটা কাজ করেনি। মানতেই হবে ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ আবার তার জাতীয় রাজনীতিকে সেক্যুলার রাখার সুযোগ হাতছাড়া করেছিল। মওদুদ গণতন্ত্রের প্রথম শর্ত পূরণের প্রবক্তা হতে চাননি। তিনি ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করতে কখনো কোনো চেষ্টা চালিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। কারণ ১৯৯১ সালে ক্ষমতা এবং সংবিধান সংশোধনের সুযোগ পেয়ে বিএনপি গিয়েছিল তার যৌক্তিক পরিণতির দিকে। আধা চরম ডানই তার নিয়তি ও গন্তব্য। তবে তার প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগও তার থেকে যথেষ্ট আলাদা কিছু, তাও বলা যাবে না। সে কারণে দ্বাদশ সংশোধনী পাসের সময় জোড়াতালি দিয়ে একটি স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারাবাহিকতাই অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের গণতান্ত্রিক পথে হাঁটতে সুচিন্তিতভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

সদ্য ক্ষমতাচ্যুত এরশাদকে নিয়ে খালেদা জিয়ার তখন সরকার করতে না পারাটা কোনো গণতান্ত্রিক ব্যর্থতা ছিল না। ছিল কৌশল ও সুবিধাবাদী রাজনীতির সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্ন। বিশ্ব বাংলাদেশ গণতন্ত্রের যাত্রাকে পিলজারের মতো ফিউডালিস্টদের সঙ্গে লড়াই দেখলে তো চলবে না। সত্যের অপলাপ হবে। কারণ কে কখন ফিউডালিস্ট আর কে কতক্ষণ কোন মাত্রায় কতটুকু গণতন্ত্রী তার ওজন দেওয়া দুরূহ। জেনারেল এরশাদকে পেলেও চলত বিএনপির কিন্তু তার গায়ের সামরিক গন্ধ বাতাসে ভাসছে তখনো। জেনারেল মোহাম্মদ নূরউদ্দীন খান ক্রান্তিকালে অসাধারণ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমরা জানতাম জেনারেল এরশাদকে তিনি চূড়ান্ত মুহূর্তে 'না' বলতে পেরেছিলেন। আর তাই খালেদা জিয়ার প্রথম সরকার গঠনে তিনিই অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেন।

খালেদা জিয়া ও গোলাম আযমের মধ্যে দূতিয়ালির কাজটিও এই জেনারেল করেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গঠনের প্রক্রিয়া এ দেশে এভাবেই সামনে অগ্রসর হয়েছে। ইতিহাসের কী আশ্চর্য যোগাযোগ, ইয়াহিয়া কেবিনেটের সদস্য, এটা লক্ষণীয় যে মওদুদ তাঁর এই পরিচয় না উল্লেখ করে লিখেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি ডব্লিউ চৌধুরীর বাসায় এক জেনারেলের উপস্থিতিতেই বেগম জিয়া, গোলাম আযম ও মতিউর রহমান নিজামীর মধ্যে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। ১৮টি আসনের অধিকারী জামায়াত এই বৈঠকের পর

রাষ্ট্রপতিকে লিখিতভাবে বিএনপিকে সমর্থনের কথা জানিয়ে দেয় এবং ইতিহাসের আরও পরিহাস এই যে জাতীয় জীবনের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এবং তার কিছুকাল পর শহীদজননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গণ-আদালতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পরও জামায়াতের সঙ্গে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে ঐক্য গড়ে তুলেছিল।

আমরা আরও স্মরণ করতে পারি যে বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম নির্বাচিত সরকারটি তার নির্বাচিত পার্লামেন্টকে সুশাসনের শর্ত পূরণে ব্যবহার করেনি। কেবল ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে ক্রমেই অধৈর্যশীল হয়ে পড়া আওয়ামী লীগের কারণে তাকে কার্যকর হতে দেয়নি। মওদুদ তাঁর বইয়ে ১৯৯৬-পরবর্তী বিএনপির বিরোধীদলীয় দাবি মোকাবিলা করার যে চিত্র বিস্তারিত উপস্থিত করেছেন তার আরেকটি পর্ব আমরা ১৯৯৬ পূর্বকালে দেখেছি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি ওঠার পর তারা বর্তমান আওয়ামী লীগের মতোই নির্বাচিত-অনির্বাচিতের দ্বন্দ্বকে প্রকট করেছিল। আর সত্যি বলতে কি, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পরে সংবিধানে একাধিক স্থানে যতই তারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করুক না কেন, তাদের মাথা থেকে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি একেবারে গোড়াতেই নির্বাসিত হয়েছিল। এর প্রমাণ তারা একদলীয় শাসন চালু করতে দ্বিধা করেনি। বিনা নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি ও সংসদের মেয়াদ বাড়িয়ে নিতেও তারা পিছপা হয়নি। আবার একদলীয় শাসনের সমালোচনা করে যে প্রতিবিপ্লব হলো, সেই প্রতিবিপ্লবীদের অন্যতম পুরোধা মওদুদ। সামরিক শাসকদের জুনিয়র পার্টনার হিসেবে তাঁর যে খ্যাতি বা অখ্যাতি তাকে ফিউডালিজমের আভা থেকে খুব বিচ্ছিন্ন করে দেখার সুযোগ সীমিত। একদলের নামে সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের নামে শাসক দলের গোটা চেষ্টার মধ্যে কখনোই সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সদিচ্ছা প্রকাশ পেতে দেখা যায়নি। জন পিলজার লিখেছেন, মওদুদ জিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এই শর্তে যে জিয়া সেনাপ্রধানের পদ ছেড়ে দেবেন। অথচ মওদুদ এ কথা আমাদের কাছে অস্বীকার করেন না যে মশিউর রহমান যাদু মিয়া শর্ত দিয়েছিলেন যে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা যাবে না। তখন মওদুদ যাদু মিয়াকে সমর্থন দেওয়াকে যাঁরা বাস্তবসম্মত বলে মানতে পারেননি, মওদুদ ছিলেন তার অন্যতম। সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ার গণতন্ত্রায়ণ প্রশ্নে জিয়া-যাদু চুক্তির বাস্তবায়ন প্রশ্নে মওদুদকে কখনো সোচ্চার হতে দেখা যায়নি।

বাংলাদেশ শাসকেরা সব সময় গণতন্ত্রকে প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের সবচেয়ে বেশি প্রবণতা দেখিয়েছে। তারা গণতন্ত্রকে ক্ষমতা করায়ত্ত করার উপায় হিসেবে দেখছে। বেসামরিক শাসকেরা ব্যালটকে ও সামরিক শাসকেরা বুলেটে

ক্ষমতা নিলেও তারাও দ্রুততার সঙ্গে ব্যালট ব্যবহারের জনপ্রিয় প্রবণতা দেখিয়েছে। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ কোথাও ছিল না। গণতন্ত্রের শর্তে তেমন কোনো ত্যাগ তারা করতে চায়নি।

মওদুদ আহমদ জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির ১৯৯১ সালের সমঝোতার বিষয়ে চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, দুই শর্তে জামায়াত বিএনপিকে সরকার গঠনে সমর্থন দিয়েছিল। জামায়াতে ইসলামীর আমির হিসেবে গোলাম আযমের নিয়োগ এবং তাঁর নাগরিকত্ব দান। মওদুদ আহমদ বিস্তারিত উল্লেখ না করে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই ইঙ্গিত করেছেন যে সেদিন খালেদা জিয়া প্রকারান্তরে জামায়াতের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিলেন। গোলাম আযমের নাগরিকত্ব না দিয়ে বরং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুরো রমজান মাস গোলাম আযম কারাগারে ছিলেন, এ কথা উল্লেখ করতে বিস্মৃত হননি মওদুদ। সে ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন আসে যে গোলাম আযমকে নির্বাহী আদেশে নাগরিকত্ব না দিয়ে বরং যাতে তিনি নাগরিকত্ব না পান সে জন্য সুপ্রিম কোর্টে সর্বাত্মক আইনি লড়াই চালানোর নির্দেশ কেন সেদিন দেওয়া হয়েছিল তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেলকে। এতে সন্দেহের অবকাশ কম যে প্রয়াত অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট আমিনুল হক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব মামলায় প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে আদালতে এই সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করা হয়েছিল যে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরও গোলাম আযম কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছিলেন।

মওদুদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রশাসনের দলীয়করণ এবং খালেদা জিয়ার শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন। তিনি ৭৭ পৃষ্ঠায় তথ্য দিয়েছেন খালেদা জিয়ার কোনো কিচেন কেবিনেট ছিল না, তিনি এমনকি সংসদে ডেপুটি লিডার নিয়োগ দেননি। এই দশম সংসদে এসেও শেখ হাসিনা ডেপুটি লিডার নিয়োগ দেননি। এটা প্রমাণ করে যে সময় গড়াচ্ছে ঠিকই কিন্তু শাসকদের শাসন স্টাইলে তাঁরা কোনো পরিবর্তন আনতে নারাজ। অপশাসনগত স্থিতাবস্থা যাতে ভেঙে না যায়, সে বিষয়ে তাঁরা সতর্ক।

খালেদা জিয়া যেসব বিষয়ে মনে করতেন সেসব বিষয়ে অনুমোদন পেতে আলোচনার জন্য কেবিনেটের জ্যেষ্ঠ সদস্যদের ডাকতেন। কিন্তু তাঁদের কথায় তিনি চলতে চাইতেন, সেটা মওদুদ বলেননি। সবচেয়ে বিপজ্জনক তথ্য দিয়ে তিনি বলেছেন, 'মন্ত্রিসভা কিংবা দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী স্ট্যান্ডিং কমিটিতে কোনো রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা হতো না।' তাঁর এমন সব অকপট ও সাহসী উচ্চারণ তাঁর বইয়ের বহু ক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে। তিনি বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কোনো ধরনের কাঠামোগত জবাবদিহির ব্যবস্থা নেই। তাই তারা যেকোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে। বাণিজ্যিক চুক্তি, উন্নয়ন প্রকল্প, সরকারি ক্রয়, কর্মকর্তাদের

কর্মস্থল নির্ধারণ ও বদলি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগ তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কোনো মন্ত্রীকে প্রায়ই ডাকা হয় না। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হয়তো অন্য মন্ত্রীদের ডাকে কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের ছাড়া।' মওদুদ লিখেছেন, 'ভারতের মতো কতিপয় দেশ রাজনৈতিক বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক কেবিনেট কমিটি গঠন করে থাকে। বাংলাদেশ দুর্ভাগ্যবশত এমন কিছু দেশকে অনুসরণ করে, যেখানে সরকারপ্রধান কোনো ধরনের কমিটি বা কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো পদ্ধতির সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল নন।' (পৃ. ৭৮) মওদুদ অত্যন্ত খাঁটি কথা বলেছেন। ব্যক্তিগত ঘরানার শাসনপদ্ধতি বাংলাদেশের সব গণতান্ত্রিক সরকারে দেখা গেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি ৮৩ পৃষ্ঠা থেকে ৮৮ পৃষ্ঠার মধ্যে সংসদবিষয়ক আলোচনা শেষ করেছেন। এটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও শাসনগত ব্যবস্থায় সংসদের গুরুত্ব নির্দেশ করে। রাজনৈতিক দলগুলো সরকার ও বিরোধী দলনির্বিশেষে কী করে সংসদকে কার্যকর করার সুযোগ হাতছাড়া করেছে সেই দুঃখগাথা তিনি চিত্রিত করেছেন। সংসদীয় কমিটিগুলোকে শ্বেতহস্তী করে রাখতে সব দলের ভূমিকার কথাও তিনি অকপটে বলেছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে তিনি আইনসভার সংস্কার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কিন্তু তাতে মৌলিক বিষয়গুলোর আলোচনা নেই বললেই চলে। সেখানে ধূমপানবিরোধী পদক্ষেপ উল্লেখ আছে। ভূমি সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা আছে, ঋণখেলাপিদের কথা আছে কিন্তু সেখানে নেই দণ্ডপ্রাপ্তদের নির্বাচনে অযোগ্য করার উপযুক্ত আইন প্রণয়নে সংসদীয় ব্যর্থতার কথা। দণ্ডপ্রাপ্তরা নির্বাচন করবেনই। আর তাঁরা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কখনো দেবেন না। কারণ রাজনীতিকদের কারাগারে যাওয়াকে সব আমলের বিরোধীরা রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন মনে করেন। আর তাঁদের এই মনে করাটা যাতে কখনো মানুষের চোখে গ্রহণযোগ্যতা না হারায় সেটা প্রত্যেকে মনে রাখেন। এর যোগফল হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না দেওয়া।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আইনি ব্যবস্থার সংস্কার, দ্রুত বিচার আইন ও ট্রাইব্যুনাল, দেওয়ানি আইন সংস্কার, বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা, মামলার দীর্ঘসূত্রতা ও খরচ, মামলা ব্যবস্থাপনা, আদালত প্রশাসন আর বার কাউন্সিল নিয়ে আলোচনা আছে (পৃ. ১৩৪-১৩৯)। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে ১৩৯ পৃষ্ঠায় মওদুদের বক্তব্য সত্যের অবলোপন বলে মনে হওয়ার যৌক্তিক কারণ রয়েছে। তাঁর এই অসতর্কতা মার্জনা করা চলে না বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ তিনি খুব ভালো করেই জানেন ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিচার বিভাগ পৃথককরণের বিধানগুলো চতুর্থ সংশোধনীতে কেড়ে নেওয়ার পর তা আর পুরোপুরি কখনোই ফিরিয়ে দেওয়া

হয়নি। এই বিষয়ে অন্তত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের তিনটি রায় আছে। পঞ্চম সংশোধনী মামলার রায়েও বলা আছে, বাহাত্তরের ১১৬ অনুচ্ছেদকে অবিকল ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত অধস্তন আদালতের স্বাধীনতা বাংলাদেশে দূরবর্তী ঢোলের শব্দ হয়েই থাকবে। কারণ ১১৬ অনুচ্ছেদ সুপ্রিম কোর্টকে বিচারক নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে পুরো ক্ষমতা দিয়েছে। আর এটা এখন অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে সরকার। অথচ মওদুদ কী অবলীলায় লিখেছেন, 'বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট তার ম্যাজিস্ট্রেসি এবং অধস্তন আদালতগুলো সংবিধানের আওতায় পুরোপুরি এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে। আদালতের কক্ষগুলোতে তাদের অলঙ্ঘনীয় স্বাধীনতা কখনো প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি।' এটা একেবারেই অসত্য। জামিন পেতে একজন জন পিলজারের ই-মেইল কি কাজে লাগার কথা?

মওদুদ আহমদ অবশ্য ১৪৮ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন তাতেই তাঁর বক্তব্যকে সাংঘর্ষিক করে তোলে। বিচার বিভাগ পৃথক্করণের প্রসঙ্গের উপশিরোনাম দিয়েছেন ব্যর্থতা। তবে এখানে অকপট সত্য উচ্চারণ করে বলেছেন, 'রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গ থেকে বিচার বিভাগকে যে পৃথক হতে হবে, সেই মৌলিক উপলব্ধি প্রধানমন্ত্রীসহ জ্যেষ্ঠ মন্ত্রীদের মধ্যে প্রায় অনুপস্থিত বলা চলে। এই পৃথকক্রণের প্রক্রিয়ায় রাজনীতিকদের চেয়ে আমলাতন্ত্রই চরম শৈথিল্য দেখিয়ে থাকে।' মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কে মওদুদের পরিহাস ও প্রহসনমূলক মন্তব্য নাটকীয় পর্যায়ে উন্নীত হয় যখন তিনি বলেন, একটি কেবিনেট কমিটি মানবাধিকার কমিশন গঠনে অর্ধডজন বৈঠকের পর বিয়োগান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ থাকে। চার বছর ধরে আন্তমন্ত্রণালয় চিঠি চালাচালির পর এক-এগারো সরকার তাদেরই খসড়া কাজে লাগিয়ে মানবাধিকার কমিশন গঠন করে, যদিও তখন মৌলিক অধিকার স্থগিত ছিল।

মওদুদ আহমদ মনে করেন, ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকারবিরোধিতার রাজনীতিতে আরও তীব্রতা এনেছিল। তারা ত্রিমাত্রিক আক্রমণ পরিচালনা করেছিল। এর প্রথমটিতে রয়েছে শেখ হাসিনার মনস্তাত্ত্বিক বিরোধিতা। তিনি কিছুতেই বিএনপির নিরঙ্কুশ বিজয় মেনে নিতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, তারা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সততা ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং এর পরিবর্তন দাবি করে। তৃতীয়ত, বিরোধী দল একটি আন্তর্জাতিক প্রচারণা শুরু করে, যার লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে একটি 'ধর্মীয়' রাষ্ট্র, একটি 'ইসলামি মৌলবাদী' রাষ্ট্র, একটি 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' হিসেবে চিত্রিত করা। তাঁর কথায়, তারা তালেবানদের সম্পৃক্ত করে যে বক্তব্য নিয়ে আসে তার পটভূমিতে অবশ্য হরকাতুল জিহাদ এবং মুফতি হান্নান, আবদুর রহমান ও বাংলা ভাইয়ের মতো ব্যক্তির নেতৃত্বে হরকাতুল জিহাদ ও জামাআতুল মুজাহিদীনের মতো সংগঠনের

উত্থান ঘটে। যদিও এদের অধিকাংশের উত্থানের সূচনা ঘটেছিল আওয়ামী লীগ যখন সরকারে ছিল তখন। (পৃ. ৪২৬) কিন্তু মওদুদ এটা বলতে ভুলে গেছেন যে জেনারেল এরশাদ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে একটি প্রেক্ষাপট তৈরির অশুভ সূচনা করেছিলেন আর তিনিও সেই প্রক্রিয়ার অংশীদার ছিলেন। শাসকেরা প্রত্যেকে নিজের মতো করে ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। এই শক্তির সঙ্গে সংকীর্ণ স্বার্থে আপস করেছেন।

এটা লক্ষণীয় যে মওদুদ স্বীকার করেছেন যে বিএনপি সরকার ওই মৌলবাদী সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করতে দেরি করে ফেলেছিল। 'কিন্তু বিএনপির শাসনের শেষ বছরে উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে, যার ফলে শীর্ষ নেতাদের কার্যকর বিচার ও তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া সম্ভব হয়। এটা দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। বিএনপির নেওয়া অনেক কঠোর পদক্ষেপের ফলে পরিস্থিতি সাফল্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।'

এটা লক্ষণীয় যে ২০০১-এর সাধারণ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রশ্নটি মাঝে মাঝে যথেষ্ট বিরতি দিয়ে উল্লেখ করেছে। কিন্তু মওদুদ ৪২৬ পৃষ্ঠায় দেখিয়েছেন, নির্বাচনে হারার দিনটি থেকেই আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার পুনর্গঠনের আন্দোলন শুরু করে এবং তারা 'সত্যিকারের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের' জন্য একটি প্যাকেজ প্রোগ্রাম নিয়ে আসে। নাগরিক সমাজেরও বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব তোলে। কিন্তু তিনি এটা বলেননি যে কেন তিনি এর প্রতি উদাসীন ছিলেন? তাঁর এ ধরনের উদাসীনতার কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। সচেতনভাবে হোক আর অসচেতনভাবেই হোক, তাঁর গৃহীত বিচারকদের বয়সসীমা বাড়ানোর পদক্ষেপ প্রকারান্তরে সেই সংবেদনশীলতাকেই বহুলাংশে উসকে দিয়েছে।

মওদুদের ভাষায়, '২০০৪ সালের মার্চে চতুর্দশ সংশোধনী পাসের পর সংস্কারের দাবি আরও জোরালো হয়ে ওঠে। ওই সংশোধনীতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অবসরের বয়সসীমা ৬৫ থেকে ৬৭তে উন্নীত হয়। আওয়ামী লীগ ব্যাখ্যা দেয় যে বিচারপতি কে এম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরবর্তী প্রধান উপদেষ্টা পদে যোগ্য করে তুলতেই ওই সংশোধনী আনা হয়েছে। বিচারপতি হাসান যদিও ২৫ বছর আগে বিএনপির একজন সদস্য ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনোই বিএনপির সক্রিয় কর্মী ছিলেন না। অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারক হিসেবে প্রায় ১০ বছর এবং প্রধান বিচারপতি পদে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে বার এবং বেঞ্চে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন। তাঁর সততা, নিরপেক্ষতা কিংবা কোনো রাজনৈতিক পক্ষপাত নিয়ে কখনোই প্রশ্ন তোলা

হয়নি। কিন্তু আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির সংস্কারের অনুকূলে এই সংশোধনীকে ব্যবহার করে। ২০০৫ সালের ১৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী তাঁর সমাপনী ভাষণে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের ধারণাকে বিতর্কিত এবং বাইরের শক্তির স্বার্থে দেশকে অস্থিতিশীল করতে বিরোধী দলকে অভিযুক্ত করেন। যেহেতু রাজপথ নয়, সংসদই সংবিধান সংশোধনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার উপযুক্ত স্থান, তাই প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলকে সংসদে এসে নির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার কী সংস্কার লাগবে তা সংসদে এসে বলতে আবেদন রাখেন (পৃ. ৪২৭)।'

এখানে আমরা লক্ষ করি, মওদুদ নিজেকে একজন ম্যাকিয়াভেলীয় রাজনীতিক হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাঁর শিক্ষাবিদ হওয়ার জায়গাটি কিছুটা হলেও প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে পড়েছে। কারণ বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের অভিযাত্রায় এটা রীতিমতো অপ্রিয় বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সরকারি দল সংবিধান ও সংসদকে যে চোখে দেখে, সেভাবে বিরোধী দলের পক্ষে সংবিধান কিংবা সংসদকে দেখার কোনো সুযোগ নেই। সরকার যার সংবিধান ও সংসদ তার। একেবারে খাসতালুক।

পদ্ধতিগত সাংবিধানিক গলদের কারণেই বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা যেভাবে নির্বাহী বিভাগের প্রতিকূলে একটি ওয়াচডগ হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, বাংলাদেশে সেটা সম্ভব নয়। মওদুদ এই বিষয়টি স্বীকার না করে প্রকারান্তরে নিজেকে সরকারদলীয় একজন চিরায়ত মুখপাত্র হিসেবে চিত্রিত করেছেন বলেই প্রতীয়মান হয়। এটা অবশ্য তাঁর জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারেও হতে পারে। '৯৬ প্রহসনের নির্বাচনের পরে ত্রয়োদশ সংশোধনী আওয়ামী লীগ সংসদে এসে দেয়নি। তবু তাঁরা স্বেচ্ছায় দিয়েছিলেন বা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মওদুদ ৪২৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '২০০৫ সালের ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচনী আইনসমূহ সংস্কার না করলে নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। তাদের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির বৈঠক শেষে এই ঘোষণা আসে। কিন্তু কী সংস্কার করা হবে তার বিবরণ তারা দেয়নি। এটা অনেকটা সরকারের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবেই মনে হয়েছে। ২০০৫ সালের মাঝামাঝি যদিও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কারে ৩১ দফা প্রস্তাব দেয়।' আমরা দেখি, মওদুদ এই ৩১ দফা বিএনপির পক্ষে বিবেচনার জন্য দ্রুততার সঙ্গে গ্রহণ না করার অপারগতার জন্য আক্ষেপ করেননি। এ জন্য তাঁর কোনো অনুশোচনা নেই। একজন টিপিক্যাল বাংলাদেশি রাজনীতিকের মতোই তিনি যুক্তি দিচ্ছেন, '১৪-দলীয় জোটের ওই প্রস্তাবগুলো সভা-সেমিনার ও জনসভায়

আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা সংসদে তোলেননি।' তিনি বলেন, সরকারি নেতারা বারবার তাদের প্রস্তাবগুলো সংসদে উত্থাপনের আহ্বান জানালেও তা করা থেকে তাঁরা বিরত ছিলেন।' অথচ বিএনপি ওই সময় ১৪-দলীয় জোটের সংস্কার প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি সংসদীয় কিংবা দলীয় পর্যায়ে একটি কমিটি বা কমিশন গঠন করতে পারত এবং সে অনুযায়ী তারা সংসদে প্রস্তাব আনতে পারত। কিন্তু তারা কেবলই একটি টেকনিক্যাল যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে ক্ষমতালিপ্সা আড়াল করার চেষ্টা করেছে। মওদুদ লিখেছেন, '১৪-দলীয় জোট শর্ত দেয় যে সরকারের সঙ্গে এ-সংক্রান্ত আলোচনার আগে তাদেরকে এ বিষয়ে "নীতিগতভাবে প্রস্তাব মানার" ঘোষণা দিতে হবে।' অথচ গণতন্ত্রের চর্চা করলে আওয়ামী লীগের ৩১ দফার পুরোটা অবিকল না হলেও এর আংশিক বা উল্লেখযোগ্য অংশের বিষয়ে নীতিগত সম্মতি জানালে মহাভারত অশুদ্ধ হতো না এবং সেটাই ছিল গণতন্ত্রের দাবি। মওদুদ সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। তিনি লিখেছেন, 'আওয়ামী লীগ সেদিকে না গিয়ে সরকারকে আলটিমেটাম দিল, তারা বলল, তাদের প্রস্তাব না মানলে তারা সরকার পতনের আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে। সংসদের পাঁচটি অধিবেশনের ৪৩৭ দিবস বয়কট শেষে ২০০৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ সংসদে যোগ দিল। শেখ হাসিনার জন্য এটা ছিল তার নিজের আসন রক্ষার্থে অধিবেশনে যোগ দেওয়া। কারণ সংবিধান অনুযায়ী একটানা ৯০ কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকার কারণে শেখ হাসিনার সদস্যপদ শূন্য হতে আর মাত্র দুদিন বাকি ছিল।'

মওদুদ আবারও টেকনিক্যাল দিকটি তুলে ধরতে বিস্মিত হননি। এই অপকৌশল তাঁরাও ব্যবহার করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'সরকারকে তুলাধোনা করতে শেখ হাসিনা ৫৫ মিনিটের ভাষণ দিলেন এবং একই সঙ্গে ১৪-দলীয় জোটের পক্ষে ৩১ দফার প্যাকেজ সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। অথচ পার্লামেন্টে ১৪টি দলের মধ্যে ১৩টির কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না।' কিন্তু সংস্কার প্রস্তাবে সংসদের প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে কোনো ধরনের গণতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা আছে কি না সে বিষয়ে তাঁর কোনো বক্তব্য অনুপস্থিত। ১৪ দল না বলে কেবল আওয়ামী লীগের দেওয়া প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়েও সেটাকে আলোচনার জন্য গ্রহণ করার যথেষ্ট যুক্তি ছিল।

মওদুদ যুক্তি দিচ্ছেন, '৩১ দফার সংস্কার প্যাকেজে প্রকৃতপক্ষে ৫১টি প্রস্তাব ছিল এবং এগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন, নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন এবং নির্বাচনী আচরণবিধি-সংক্রান্ত। ৫১টির মধ্যে ১৪টি ইতিমধ্যেই বিদ্যমান বিধিতে যুক্ত করা হয়েছিল এবং অন্য ২৪টির বিষয়ে মেনে নিতে তেমন কোনো বিরোধই ছিল না।' ভোট গ্রহণের এক মাস আগে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের তালিকা প্রকাশ,

স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স প্রবর্তন, প্রার্থীদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশ, ব্যাংকের ঋণখেলাপিদের মনোনয়ন না দেওয়া, কালোটাকার মালিক ও সন্ত্রাসীদের মনোনয়ন না দেওয়া, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সব দলের সমান সুযোগ, সব প্রার্থীর জন্য সমান সুবিধা ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন মওদুদ। এরপর তিনি লিখেছেন, 'বাকি ১৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ১০টি সংশোধন করতে হলে সংবিধান সংশোধন লাগে এবং বাকি তিনটির জন্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি পরিবর্তন করা দরকার। সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিল তাদের কিছু প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য যে সময় দরকার তা পাওয়া যাবে না। কিছু ছিল অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বিবেচনায় অবাস্তব।' এগুলোর মধ্যে মওদুদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে তাঁর দল থেকে আলাদা তা বোঝা যায় না। এখানে তিনি বিএনপির নেতা হিসেবে আওয়ামী লীগকে যেন মাঠে মোকাবিলা করেছেন।

মওদুদ বলেছেন, 'পরিচয়পত্রসহ তথ্যভিত্তিক ভোটার তালিকা এবং ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা চালুর সঙ্গে সময় ও অর্থ জড়িত। যদিও নীতিগত কোনো আপত্তি নেই।' এটা ছিল ২০০১ বা তারও আগের কাজ। যা তারা করেনি।

এরপর মওদুদ সংবিধান সংশোধনের জায়গায় এসেছেন। তিনি লিখেছেন, 'এর মধ্যে দুটো মানতে কোনো বিতর্ক নেই এবং তা অনেকাংশে আইন সংশোধন করেই পূরণ করা সম্ভব। এর একটি হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে একটি পৃথক নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা। যে সচিবালয় তাদের উপজেলা অফিস পর্যন্ত নিজেদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে। দ্বিতীয়ত সংসদে অনুমোদনের পর বাজেট অনুযায়ী চলতে কমিশন সম্পূর্ণভাবে আর্থিক স্বাধীনতা ভোগ করবে। বাকি আটটির মধ্যে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি অনুযায়ী উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য, পার্বত্য পরিষদের স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য একটি নতুন ভোটার তালিকা তৈরি। নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্মের ব্যবহার, ধর্মভিত্তিক প্রচারণা কিংবা প্রকাশনা কিংবা ধর্ম ব্যবহার করে ভোট চাওয়া এবং সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা। এটা তারা চেয়েছিল প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে।' এই প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এটা প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছিল, কারণ বিএনপি মহিলা আসন ইতিমধ্যেই ৩০ থেকে ৪৫ আসনে উন্নীত করেছিল।' অথচ নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে এই উন্নীতকরণ ছিল ঠুনকো। ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছাপূরণের হাতিয়ার।

এখানেও আমরা দেখি, মওদুদ নিজেকে একজন দলীয় রাজনীতিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঊর্ধ্বে তুলতে পারেননি। কারণ তিনি এই ব্যাখ্যা দেননি যে নারীদের সংরক্ষিত আসন যে ১৫টি উন্নীত করা হবে, এই আলোচনা তাঁরা কবে থেকে শুরু করেছিলেন এবং তখন এ বিষয়ে বিরোধী দলের মতামত গ্রহণের জন্য তাঁরা আদৌ

কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন কি না। মওদুদ এমন ভাব প্রকাশ করেছেন যে ওই সময় পর্যন্ত যদি নারীদের আসনে সংশোধনী না আনা হতো, তাহলে তাঁরা আওয়ামী লীগের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের প্রস্তাবটি বিবেচনা করতে পারতেন। কিন্তু বিষয়টি যে তা মোটেই নয়, আওয়ামী লীগের প্রস্তাব এবং বিএনপির প্রস্তাবের মধ্যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিগত যে কোনো পার্থক্য নেই—তার প্রমাণ আমরা পরবর্তীকালে পেয়েছি। আমরা দেখেছি, আওয়ামী লীগ প্রত্যক্ষ ভোটে নারীদের নির্বাচনের ব্যবস্থাসংবলিত বিধান সংবিধানে সংযোজন করেননি। আরও লক্ষণীয় যে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে বিএনপি কেন অপারগ থেকেছিল সে বিষয়ে এখানে তিনি কোনো ব্যাখ্যা দেননি। ধর্মভিত্তিক প্রচারণা প্রতিরোধে বিএনপি কেন অপারগ ছিল, এই প্রশ্নের উত্তর জানাটাই ছিল সবচেয়ে জরুরি অথচ মওদুদ ঠিক এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখাই শ্রেয় মনে করেছেন।

৪২৯ পৃষ্ঠায় মওদুদ লিখেছেন, 'আওয়ামী লীগের ৩১ দফার প্রস্তাবের আরও দুটি বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। এ দুটি বিষয় হলো যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে এবং যুদ্ধাপরাধের জন্য দোষী তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। পরিহাস হচ্ছে, আওয়ামী লীগ সরকারের ১৯৭২-৭৫ আমলে যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আইন করেছিল, তারাই পরে তা পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছিল। তারা কাউকে বিচারের আওতায় আনেনি কিন্তু তারা এখন এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়েছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রকৃতপক্ষে তারা সংস্কারের যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছে তার বাস্তবায়ন তারা চায় না। তারা তাদের প্রস্তাবের ৫ক'তে এমন প্রস্তাব এনেছিল, যার জন্য সংবিধানের সংশোধন দরকার ছিল।'

মওদুদের উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গি সর্বতোভাবে অগ্রহণযোগ্য। এটা লক্ষণীয় যে আওয়ামী লীগের ওই দাবি অবাস্তব, নীতিহীন কিংবা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত কিংবা অপ্রয়োজনীয় বলে অভিমত তিনি দেননি। তিনি যদি এখানে তাঁর ব্যক্তিগত এবং দলের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে যদি নিরপেক্ষ মতামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারতেন, তাহলে সেটা অধিকতর যুক্তিসংগত বলে গণ্য হতো। এটাও লক্ষণীয় যে ওই ৫ক'তে কী বিষয়ে আওয়ামী লীগ প্রস্তাব করেছিল মওদুদ তা উল্লেখ করেননি। আমরা এর ইতিবাচক দিক লক্ষ করব। আমরা ধরে নেব মওদুদ ওই প্রস্তাবের শক্তি অস্বীকার করতে পারেননি।

আওয়ামী লীগের চারটি প্রস্তাব তিনি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা দরকার, কারণ পরবর্তীকালে তা জাতীয় রাজনীতির মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে গণ্য হয়। আর সে জন্য দরকার ছিল সংবিধানের উল্লেখযোগ্য সংশোধনী।

১। রাষ্ট্রপতি সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনার পর সর্বসম্মত কিংবা মতৈক্যের ভিত্তিতে একজন ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন, যাঁরা জনগণের চোখে আস্থাভাজন ও বিশ্বাসী ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে গণ্য হন।

মওদুদ সেই আক্ষরিক পথটিই বেছে নিয়েছেন, তিনি চেতনাগত তাৎপর্যকে অনেকাংশেই এড়িয়ে গেছেন। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁর আলোচনায় উঠে আসেনি। এটি এমন একটি বিষয় ছিল, যার সঙ্গে যেকোনো সরকারি দলের নীতিগতভাবে সম্মত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। যেমনটা ২০১৪ সালে এসে বিএনপি নিশ্চয় হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। যার প্রমাণ মওদুদ নিজেই ২০১২-১৩ সালে এসে দেখিয়েছেন। কারণ তিনি আওয়ামী লীগকে লক্ষ্য করে ওই একই কথা বলেছেন এবং বলছেন।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে বলেছিলেন, বর্তমান সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই নির্বাচনকালীন সরকারের বিষয়ে সরকারি দলের সঙ্গে সমঝোতায় আসা সম্ভব। কিন্তু সে জন্য সর্বাগ্রে দরকার সরকারি দলের পক্ষ থেকে নীতিগত সম্মতি। মির্জা ফখরুলের এই বক্তব্য অবশ্যই যুক্তিসংগত। যেভাবে যুক্তিসংগত ছিল আওয়ামী লীগের ৩১ দফা দেওয়া ওই প্রস্তাব। বিএনপি সেটি আদৌ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। অথচ মওদুদ যুক্তি দিচ্ছেন, 'সরকারের জন্য এটা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, কারণ তা ছিল সাংবিধানিকভাবে অসমর্থনযোগ্য একটি ফর্মুলা। কারণ প্রায় ১০০টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে কোনো রাষ্ট্রপতির পক্ষে সর্বসম্মতভাবে কারও বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। এ রকম বিধান কোনো কাজ তো করবেই না, বরং এটা অবাস্তব। এতে একটা নৈরাজ্যকর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে দেশকে একটি ভয়ংকর অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দেবে । কোনো আইনবিদ কিংবা সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ সংবিধানে এ ধরনের অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত বিধান সংযোজনের প্রস্তাব মেনে নেবেন না।' যাঁরা ইয়াজউদ্দিনের মতো একটি বিতর্কিত সরকারব্যবস্থার অবতারণা ঘটিয়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে সে ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন, আলোচনার ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়।

এবার মওদুদ আমাদের জানাচ্ছেন, বিএনপি সরকার এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল যে ৯০ দিনের অন্তর্বর্তীকালে কোনো সংসদীয় সরকারের অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং বিরোধী দলের দাবির কোনো ভিত্তি ছিল না। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে রাষ্ট্রপতিই একমাত্র নির্বাচিত ব্যক্তি হিসেবে

থাকেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সীমিত সময়ে নীতিনির্ধারণী কোনো সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে কেবল রুটিন কাজ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন মূলত একটি সামগ্রিক শাসনপদ্ধতি বা সুশাসনের অংশ হিসেবে গণতান্ত্রিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত। যে দলীয় সরকার অসংকীর্ণ নির্দলীয় নিরপেক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেই শাসনকার্য চালাতে পারে, সংসদের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে, তারাই অবাধ নির্বাচন দিতে পারে। বাংলাদেশ প্রথমটা না পারলে কখনো সুষ্ঠু নির্বাচনও করতে পারবে না।

ব্রিটেনে আমরা সিরিয়ায় সেনা প্রেরণ প্রশ্নে হাউস অব কমনসে ক্ষমতাসীন দলকে পরাস্ত হতে দেখলাম। এভাবে চলতে পারলে দলীয় সরকারের পক্ষে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন শুধু নয়, জাতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানও সম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশে ওয়েস্টমিনস্টার মডেলে এর সব কটি প্রায় অনুপস্থিত বা কোনো না কোনোভাবে বিতর্কিত। তাই মওদুদ আহমদের বিস্ময় ও বিশ্লেষণের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি না। একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে মওদুদ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেন, অথচ জনসাধারণকে শাসনের সময় সেই ভারসাম্যের কোনো প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন না। তাঁর এ-সংক্রান্ত বক্তব্য খণ্ডিত এবং তা অনেকাংশে বিএনপির রাজনৈতিক অবস্থানকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত ও প্রণোদিত। তিনি লিখেছেন, 'রাষ্ট্রপতি যাতে অন্তর্বর্তীকালে একজন অভিভাবক হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন সে জন্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একটি চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স আনা অপরিহার্য।'

মওদুদ ৪৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল 'সিইসি ও অন্যান্য কমিশনারগণ সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে নিয়োগ করতে হবে।' মওদুদ একেও আক্ষরিক অর্থে নিয়ে অবাস্তব ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর যুক্তি, সংবিধানে এমন বিধান আরোপ করা যাবে না, যা বাস্তবায়নের অযোগ্য এবং দেশে সেটা নৈরাজ্য ডেকে আনবে।

মওদুদ যেহেতু আক্ষরিক অর্থে বিরোধী দলের প্রস্তাবগুলোকে গ্রহণ করেছেন, তাই তাঁর যুক্তিকে আক্ষরিক হিসেবে গ্রহণ করলে তার একটা যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল থেকেই রাষ্ট্রগঠনের মৌলিক শর্তাবলি পূরণ না করার সংকটে ভুগছে। মওদুদের লেখায় এ প্রসঙ্গে সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন সত্ত্বেও কী করে সর্বময় ক্ষমতা কেবল প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল এবং সেটা আমাদের শাসনগত ব্যর্থতা কিংবা সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে কী প্রভাব রেখেছে তার একটা আলোচনার যে প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছিল, সে ক্ষেত্রেও অনেকটা

নিরাশ হতে হয়েছে। সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে এক দীর্ঘ আলোচনায় মওদুদ আমাকে বলেন যে বাহাত্তরের সংবিধানের খসড়া তৈরির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না।

ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ সামরিক শাসনামলে আরও গুরুতর রূপ নিয়েছে এবং সামরিক শাসন থেকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উত্তরণে যেসব বেসামরিক রাজনীতিক অগ্রণী ও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছেন, মওদুদ তাঁর অন্যতম। আমরা জানতে পারি না জিয়াউর রহমান এবং হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে গণতন্ত্রে উত্তরণে সহায়তা দিতে গিয়ে তিনি নিজে কতটা কিংবা অন্য আর কাউকে আদৌ যৌথ নেতৃত্বের ধারণা গ্রহণ করাতে ভূমিকা রেখেছিলেন কি না। মসিউর রহমান যাদু মিয়ার সঙ্গে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সম্পাদিত একটি গোপন লিখিত চুক্তিতে যৌথ নেতৃত্বের চেতনা সমুন্নত রাখা হয়েছিল। এবং মওদুদ নিজেই লেখকের কাছে স্বীকার করেছেন সর্বময় ক্ষমতা যাতে জিয়াউর রহমানের হাতে থাকে সেই বিতর্কে তিনি যাদু মিয়াকে নয়, জিয়াউর রহমানকে সমর্থন করাই তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বাস্তবসম্মত মনে করেছিলেন।

কিন্তু এ কথা আর অস্বীকার করা চলে না যে, যে ত্রয়োদশ সংশোধনী ১৯৯৬ সালে সংবিধানের দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল, সেটা কোনোভাবেই আদর্শগতভাবে গণতন্ত্রসম্মত ছিল না। বরং একে বাংলাদেশি মানের গণতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। বিশেষ করে মাত্র দুটি নির্বাচন সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে লাভ করার বিনিময়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের ক্রমেই রাজনৈতিকীকরণ আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল। সংক্ষেপে সুপ্রিম কোর্টের শুদ্ধতার বিনিময়ে আমরা দুটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন পরিচালনা করতে পেরেছি এবং তত্ত্বগত দিক থেকে এই ধরনের ব্যবস্থার ভেঙে পড়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। মওদুদের আলোচনায় এই বিষয়ে কোনো স্বীকৃতি নেই। অথচ তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে লিখেছেন, 'বিরোধী দলের সংস্কার প্রস্তাবগুলো গ্রহণযোগ্যতার চরম সংকটে পড়েছে এবং ব্যাপকভিত্তিক জনসমর্থন কুড়াতেও তা ব্যর্থ হয়েছে।' এখানেও আমরা দেখি, ব্যাপকভিত্তিক জনসমর্থন কথাটিকে তিনি বাংলাদেশের নিম্ন ও ভঙ্গুর রাজনৈতিক সংস্কৃতির বাতাবরণেই মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছেন। বাংলাদেশকে ব্যাপকভিত্তিক সাংবিধানিক ও শাসনগত সংস্কারের দিকে যেতে হলে রাজনীতিবিদদেরই ইতিহাসের কোনো না কোনো পর্বে সংসদের ফ্লোরে বসতে হবে। আলোচনার টেবিলে মৌলিক বিষয় মেনে নিয়েই সমাধানসূত্র খুঁজে বের করতে হবে। বিশ্বের যেসব রাষ্ট্র ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, বিচার বিভাগের পৃথক্করণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বায়ত্তশাসনের ধারণা তাদের জাতীয় রাজনীতির দেহে প্রতিস্থাপন করেছে, তারা কিন্তু এসব কাজ করার আগে 'ব্যাপকভিত্তিক জনসমর্থন' যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা মনে করেনি।

কিংবা তাকে বাস্তবসম্মত বলেও গণ্য করেনি। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আপনাআপনি শপথ গ্রহণের যে বিধান রাখা হয়েছিল, সেই বিষয়ে দেশের সচেতন মহল ত্রয়োদশ সংশোধনী পাসের সময়ই খুব বড় মুখ করে আপত্তি তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল। তারা তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারেনি। প্রয়াত বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে এ বিষয়ে তাঁর অনীহা প্রকাশ করতে দীর্ঘ সময় নিতে দেখেছিলাম। তাঁরা বলেছেন, এটা হচ্ছে রাজনীতিবিদদের পারস্পরিক অনাস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। অথচ মওদুদ লিখেছেন, বিরোধী দলের প্রস্তাবগুলো জনগণের ব্যাপক সমর্থন পায়নি, তার কারণ ত্রয়োদশ সংশোধনীর আওতায় ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কোনো রাজনৈতিক দল এই পদ্ধতির কোনো ত্রুটি সম্পর্কে অভিযোগ করেনি। কিন্তু তার উল্লেখ করা উচিত ছিল যে সুনির্দিষ্টভাবে না হলেও এই ব্যবস্থা যেকোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হতে পারে না, তার একটা পরোক্ষ স্বীকৃতি আওয়ামী লীগ মহল থেকে একেবারেই যে অনুচ্চারিত থেকেছে, তা নয়। এর প্রমাণ, ক্ষীণস্বরে এবং অনির্দিষ্টভাবে হলেও তিন মেয়াদের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটা কথা তারা বলেছিল।

মওদুদ ঠিকই লিখেছেন, '১৯৯৬ সালে এই নতুন ব্যবস্থার আওতায় আওয়ামী লীগ জয়ী হয়েছিল। ২১ বছর ক্ষমতা থেকে দূরে থাকা দলটি সরকার গঠন করতে পেরেছিল। তারা তাদের আমলে এই পদ্ধতির কোনো সংস্কারের কথা বলেনি। ২০০১ সালের নির্বাচনের আগেও আওয়ামী লীগ এই ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলেনি এবং নির্বাচনে জয় লাভের আশায় নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পরই তারা কেবল অভিযোগ তুলতে শুরু করে। রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রত্যেক কর্মকর্তার দিকে তাদের অঙ্গুলি নির্দেশিত হয়। তাদের অভিযোগ, তারা প্রতারিত হয়েছে এবং এই পদ্ধতির পরিবর্তন দাবি করে। তাদের উচিত ছিল এই ব্যবস্থার পরিবর্তন আনার উদ্যোগ ক্ষমতায় থাকাকালেই গ্রহণ করা।' তার এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করি। কারণ আওয়ামী লীগ যদি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতি হুমকি বিবেচনায় নিয়ে কাঠামোগত সংস্কারের দিকে যাত্রা শুরু করতে পারত এবং তারই অংশ হিসেবে নির্বাচনসংক্রান্ত বিধিবিধানের পরিবর্তন আশা করত, তাহলে সেটা নিশ্চয় ব্যাপকভিত্তিক জনসমর্থন পেত। কিন্তু মওদুদ যেভাবে বিএনপিকে সংস্কার করতে বলার কারণকে চরমভাবে অযৌক্তিক বলেছেন, সেটা কোনো তর্ক ছাড়াই গ্রহণ করা কঠিন। মওদুদ বলেছেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সংস্কারে বিরোধী দলের প্রস্তাব তোলার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি করা, যাতে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।'

মওদুদের এই সরলীকরণকে নাকচ করা যাবে না। বিরোধী দল কোনো

শাসনগত সংস্কারের শুদ্ধাচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংস্কারের প্রস্তাব তোলেনি। আবার এও ঠিক বিএনপি একে নাকচ করেছিল গণতন্ত্র নষ্ট হবে বলে নয়; বরং ক্ষমতা কুক্ষিগত করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। ত্রয়োদশ সংশোধনীর কারণে বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক বিপর্যয় দেখে আওয়ামী লীগ নয়, বিএনপিও উদ্বিগ্ন ছিল না। সত্যি বলতে কি, এমন কোনো সংস্কার বা এমন কোনো আইনি কাঠামোর পরিবর্তন দুই প্রধান দল কোনো পর্বেই আশা করে না, যা থেকে তারা তাৎক্ষণিক কোনো ফায়দা লাভ করতে না পারে। সোজা কথায় ভোটের বাক্সে ফল তোলা যাবে না, বরং তা ব্যাহত হতে পারে এমন কোনো সংস্কারে তাদের কারও কোনো রুচি নেই। অথচ সরকারি দল হিসেবে বিএনপি ২০০৫ সালেই বিরোধী দলের সংস্কার প্রস্তাবের আলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে সংলাপে জড়িত হতে পারত। সেটা সংসদের ভেতরে কিংবা বাইরে একযোগে কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে চলতে পারত। যখন তারা বিচারপতি কে এম হাসানের বয়স বাড়িয়েছিল সেই সংশোধনীর বিষয়ে তারা বিরোধী দলের সমর্থন আদায়ে সব রকম প্রচেষ্টাই নিতে পারত এবং এটাও সত্য যে বিচারপতিদের বয়সসীমা বাড়ানোর বিষয়টি কেবল মওদুদের দুরভিসন্ধির আলোকে দেখা ঠিক হবে না। কারণ, বয়স বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতিরা যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা রাখছিলেন এবং এই বিষয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নির্বিশেষে সব মতাদর্শের বিচারকদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বিএনপি এটা কেবল বিচারকদের জন্যই করেছিল তার প্রমাণ দিতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। এই ব্যর্থতার ব্যক্তিগত দায়ভাগ মওদুদকে অনেকটা নিতে হবে।

দ্বাদশ সংশোধনী পাসের সময় বিএনপি যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, সেটা অনুসরণযোগ্য। তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগকে সম্পৃক্ত করতে যথেষ্ট প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। এমনকি বিচার বিভাগ পৃথক্করণ-সংক্রান্ত একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি ২০টির বেশি বৈঠকে মিলিত হয়েছিল। সুতরাং এ কথা সত্য নয় যে সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তনের পর দেশের প্রধান বিরোধী দলের পক্ষে সংবিধান সংস্কারে কোনো নিয়মতান্ত্রিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বরং বিএনপি তাকে বাস্তবে রূপ দিতে ব্রতী হয়নি।

২০০৫ সালের সংস্কার প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে সরকারি দলের পক্ষে সংসদে বিল আনার কৌশল গ্রহণ করার বিকল্প খোলা ছিল। বিরোধী দল সংসদে বিল জমা দেয় না, তার কারণ, সরকারি দলের সমর্থন ছাড়া তা পাস হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তেমনি এ কথাও সত্য নয় যে সরকারি দলের বিল আনা মানেই বিরোধী দলের কাছে তাদের পরাজয় কিংবা সেই বিল সংসদে তোলা হলে তা তাদের পাস করতে কোনো বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়। মওদুদ যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে বোঝা যায়,

তাঁরা বিরোধী দলের স্পর্শকাতরতা কিংবা কৌশলগত রাজনীতির গভীরতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন কিংবা নিজেকে সেভাবে প্রতিপন্ন হতে দিয়েছেন। তাঁরা সেদিন খুব সহজেই বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনার কৌশলগত সংসদ অধিবেশনে যোগদানকে কটাক্ষ করার দিকে মনোনিবেশ না করে তাঁর প্রস্তাবের আলোকে স্পিকারকে দিয়ে যৌথ কমিটি গঠনের আন্তরিক কিংবা কৌশলগত উদ্যোগ নিতে পারতেন। সব দলের মতৈক্যের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা সম্ভব নয়—এ কথা উপহাসভরে মাঠে ময়দানে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার বিকল্প বেছে নেওয়াকেই বিএনপি বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করেছিল। বাংলাদেশ শাসকেরা এটাই করেন। ৫ জানুয়ারির (২০১৪) একতরফা নির্বাচনের দুর্বলতাকে যেভাবেই চিত্রিত করা হোক না কেন, বিশ্ব যেভাবেই দেখুক, এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে এ নির্বাচনই আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং বিএনপি তা প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং যে সমালোচনা সহে সে রহে। এটাই বাংলাদেশ গণতন্ত্র। একে যথার্থতা দিতে অতীতের বিতর্কিত কোনো অধ্যায়কে টেনে এনে বৈধতা বা গ্রহণযোগ্যতা দিতে কারও বাধে না। কখনো কারও বাধেনি। মওদুদ এই গণতন্ত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন।

বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছিল। ২০১১ সাল থেকে আওয়ামী লীগ যেভাবে সময় নষ্ট করেছে। কী পরিহাস, ইতিহাসের একই পুনরাবৃত্তি। মওদুদ আহমদ নির্বাচনকালীন সরকার প্রশ্নে তৎকালীন বিরোধী দলের কাছে যে দৃষ্টিভঙ্গি বা পদক্ষেপ আশা করেছিলেন এবং তাকেই কার্যত একমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে দেখেছিলেন, ঠিক একই দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলের প্রতি করছে। মওদুদ লিখেছেন, 'বিএনপি আওয়ামী লীগের দাবি প্রত্যাখ্যান করে চলছিল, কারণ তার শর্ত ছিল শেখ হাসিনাকে সংসদে এসে বলতে হবে। এবং শেখ হাসিনা ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সংসদে এসে প্রস্তাব দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দুই সপ্তাহের মধ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ঘোষণা দেন যে, বিরোধী দলের প্রস্তাব খতিয়ে দেখতে উভয় পক্ষের সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে। দুই দলের অবিশ্বাস এতটাই গভীর যে বিরোধী দল দাবি করে, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা লিখিত হতে হবে এবং তারা তাতে সম্মতি দেওয়ার আগেই বিরোধী দলের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করতে হবে। এর পরই শুরু হয় দুই দলের মহাসচিবদের মধ্যে পত্রবিনিময় এবং যার পরিণতিতে আলোচনা শুরু হয়।'

অথচ এই দৃশ্য ২০০৫ সালে শুরু করতে সরকারি দলের সামনে কোনো বাধা ছিল না। কারণ আইন বা সংসদীয় গণতন্ত্রের এমন কোনো শর্ত বাধা নেই যে

বিরোধী দল সংসদের ফ্লোরে এসে প্রস্তাব না দিলে তা সরকারি দল গ্রহণ করতে পারে না। কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিতে পারে না। কোনো সংবিধান বিশেষজ্ঞ এ রকমের কোনো বাধানিষেধ কোনো কিতাব থেকে দেখাতে পারবেন না। কিন্তু বাংলাদেশে আশ্চর্যজনকভাবে এই বিষয়কে অহেতুক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দুই দলের মধ্যকার গভীর অবিশ্বাস, সন্দেহ, অনাস্থা ও অশ্রদ্ধাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করেই এ ধরনের আনুষ্ঠানিকতার দোহাই দেওয়া হচ্ছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মূল সংকট দুই দলের প্রতি পারস্পরিক অবিশ্বাস, যার একটি ঐতিহাসিক পরম্পরা রয়েছে। একটি মতাদর্শগত বিভাজনও রয়েছে। কিন্তু এটা এমন নয় যে বিশ্বের আরও অনেক জাতির জীবনে এমনটা নেই। বাংলাদেশে দশকের পর দশক একই শীর্ষ নেতৃত্বের বাস্তবতার কারণে সন্দেহ-অবিশ্বাসের শিকড় মাটির আরও গভীরে প্রোথিত হয়েছে। বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নির্বাচনকালীন সরকারের বিতর্ক থেকে বের হতে পারবে না। কারণ অদূর ভবিষ্যতে এই ধারা ভেঙে দেওয়া যাবে না। যেখানে দলের প্রধান, সরকারের প্রধান, সংসদের প্রধান এবং কার্যত বিচার বিভাগের প্রধান এক ব্যক্তি থাকবেন, সেখানে স্থিতাবস্থা অটুট থাকবে। অদূর ভবিষ্যতে কোনো কারণে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারলেও গণতান্ত্রিক শাসনের সংকট ঘুচবে না।

২০০৬ সালে আমরা দেখলাম দুই বড় দলের মহাসচিব কোন স্থানে বৈঠকে বসবেন সে বিষয়ে একমত হতে পারেননি। এই অচলাবস্থা নিরসনে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত আব্দুল জলিল ও মান্নান ভূঁইয়াকে তাঁর বাসভবনে চায়ের আমন্ত্রণে ডেকেছিলেন। আওয়ামী লীগ তা গ্রহণ করলে বিএনপি তা বর্জন করে। বিএনপির যুক্তি ছিল এটা গ্রহণ করার অর্থ হবে জনগণের মর্যাদা ও অহংকারকে ভূলুণ্ঠিত করা। এরপর তাঁরা সংসদের একটি কমিটি কক্ষে কয়েক দফার ব্যর্থ বৈঠকে বসেছিলেন। ২০১৩ সালে এসে আমরা দেখলাম, জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন খালেদা জিয়ার সঙ্গে টেলিফোন আলোচনায় বিএনপির দুজন নেতাকে নিউইয়র্কে আমন্ত্রণ জানালেন। সম্ভবত তাঁরা বুঝলেন স্যার নিনিয়ান যে কারণে ব্যর্থ ছিলেন, সেই কারণগুলো বাংলাদেশ রাজনীতিতে এখনো পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তাই এবার বিদেশি মধ্যস্থতায় কোনো আলোচনা হলো না। আর টেলিফোনের একটি নৈশভোজের আমন্ত্রণ নিয়ে কেবল হইচইটাই সবার নজরে পড়ল। এটাই ওঁরা চেয়েছিলেন। খালেদা জিয়া দ্বিতীয় পর্ব শুরু করেছেন। এবার প্রধানমন্ত্রীকে তিনি ইফতার পার্টিতে দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু কথা হলো, এসবের সঙ্গে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক বিনির্মাণের সম্পর্ক আগের মতোই আলগা।

মওদুদ আহমদ দুই নেত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দেখেছেন। এর সঙ্গে গণতন্ত্রের প্রশ্ন কতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি সত্য হলো এটাই বাস্তবতা। এটা বাংলাদেশ গণতন্ত্রের শক্তি। এটা বাংলাদেশ গণতন্ত্রের দুর্বলতা। একজন মওদুদ আহমদ তাঁর অনন্যসাধারণ সচেতন কুশলীব। বাংলাদেশ রাজনীতিকে বুঝতে হলে মওদুদের রাজনৈতিক সাহিত্য হবে আলোকবর্তিকা। জেলে বসে নিজেকে রাজনৈতিক লেখায় নিয়োজিত রাখার যে ধারা তিনি চালু করেছেন তা বিরল। এই প্রশংসা ওঁরই প্রাপ্য।

বইআলোচনা

‘যদি ইসলাম পৃথিবীতে না থাকত?’

আসজাদুল কিবরিয়া

আ ওয়ার্ল্ড উইদাউট ইসলাম—গ্রাহাম ই ফুলার; নিউইয়র্ক : ব্যাক বে বুকস, লিটল ব্রাউন অ্যান্ড কোম্পানি, এপ্রিল ২০১২ (ইন্টারন্যাশনাল ম্যাস মার্কেট এডিশন)

প্রারম্ভিক কথা

আবির্ভাবের এক হাজার ৪০০ বছর পর ইসলাম ধর্ম আজকে সারা দুনিয়ায় একটি অদ্ভুত বিরূপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একদিকে পশ্চিমা দুনিয়ার একাংশ ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদকে সমার্থক করে তোলার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে এই পশ্চিমা বিশ্বেরই আরেকাংশ ইসলামকে একটি সহনীয় গণতান্ত্রিক পরিসরে রেখে এগিয়ে নিতে আগ্রহী। ইসলামের বিষয়টি সারা দুনিয়াতেই তাই এখন একটি জটিল রূপ নিয়েছে। সন্ত্রাসবাদের সমতুল্য বা মদদদাতা হিসেবে ইসলামকে দাঁড় করানোর প্রয়াসটিকে অবশ্য জোরদার করেছে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক ইসলাম ধর্মাবলবম্বী গোঁড়া বা উগ্রপন্থীদের নানা কার্যক্রম। ফলে ইসলামকে একটি জঙ্গিবাদী ধর্মের লেবাসে নিয়ে আসা যাচ্ছে। আর তাই উদারপন্থী বা মধ্যপন্থী ইসলামি চিন্তাধারার সঙ্গে পশ্চিমা দুনিয়ার মেলবন্ধনের আগ্রহটি কঠিনতর হয়ে উঠছে। এই টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে অনেকেই এখন মনে করছে যে পৃথিবীতে ইসলাম না থাকলে সন্ত্রাসবাদ থাকত না, ধর্মের নামে পবিত্র যুদ্ধ থাকত না, সভ্যতার সংঘাত হতো না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ইসলামভীতি ছড়িয়ে দিয়েছে, তা ইউরোপ আরও জোরদার করেছে। এশিয়া ও আফ্রিকা এই ভীতিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যায় যে দুনিয়াজুড়ে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের খবর আসছে, যেখানে ইসলামকে দায়ী হিসেবে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। আত্মঘাতী বোমা হামলা, দাঙ্গা, ফতোয়াবাজি, গেরিলা আক্রমণ, ভিডিও বার্তায় হুমকির মতো বিভিন্ন ঘটনা দুনিয়ার যেখানেই ঘটছে, সেখানেই চালিকা হিসেবে দেখানো হচ্ছে ইসলামকে। পাশ্চাত্যের নয়া রক্ষণশীলেরা এখন ‘ইসলামোফ্যাসিজম’ বা ইসলামি ফ্যাসিবাদ নিয়ে লেগেছে আর বিশ্বকে এই ধারণা দিচ্ছে যে ‘তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ’ হবে ইসলামের সঙ্গে সভ্যতার।

এ রকম অবস্থায় তাই কেউ কেউ এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন যে ইসলাম যদি পৃথিবীতে না আসত, তাহলে কি সত্যিই দুনিয়ার পরিস্থিতি অন্য রকম হতো? অনেকে খুব সোজাসাপ্টা জবাব খুঁজে পেয়েছেন। তাঁদের মত হলো, ইসলাম না থাকলে আজকে এই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হতো না, এ রকম সংঘাত থাকত না। কিন্তু এ রকম একটি জটিল প্রশ্নের এত সহজ উত্তরই বা কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? বরং কেউ কেউ মনে করেন, ইসলাম না থাকলেও এই ধরনের সন্ত্রাস ও সংঘাত অব্যাহত থাকত, হয়তো কিছুটা ভিন্ন রূপে। গ্রাহাম ই ফুলার এই চিন্তাধারার একজন জোরালো সমর্থক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স কাউন্সিলের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান তাঁর *আ ওয়ার্ল্ড উইদাউট ইসলাম* শীর্ষক গ্রন্থে এ চিন্তাই ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিশ্লেষণ করেছেন, যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন ও বাস্তবতার নিরিখে উপস্থাপন করেছেন। বর্তমানে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ভ্যাংকুভারের সাইমন ফ্রেজার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক গ্রাহাম ফুলারের বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১০ সালে। অবশ্য তার আগেই ২০০৮ সালের জানুয়ারিতে *ফরেন পলিসি* ম্যাগাজিনে এর সারসংক্ষেপ নিবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

২.

‘কল্পনা করুন, অবশ্য যদি আপনি করতে চান, এমন এক দুনিয়া যেখানে ইসলাম নেই। এটা তো প্রায় অসম্ভব মনে হবে যখন আমাদের পত্রপত্রিকার শিরোনাম, বায়ুতরঙ্গ, কম্পিউটারের পর্দা ও রাজনৈতিক বিতর্কে ইসলামের ছবি ও কথা প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। আমরা তো জিহাদ, ফতোয়া, মাদ্রাসা, তালিবান, ওয়াহাবি, মোল্লা, শহীদ, মুজাহিদ, ইসলামি গোঁড়া আর শরিয়া আইনের মতো শব্দগুলো নিয়ে বড়ই উচ্চকিত। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমেরিকার প্রতিটি লড়াইয়ের এবং দুনিয়ায় বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতি নিয়ে শুরু করা “সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধের” কেন্দ্রে ইসলামকে নিহিত দেখা যায়। বস্তুত, মধ্যপ্রাচ্যের বেশির ভাগ ঘটনার তাৎক্ষণিক ও সরল বিশ্লেষণ যেন ইসলামেই আছে, যার মাধ্যমে আজকের নিয়ন্ত্রণহীন বিশ্বের অর্থ পাওয়া যায়। এভাবে ইসলামের দিকে অভিহিত করে

আমরা সবকিছুকে "পশ্চিমা মূল্যবোধ" ও "মুসলিম বিশ্বের" মধ্যকার লড়াইয়ের সংকীর্ণ পরিসরে নামিয়ে আনছি। কিছু নয়া রক্ষণশীলের কাছে "ইসলামোফ্যাসিজম" হয়ে উঠেছে আসন্ন চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ বা "দীর্ঘ যুদ্ধে" আমাদের মুখ্য ঘোষিত শত্রু। এটি এক বিরাট আদর্শিক লড়াই হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা শুধু ধর্মের ওপরই আলোকপাত আর দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা পূর্ব-পশ্চিম সংঘাতে ভূমিকা রাখা অন্য উপাদানগুলোকে অবজ্ঞা করছে। এই বইয়ে পুরো বিষয়টি বিপরীত দিক থেকে যুক্তিসহকারে আলোকপাত করা হয়েছে। যদি কোনো ইসলাম না থাকত, যদি একজন নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন না ঘটত, যদি মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও আফ্রিকার বিশাল এলাকাজুড়ে ইসলামের বিস্তারের ঘটনা না ঘটত, তাহলে কি আজকে পশ্চিমা বিশ্ব ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যকার সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হতো না? না। আমি বরং বলছি যে সম্পর্কটা প্রায় এ রকমই থাকত।' (পৃ. ২-৩)

অ্যা ওয়ার্ল্ড উইদাউট ইসলাম গ্রন্থের সূচনার তিনটি অনুচ্ছেদ এ রকম। এ থেকেই ধারণা করা যায় যে লেখক গ্রাহাম ফুলার কেন এই বইটি রচনা করেছেন। ইসলামের আবির্ভাব ও বিস্তারের কেন্দ্রভূমি হলো আরব তথা মধ্যপ্রাচ্য। আর তাই ইসলামের ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষণে সবার আগে মধ্যপ্রাচ্যই চলে আসে। আজকে আমেরিকা-ইউরোপ তথা পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে ইসলামের দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাই প্রধানত মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাত। সে কারণেই ফুলার তাঁর বইয়ের আলোচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যকে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন: বিশ্বে যে ইসলামের নামে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সন্ত্রাস ঘটছে, তার কারণ ইসলাম নয়। বরং ইসলাম হলো একটি শক্তিশালী বাহন, যা কিনা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বৈষম্যমূলক ও আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিরোধে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর সে কারণেই ইসলাম না থাকলে যে দুনিয়ায় সর্বত্র গণতন্ত্রের ঢেউ খেলে যেত, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে উঠত গণতন্ত্রের এক শান্তিময় স্থান, তা মোটেও ঠিক নয়। ফুলার বলতে চেয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্য তথা ইসলামের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিরোধকে সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে, ইতিহাসের পথপরিক্রমাকে বিবেচনায় নিতে হবে।

ফুলার বলছেন, 'পশ্চিম, বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত অর্ধ শতক আগেও মধ্যপ্রাচ্যে কোনো টেকসই বা ভীষণ কোনো আগ্রহ প্রদর্শন করেনি। আমরাও এই অঞ্চলে শত শত বছর, এমনকি হাজার বছরের বেশি সময় ধরে পশ্চিমা হস্তক্ষেপের বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। আমরা বরং পশ্চিমা রাজনীতি সম্পর্কে মধ্যপ্রাচ্যের সমালোচনা নিয়ে অতিমাত্রায় সচেতন, যেখানে স্থান পায় তেল, অর্থায়ন, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, পশ্চিমা সমর্থনপুষ্ট অভ্যুত্থান, পশ্চিমাপন্থী একনায়কদের প্রতি পশ্চিমা সমর্থন এবং জটিল ফিলিস্তিনি সমস্যায় ইসরায়েলের

প্রতি আমেরিকার নির্বিচার সমর্থন, যার শিকার, সবকিছুর পরও, ইসলামের মধ্যে নেই, বরং আছে ইউরোপীয় ইহুদিদের ওপর পশ্চিমাদের নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের মধ্যে। ইউরোপের ক্ষমতাধরেরা তাদের স্থানীয় বিবাদকে বাইরে রপ্তানি করেছে এবং তা দুটি বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত করেছে, যার কিছু অংশ সংঘটিত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের মাটিতে। একইভাবে হয়েছে ঠান্ডাযুদ্ধের ক্ষেত্রেও। এসব কিছুই আসলে নির্দেশ করে যে আরও অনেক কার্যকারণ উপাদান রয়েছে, যা কিনা বিদ্যমান গোলযোগ ব্যাখ্যার ক্ষমতা রাখে, যেমনটি রয়েছে "ইসলামের" মধ্যে। অনেকেই মনে করতে পারেন যে এখানে শুধু পশ্চিমকে দায়ী করা হচ্ছে। বিষয়টি অত সরলীকৃত নয় মোটেও। আমি বরং বলতে চাচ্ছি যে গভীরতর ভূরাজনৈতিক উপকরণগুলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার বিপলুসংখ্যক সংঘাতমূলক উপাদান তৈরি করেছে, যা ইসলামের আগে থেকে শুরু হয়েছে, ইসলামের সঙ্গে অব্যাহত থেকেছে, ইসলামকে ঘিরে হয়েছে এবং সম্ভবত অন্তর্নিহিত আছে ভূখণ্ডগত গুরুত্ব ও ভূরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি সেসব রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করেছে ধর্মীয় বিবেচনা উপেক্ষা করেই। অবশ্যই এটা বলা খুব বালখিল্য হবে যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংঘাতের বর্ণময় উপাদানগুলোতে ইসলামের কোনো ভূমিকা নেই। ইসলাম একটি শক্তিশালী ও গভীর সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে, যা কিনা গোটা মধ্যপ্রাচ্য ও এর বাইরেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সম্পর্কের বিবেচনায় আমি বলতে চাই যে এটা আসলে প্রাথমিকভাবে অন্যান্য গভীরতর বৈরিতা ও সংঘাতময়তার একটি পতাকা বা ব্যানারের কাজ করছে।' (পৃ. ৫-৬)

গ্রাহাম ফুলার অবশ্য শুরুতেই এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে তিনি 'বিশ্বে ইসলাম না থাকার' ধারণাটি মূল পাশ্চাত্যের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বিরোধ-সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, গোটা দুনিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নয়। ইসলাম যদি না থাকত, তাহলে আজকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সম্পর্ক কেমন দাঁড়াত, এই প্রশ্নের উত্তর নিবিড়ভাবে অনুসন্ধানের চেষ্টাই করেছেন। অর্থাৎ লেখক তাঁর আলোচনার পরিসরকে যুক্তিসংগতভাবে সীমিত রেখেছেন।

৩.

বইটি মোট তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের শিরোনাম 'উৎপথ ও ক্ষমতা'। এই পর্বে ছয়টি অধ্যায়ে ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের মধ্যকার সাযুজ্য ও বিরোধের ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, দেখানো হয়েছে ইব্রাহিমীয় বিশ্বাসের ও ইসলামের মধ্যে সম্পর্কসূত্র। খ্রিষ্টধর্মের ক্ষমতা, উৎপথ (বা নব্যতন্ত্র) ও বিবর্তনের পথরেখা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি

হলো 'বাইজেনটাইনীয় বনাম রোমান : খ্রিষ্টীয় মেরুকরণের যুদ্ধ', যেখানে খ্রিষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের মেরুকরণের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে, বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই মেরুকরণের কারণ ও প্রভাব। বলা যেতে পারে, আজকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের এক বড় ঐতিহাসিক শিকড় রয়ে গেছে খ্রিষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের এই মেরুকরণের ভেতরেই। পশ্চিমা ইতিহাসবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অনেকটা সচেতনভাবেই এই ঐতিহাসিক সত্যটি বিভিন্ন সময়ে কৌশলে এড়িয়ে এসেছেন, এখনো এড়িয়ে চলছেন। কেননা এই ঐতিহাসিক সত্যটি স্বীকার করে নিলে আজকে একতরফাভাবে ইসলামকে যাবতীয় সমস্যার মূল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জ্ঞানপাপজনিত প্রয়াসটি নৈতিকভাবে বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে যে!

ফুলার তাই বইয়ের সূচনাতেই বলেছেন, 'এই বইয়ের প্রধান মনোনিবেশের জায়গাটি হলো প্রাচ্যের গোঁড়া খ্রিষ্টবাদ এবং পশ্চিমের বা রোমান গোঁড়া খ্রিষ্টবাদের মধ্যে উত্তেজনা ও মতভেদসমূহের ওপর আলোকপাত করা। যদি ইসলাম এসে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে খ্রিষ্টীয় শাসনকে হটিয়ে না দিত, তাহলে এই গোটা অঞ্চলই আজকে প্রাচ্য গোঁড়া খ্রিষ্টবাদের অধীনে থাকত বলে মনে করা যায়। আর নানা বিষয়ে অভিন্ন প্রথা ও ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও গোঁড়া ও ক্যাথলিক মতবাদের মধ্যকার সম্পর্ক প্রায় দুই সহস্রাব্দ ধরে সন্দেহ ও ঘৃণায় আবর্তিত। সুতরাং এটা মনে করার খুব চমৎকার ভিত্তি রয়েছে যে পশ্চিমের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষোভ স্পষ্টভাবে প্রকাশের ধর্মীয় ও আদর্শিক পাটাতন হিসেবে গোঁড়া খ্রিষ্টধর্মই কাজ করত। আর ঐতিহাসিক ধারায় আজকে এই মতবাদের কেন্দ্রভূমি হতো মস্কো। এই বিবেচনা ধরেই ক্রুসেডের পূর্বাপর পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয় : এটা কি ধর্মীয়, না ভূরাজনৈতিক ঘটনা? ক্রুসেড খ্রিষ্টবাদ ও ইসলামের মধ্যে লড়াই—এই প্রচলিত ধারণার চেয়েও বেশি সত্যি হলো এটি প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্য খ্রিষ্টবাদ, পাশ্চাত্য খ্রিষ্টবাদ ও ইসলামের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রিমুখী রাজনৈতিক লড়াই।' (পৃ. ১৪)

প্রাচ্য খ্রিষ্টবাদ যে পাশ্চাত্যের প্রতি ঐতিহাসিকভাবেই বিরূপ, তাও ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরে দেখিয়ে দিয়েছেন ফুলার। তিনি বলেছেন, 'আমাদের পশ্চিমা সনাতন ধারায়, আমরা বরং প্রাচ্যের গোঁড়া গির্জা সম্পর্কে অন্ধ রয়েছি। আমাদের আশপাশে এসব গির্জা খুব কম দেখি আর তাই এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছি যে খ্রিষ্টবাদ ও মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে প্রাচ্য গির্জার কতটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। প্রথমত, রোমান ক্যাথলিক চার্চের তুলনায় এটা মধ্যপ্রাচ্যে একেবারে প্রথমদিকের ও সবচেয়ে "নেটিভ" খ্রিষ্টধর্ম। রোমান ক্যাথলিক চার্চ জেরুজালেম থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক আলাদাভাবে বিকশিত হয়েছে। আবার এই গোঁড়াবাদ এখনো মুসলিম মধ্যপ্রাচ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রূপে বিরাজ করছে। এটার গর্ব এই যে এটা রূপে ও চেতনায়

প্রকৃত গির্জার (খ্রিষ্টবাদের) সবচেয়ে কাছে; এর সূচনা হয়েছে প্রকৃত গির্জার ভূমিতে এবং এই বিশ্বাসই লালন করেছে যে পাশ্চাত্যের লাতিন গির্জার মতবাদগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এড়িয়ে গেছে। পশ্চিমা-বিরোধিতার গভীর শিকড়সমূহ এখনো এই গোঁড়া গির্জায় বিদ্যমান। আরও বেশি বিস্ময়কর যে এসব গির্জার পশ্চিমবিরোধী অনুভবসমূহের অনেক কিছুই আজকে পশ্চিমের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভীষণভাবে মিলে যায়, যা আবার পাশ্চাত্যের প্রভাব, মতলব ও হস্তক্ষেপের প্রতি একটি অভিন্ন ভূরাজনৈতিক উৎস থেকে সঞ্চারিত দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষোভ ও সন্দেহের অংশীদারমূলক প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আমরা ইতিমধ্যে ইসলামের সঙ্গে এই বন্ধনের কথা উল্লেখ করেছি যে কীভাবে যিশুখ্রিষ্ট সম্পর্কে বিভিন্ন খ্রিষ্ট মতবাদ তাঁর সম্পর্কে ইসলামের কিছু দৃষ্টিভঙ্গির মিল রয়েছে আর এসব খ্রিষ্ট মতবাদ পরবর্তী সময়ে গির্জা কর্তৃপক্ষ নাকচ করে দিয়েছে। পশ্চিমা শক্তির প্রতি গোঁড়া গির্জা ও ইসলামের অংশীদারমূলক ক্ষোভ এটা নির্দেশ করে যে সভ্যতার বিরোধরেখাগুলো শুধু এসব ধর্মের সংস্কৃতিগত বিশিষ্টতা নয়, বরং বহুলাংশে পাশ্চাত্যের স্বভাবের সঙ্গে জড়িত এবং মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যার সংঘাতসমূহ বহু পুরোনো। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্যসমূহ প্রায়ই ছোটখাটো ধর্মমতগত পার্থক্যকে বিরাট উৎপথ ও বিদ্রোহে রূপান্তর করতে পারে। [ইসলামের ভেতর সুন্নি-শিয়া বিরোধ সম্পর্কে এটি সত্যি যেখানে মহানবীর উত্তরাধিকার নিয়ে প্রাথমিক মতভেদগুলোর তেমন কোনো ধর্মগত বৈশিষ্ট্য না থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা গভীর সাম্প্রদায়িক বৈরিতায় রূপ নেয়। (পৃ. ৭০-৭১)]'

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমের প্রতি বিরূপ মনোভাবের উৎস ইসলামে নিহিত নেই। ইসলামের আবির্ভাবের আগে থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে বিরাজমান খ্রিষ্টধর্ম এই বিরোধিতা করে আসছে। বিষয়টি বর্তমান বিশ্বে মধ্যপ্রাচ্য তথা ইসলামের সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকার সংঘাতের গভীর কারণগুলো সঠিকভাবে বোঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরও পিছিয়ে গেলে দেখা যাবে, পারস্য সম্রাটেরা এথেন্সের দ্বারে আঘাত হেনেছিলেন আর এনাতোলিয়ায় যারা বসবাস করত, অনন্তকাল ধরে তাদের কাছে শত্রু পরিগণিত হয়েছিলেন। পারসিকদের সঙ্গে সেমেটিকদের বিরোধ-সংঘাতও প্রাক-ইসলাম যুগেরই।

আসলে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-বিরোধই পরবর্তীকালে মধ্যপ্রাচ্যে ও পূর্ব আফ্রিকার সঙ্গে ইউরোপের ও আমেরিকার বিরোধের আধুনিক রূপ। যদিও বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য ছিল রোমান সাম্রাজ্যেরই একটি অংশ, যাকে বলা হয় পূর্ব রোমান। কিন্তু ইতিহাসের পথরেখায় দেখা যায়, মূল রোমান বা পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক,

সাংস্কৃতিক এমনকি ধর্মীয় দিক থেকে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের অনেক পার্থক্য ছিল। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনেপল (আধুনিক ইস্তাম্বুল) ছিল গ্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত, গ্রিক ভাষাভাষীর কেন্দ্রভূমি।। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকেই এই নগরের কথা জানত গ্রিকরা। আর ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্ট্যানটাইন এই শহরের পুনরাবিষ্কার করায় নামকরণ হয় কনস্ট্যানটিনেপল। তিনি এটাকে রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার চিন্তা করেন। তত দিনে রোমান সাম্রাজ্য বিশেষত পশ্চিমাংশ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান আগ্রাসনের কাছে রোমের পতন ঘটে। অবসান ঘটে রোমান সাম্রাজ্যের। অন্যদিকে, তখন পূর্বে কনস্ট্যানটিনেপলকে ঘিরে বিকশিত হচ্ছে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য। রোমান ঐতিহ্য-প্রথা-ধারার অনেক কিছু উত্তরাধিকারী হিসেবে বহন করেও ভাষা-সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের পার্থক্য ক্রমেই বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যকে রোমান সাম্রাজ্য থেকে স্বতন্ত্র করে ফেলে, যেখানে প্রাচ্য খ্রিষ্টবাদ হয়ে ওঠে ধর্মের মূল কেন্দ্র। বাইবেলের নিও টেস্টামেন্ট রচিত হয় গ্রিক ভাষায়। কনস্ট্যানটিনেপলে লাতিন ভাষার চর্চা থাকলেও প্রাধান্য ছিল গ্রিকের। আর তাই পশ্চিমে লাতিন সাম্রাজ্য আর প্রাচ্যে গ্রিক সাম্রাজ্য—এই আলোচনা তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে। মজার বিষয় হলো, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়া মাইনরে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য আসলে রোমান সাম্রাজ্য হিসেবেই পরিচিত ও বিবৃত হতো। আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষায় প্রাচ্যের খ্রিষ্টান সাম্রাজ্য 'রুম' সাম্রাজ্য হিসেবেও পরিচিতি পেয়ে এসেছে, যার প্রতিফলন পাওয়া যায় 'রুম সালতানাত' শব্দগুচ্ছে। পবিত্র কোরআন শরিফে সূরা রুমে এই সাম্রাজ্যভিত্তিক খ্রিষ্টানদের কথাই বলা হয়েছে। মূলত ষোড়শ শতকে একজন জার্মান ঐতিহাসিক প্রথম প্রাচ্যের এই রোমান সাম্রাজ্যকে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং পরবর্তী সময়ে ইউরোপে এভাবেই এর পরিচিতি ঘটে। কিন্তু প্রাচ্যে রোমান সাম্রাজ্যের পরিচিতিকে পাশ্চাত্যের অর্থাৎ ইউরোপের রাজ-রাজা ও গির্জার পুরোহিত-পাদরিরা মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা বরং এটাকে গ্রিক সাম্রাজ্য হিসেবেই অভিহিত করতে স্বাচ্ছন্দ্য পেতেন। ১৪৫৩ সালে মুসলিম তুর্কিদের হাতে কনস্ট্যানটিনেপলের পতন ঘটার মধ্য দিয়ে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। তত দিনে প্রাচ্য খ্রিষ্টবাদ তার নিজস্ব অবস্থান সুশক্ত করে নিয়েছে। আর তাই আজও প্রাচ্য খ্রিষ্টবাদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে ইস্তাম্বুল স্বীকৃত।

ফুলার দেখিয়েছেন, কীভাবে রোমান ক্যাথলিক ও প্রাচ্য গোঁড়া খ্রিষ্টবাদের মধ্যকার বিরোধ বর্তমান যুগেও রক্তপাত ঘটিয়েছে। তিনি লিখছেন, 'প্রাচ্য (বাইজেনটাইন) সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার ছিল পূর্ব ইউরোপ ও

মধ্যপ্রাচ্যে জাতীয় গির্জাগুলোর সৃষ্টি। এসব গির্জা আজও সংস্কৃতিগত ও আবেগীভাবে সুনির্দিষ্ট ভাষা বা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। গির্জাসমূহের এই ঐতিহাসিক জাতীয়করণের প্রভাব আজকেও আমাদের রক্তাক্ত ইতিহাসে তাড়িয়ে বেড়ায়। ১৯৯০-এর দশকে যুগোস্লাভিয়ার ভাঙন তো প্রাচ্য অর্থোডক্স সার্বীয় খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে রোমান ক্যাথলিক ক্রোটদের অবস্থানের মধ্যেই নিহিত ছিল।' (পৃ. ৭৮-৭৯)

প্রথম পর্বের আরও তিনটি অধ্যায় আছে। এগুলো হলো: 'প্রাচ্য খ্রিষ্টবাদের সঙ্গে ইসলামের সাক্ষাৎ', 'মহা ক্রুসেডসমূহ (১০৯৫-১২৭২)' এবং 'অংশীদারমূলক প্রতিধ্বনি: প্রোটেস্টান সংস্কার ও ইসলাম'।

এই তিনটি অধ্যায়ে লেখক ইসলামের বিকাশ ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিষ্টধর্মের অন্তর্গত পরিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারাক্রমটিও তুলে ধরেছেন। ফলে পাশাপাশি একটি তুলনা ও সম্পৃক্ততা স্পষ্ট হয়েছে।

৪.

বইটির দ্বিতীয় পর্বের নাম 'ইসলামি সভ্যতার সীমান্তে মিলন'। এই পর্বে ফুলার মূলত স্যামুয়েল হানটিংটনের বহুল আলোচিত *সভ্যতা/সমূহের সংঘাত* বইয়ের মূল সুরকে এক প্রকার চ্যালেঞ্জ করেছেন, হানটিংটনের 'ইসলামের রক্তাক্ত সীমানা' ধারণা-বিশ্লেষণকে ঐতিহাসিক তথ্য ও যুক্তির নিক্তিতে পরীক্ষা করেছেন। ফুলার বলছেন, '...এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে একটি সীমানা রক্তাক্ত হতে হলে সাধারণত দুটি পক্ষ লাগে।' (পৃ. ৭৮-৭৯) তিনি আরও বলেছেন যে ইসলাম নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আসলে মুসলমানদের সম্পর্কে, মুসলমানরা যা ভাবছে, বলছে ও করছে, সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে। অন্যরা ইসলাম সম্পর্কে কী ভাবল, তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো মুসলমানরা নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে কী ভাবছে এবং তার ভিত্তিতে কী করছে। কেননা, 'শেষ পর্যন্ত ইসলাম হলো তা-ই, যা কিনা মুসলমানরা বলে ও করে। তবে তা বহুবিধ হতে পারে।' অর্থাৎ ফুলার বোঝাতে চেয়েছেন যে মুসলমানরা যেহেতু ইসলাম ধর্মাবলম্বী কিন্তু নানা ভাষা, সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্বের অধিকারী হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে, তাই বিস্তারিত আলোচনায় মুসলমান হিসেবে আলোকপাত করা অধিক যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত। তাহলে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যকার মিলন-বিরোধের বিষয়টি বিশ্লেষণ সহজতর হয়। তিনি হানটিংটনের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে এও বলেছেন, 'ইসলামের সীমানাসমূহের' বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ আসলে কোনো সীমানা নয়, বরং অমুসলমান সংস্কৃতির ভেতরে মুসলমানদের সম্পর্ক বিশেষত সংখ্যালঘু হিসেবে এই সম্পর্কের মাত্রা।

আসলে হানটিংটনের বইটি পাশ্চাত্যে এত বেশি আলোচিত এবং তা নিয়ে অধিকাংশ পশ্চিমা পণ্ডিত এত বেশি উদ্বেলিত যেন এ রকম গবেষণা কখনো হয়নি, এমনভাবে সভ্যতার বিভিন্ন দিক আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়নি। যথারীতি বাংলাদেশেও হানটিংটন নিয়ে আলোচনা বহুলাংশে পাশ্চাত্য প্রভাবিত। 'ইসলামের রক্তাক্ত সীমান্তসমূহের' ধারণায় হানটিংটন এটাই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে 'মুসলমানরা শান্তিপূর্ণভাবে অন্যান্য সভ্যতা ও প্রতিবেশীর সঙ্গে বসবাসে সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে।...মুসলমানরা বিশ্ব জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগের অংশীদার। কিন্তু সে তুলনায় বিশ্বে সংঘটিত আন্তগোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে তাদের অংশীদারি অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশি।' (পৃ. ১৫৯) এই বক্তব্যের সমর্থনে হানটিংটন কিছু পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে ১৯৯৩-৯৪ সময়কালে সংঘটিত নৃগোষ্ঠীগত সংঘাতের ৫০টির মধ্যে মুসলমানরা ২৬টিতে অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে ২০টি সহিংস ঘটনা ঘটেছে বিভিন্ন সভ্যতার ভেতর, যার মধ্যে ১৫টিই ছিল মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে। এ রকম আরও কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরে হানটিংটন উপসংহার টানছেন, '১৯৯০-এর দশকের প্রারম্ভে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে সংঘাতে বেশি ব্যস্ত ছিল। তারপর তারা অমুসলমানদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। অধিকাংশ আন্তসভ্যতা যুদ্ধই কিন্তু মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে ঘটতে দেখা যায়। মুসলমানদের সীমান্ত ছিল রক্তাক্ত আর এটি হলো তার অভ্যন্তরীণ মর্মকথা।'[১]

অবশ্য পরিসংখ্যানের পাল্টা পরিসংখ্যানও হয়। ফুলার ইউরোপোলের পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে ২০০৬ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে ৪৯৮টি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে ৪২৪টি সংঘটিত হয়েছে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী দ্বারা, ৫৫টি চরম বামপন্থী দল দ্বারা, ১৮টি অন্যান্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দ্বারা এবং মাত্র একটি ইসলামপন্থীদের দ্বারা। মুসলমানদের নির্বিচারে সন্ত্রাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পাশ্চাত্যের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার বিপরীতে এটি একটি ক্ষুদ্র চপেটাঘাত বিবেচিত হতে পারে বৈকি।

ফুলার বরং মনে করেন, 'শক্তিশালী অমুসলমানদের সঙ্গে বসবাসের ক্ষেত্রে মুসলমানরা সৃজনশীল সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছিল। তবে তারা সবকিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি থেকে বিচ্যুত হয়নি। আর তা হলো : এসব রাষ্ট্রের মধ্যেও ইসলাম ও মুসলমান সমাজকে লালন ও রক্ষা করা। এর মানে হলো নিজেদের মুসলমান পরিচয় বিসর্জন না দেওয়া বা এমনতর সংস্কৃতিগতভাবে আত্তীকৃত না হওয়া যেন নিজস্ব সংস্কৃতি মুছে যায়। এর মানে আবার এই নয় যে তারা তাদের সমাজে সক্রিয় নাগরিক হিসেবে পুরোপুরি সম্পৃক্ত হবে না। ইহুদিরাও এই ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে। তাদের ইতিহাসে তারা বরাবরই নিজেদের সম্প্রদায়কে

রক্ষা করেছে, নিজেদের মূল্যবান সংস্কৃতির অনন্যতাকে লালন করেছে, আবার একই সঙ্গে আত্তীভূত হওয়া ও মুছে যাওয়াকে প্রতিরোধ করেছে। আমরা দেখতে পাই যে মুসলমানরাও সহাবস্থান করতে এমনকি সমাজে সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার অংশীদার হয়েছে, যা কি না প্রায়ই চেতনাগতভাবে বহু-সাংস্কৃতিক ছিল না। একাধিক কৌশল মুসলমানরা অনুসরণ করেছে বলে প্রতীয়মান হয় : খাপ খাওয়ানো, সংমিশ্রণ, হুমকির মুখে পড়লে প্রতিরোধ গঠন এবং অমুসলমান রাষ্ট্রে নিজেদের সংখ্যালঘুত্বের বাস্তবতা মেনে নেওয়া।' (পৃ. ১৬০-১৬১)

ফুলার এ প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। সেটি হলো পাশ্চাত্য-বিরোধিতা বা পশ্চিমাবিদ্বেষ। একটি ধারণা দুনিয়াজুড়ে গেড়ে বসেছে যে ইসলাম মৌলিকভাবে পশ্চিমাবিদ্বেষী। কিন্তু ফুলার বলছেন, 'সত্য হলো, বেশির ভাগ বিশ্বই বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমের প্রতি একই সঙ্গে শ্রদ্ধা ও ঘৃণার অনেক কারণ খুঁজে পেয়েছে। পশ্চিমের প্রতি ক্ষোভ শুধু যে একচেটিয়াভাবে মুসলমানদের, বিষয়টি তা নয়। যদিও একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধের সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় মুসলমানদের মধ্যে প্রবল আমেরিকাবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলে। একটা সময়ে এটি শেষ হবে। কিন্তু আমেরিকাবিরোধী বা পশ্চিমাবিরোধী আবার প্রজ্বলিত হয়ে উঠতে পারে, যেমনটি চীনা ও লাতিন আমেরিকার মতো অন্যান্য সংস্কৃতিতে অতীতে হয়েছে।' (পৃ. ১৬৩-১৬৪)

ফুলার সাবলীল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে সূত্রপাত ঘটান, তা আজকে মুসলিম বিশ্বে একধরনের আত্মসচেতনতামূলক ঐক্য গড়ে তুলতে ভূমিকা রেখেছে, যদিও তারা একই সঙ্গে শোকাহত ও বিভ্রান্ত হয়ে গোঁড়ামি ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের আবেগময় ঐক্য হয়তো সরাসরি কোনো রাষ্ট্র দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারবে না, তবে তা সময়ে সময়ে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটাতে পারে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে শক্তিশালী বাধা হতে পারে।

আসলে ২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আল-কায়েদার সন্ত্রাসী হামলার পর গোটা দুনিয়াকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিপক্ষ বানিয়ে ফেলে। নয়-এগারোর জবাব দিতে গিয়ে দুনিয়াজুড়ে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধ' ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ। কিন্তু এক যুগের বেশি সময় পরে এসে এটা প্রমাণিত যে সারা দুনিয়াকে এ জন্য অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছে ও হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই লড়াই বরং পরিগণিত হচ্ছে 'সন্ত্রাসের যুদ্ধ'[২] হিসেবে। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার নামে গোটা দুনিয়ায় মানবাধিকার, আইনের শাসন ও স্বাধীনতা ভীষণভাবে খর্ব করা হয়েছে ও হচ্ছে। বলা যায়, '১১ সেপ্টেম্বরের পর এক দশক ধরে বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে ব্যাপক

রক্তপাত ও দুরবস্থা। বুশ প্রশাসন তাৎক্ষণিকভাবে (নয়-এগারো হামলার) জবাব দিয়েছে আফগানিস্তানে আক্রমণ চালিয়ে ও আগ্রাসন অব্যাহত রেখে। সঠিকভাবে যথাযথ জবাব দেওয়ার বদলে বুশ প্রশাসন বরং সেসব সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নতুন ক্রুসেড পরিচালনার কথা বলেছে, যাদের ওয়াশিংটন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ভয়াবহ হামলার জন্য দায়ী করেছে। যুক্তরাষ্ট্রকে আরব ও মুসলিম বিশ্বের অপছন্দের কারণ হয়ে ওঠার জন্য গভীর বিশ্লেষণে না গিয়ে বুশ প্রশাসন বরং নয়-এগারোকে ব্যবহার করেছে তাদের স্বল্পমেয়াদি ভূকৌশলগত লক্ষ্য অর্জনে। আরব ভূমিতে মার্কিন দখলদারি এবং অনিষ্পন্ন ফিলিস্তিন সমস্যা ছিল সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মূল উদ্দীপনা। ২০০৯ সালে কায়রো ভাষণে প্রেসিডেন্ট ওবামা ঘটনার কেন্দ্রে ফিলিস্তিন সংকটের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তবে নয়-এগারোর পর ইসরায়েলের নির্মম দখলদারি ও তা সম্প্রসারণে আমেরিকার সমর্থন কেবল জোরদারই হয়েছে।'[৩]

হানটিংটন যে বৃহত্তর 'সভ্যতাসমূহের সংঘাত' নিয়ে আলোচনা করেছেন, ফুলার তাকে অতিমাত্রায় তাত্ত্বিক বা কল্পনাপ্রসূত বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলছেন, 'গোটা একটি সভ্যতার সঙ্গে আরেকটি সভ্যতাকে সংঘাতে লিপ্ত করা খুব কঠিন, কিন্তু হাল আমলে এটি বরং কিছুটা সহজ হয়ে গেছে, যখন যোগাযোগের সুবিধা থাকায় একধরনের দলীয় সমর্থন অনেক বড় আকারে গড়ে ওঠে। টেলিভিশনের পর্দায় অনেক দূরে কোথায় শত্রু দেখতে পেয়ে নিজের ঘরে বসেই একধরনের আবেগ তৈরি হয়—"এরা তো খ্রিষ্টান", কিংবা "এরা তো মুসলমান" কিংবা "এরা তো পশ্চিমা" এ রকমভাবে। ক্রুসেডই হলো সম্ভবত একটি সভ্যতার সংঘাতের সবচেয়ে কাছাকাছি ঘটনা, যা দুনিয়া ওই সময়ে দেখতে পেয়েছে।' (পৃ. ১৬২) ফুলার আরও বলছেন, 'ইসলামের রক্তাক্ত সীমান্ত' ধারণা নিয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বরং অনেক জটিল ঘটনা ও বিষয় চলে আসে, যার মধ্যে আছে বাইরের আক্রমণ থেকে নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা করা, পশ্চিমের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অংশীদারি প্রতিরোধ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিজ জনগোষ্ঠীকে সমজাতীয় করে তোলার প্রয়াস। ইসলাম না থাকলে পশ্চিমাবিরোধী মনোভাব আর দেখা যেত না, এমনটা চিন্তা করা অতিসরলীকরণ। তিনি রাশিয়া, চীন ও ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এই তিনটি সভ্যতার প্রতিটিতেই পশ্চিমাবিরোধী মনোভাব প্রবল আর মুসলমানরা এসব সভ্যতায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

বইয়ের এই পর্বে পাঁচটি অধ্যায় হলো : 'তৃতীয় রোম এবং রাশিয়া : গোঁড়া খ্রিষ্টবাদের উত্তরাধিকার রাশিয়া', 'রাশিয়া ও ইসলাম : বাইজানটাইনীয় বেঁচে থাকা!' 'পশ্চিমে মুসলমান : অনুগত নাগরিক অথবা পঞ্চম বাহিনী?' 'ইসলাম ও ভারত' এবং 'ইসলাম ও চীন'।

রাশিয়ার সঙ্গে ইসলামের ঐতিহাসিক সম্পর্কের উত্থান-পতন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফুলার লিখেছেন, 'রাশিয়া তার মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে দেখেছে। প্রথমে দেখেছে শত্রু হিসেবে, তারপর দেখেছে জার সাম্রাজ্যের স্তম্ভ হিসেবে অথবা রুশ সাম্রাজ্যের অনুগত সদস্য হিসেবে অথবা প্রাচ্যে কমিউনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরোধিতাকারীর সম্ভাব্য নেতৃত্ব হিসেবে অথবা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আদর্শিক মিত্র হিসেবে অথবা অনির্ভরযোগ্য জাতীয়তাবাদী, ভয়ংকর বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সন্ত্রাসী হিসেবে অথবা আরও একবার যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য জোট হিসেবে।' (পৃ. ১৮৮) তিনি দেখিয়েছেন যে রাশিয়ার অর্থোডক্স খ্রিষ্ট মতবাদ বরাবরই পশ্চিমাদের সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে। আর পশ্চিমারাও অর্থোডক্স বা গোঁড়া খ্রিষ্টবাদের প্রতি ভীষণ বিরূপ মনোভাব পোষণ করে আসছে। আর তাই রুশ-মার্কিন বিরোধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো অর্থোডক্স-লাতিন খ্রিষ্টবাদের বিরোধ। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর রাশিয়ায় ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের আনাগোনা বেড়ে যায়। একপর্যায়ে রুশরা বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। আর তাই ২০০১ সালে এক আইন করে রাশিয়ায় বিদেশিদের ধর্ম প্রচার কার্যক্রম সীমিত করা হয়, 'যার লক্ষ্য পাশ্চাত্য খ্রিষ্টবাদ, ইসলাম নয়।' তাই ফুলার বলছেন, 'এভাবে অর্থোডক্স চার্চ রাশিয়ায় ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান বিশেষত ইভানজেলিক চার্চের জন্য ধর্মান্তর কার্যক্রম, গির্জা খোলা বা সংগঠিত হওয়া দুরূহ করে দেয়। আরও একবার প্রথাগত জাতীয় ধর্ম সাংস্কৃতিক গৌরব ও জাতীয়তাবাদের গুরুত্বপূর্ণ বাহন হয়ে ওঠে। আর এই ঘটনা পুরোপুরি মুসলিম বিশ্বের সেই ঘটনারই সমান্তরাল বিবেচনা করা যায়, যখন মুসলমান সম্প্রদায় শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ পাশ্চাত্যের মোকাবিলা করেছে ও ধরে নিয়েছে পাশ্চাত্যের কার্যক্রম ইসলামকে দুর্বল করার জন্যই পরিচালিত হচ্ছে। এটা তাই ধর্মীয় কোনো বিষয় নয়, বরং এটা হলো পরিচিতির বিষয়।' (পৃ. ১৮৩-১৮৪)

দেখা যাচ্ছে, গোঁড়া খ্রিষ্টবাদের সঙ্গে লাতিন খ্রিষ্টবাদের যুগের পর যুগ চলে আসা বিরোধ যতটা প্রবল, ইসলামের সঙ্গে গোঁড়া খ্রিষ্টবাদের বিরোধ ততটা নয়। এই অবস্থায় যদি ইসলাম না থাকত, তাহলে আজকের মধ্যপ্রাচ্যে প্রাধান্য থাকত গোঁড়া খ্রিষ্টবাদের। আর তাই মধ্যপ্রাচ্যের ওপর রাশিয়ার প্রভাবও অনেক বেশি থাকত। আর তাই এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনকে ইরাকিরা স্বাগত জানাত। তা ছাড়া একজন প্রবল জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ নেতা সাদ্দাম হোসেনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গদিচ্যুত ও হত্যা করেছে, তিনি মুসলমান হওয়ার কারণেই নয়। ফুলারের বিশ্লেষণ ধরেই বলা যায় যে মুসলমান হওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কাজটা সহজ হয়েছে।

প্রাচ্যের গোঁড়া খ্রিষ্টানরা আজও পশ্চিমের ক্রুসেডারদের দ্বারা ১২০৪ সালে 'খ্রিষ্টান কনস্টানটিনেপল' আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর কথা ভুলে যায়নি। এই অপরাধ তারা ক্ষমাও করেনি। সে কারণেই প্রায় ৮০০ বছর পরে পোপ দ্বিতীয় জন পল ১৯৯৯ সালে এই ক্ষত নিরাময়ের ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে অর্থোডক্স খ্রিষ্টজগৎ সফর করেছিলেন। এটি ছিল হাজার বছরের মধ্যে কোনো ক্যাথলিক পোপের প্রাচ্য সফর।

ফুলার দেখিয়েছেন যে রাশিয়া, চীন ও ভারতে ইসলামের বিস্তার এবং নানা আঘাত ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকা ও এগিয়ে যাওয়ার সুদীর্ঘ পরিক্রমা ইসলামের অন্তর্নিহিত সহনক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ। তিনটি দেশেই মুসলমানরা সংখ্যালঘু হওয়ার পরও তিনটি সভ্যতায় ইসলাম শুধু সম্পৃক্তই হয়নি, বরং সভ্যতাগুলোকে ঋদ্ধ করেছে। বিশেষত ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব ও অবদান তো অনেক বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী। আর তাই ইসলাম না থাকলে বা ইসলাম না এলে হিন্দু-মুসলমান মিশ্রিত মোগল সভ্যতার ঋদ্ধতা থেকে পৃথিবী বঞ্চিত হতো।

৫.

শেষ পর্বটির নাম 'আধুনিক বিশ্বে ইসলামের অবস্থান'। এখানে তিনটি অধ্যায় হলো: 'উপনিবেশবাদ, জাতীয়তাবাদ, ইসলাম ও স্বাধীনতার সংগ্রাম'; 'যুদ্ধ, প্রতিরোধ, জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ' এবং 'করণীয় কী? মুসলিম বিশ্বকে সঙ্গে নিয়ে একটি নতুন নীতি'।

এই পর্বে ফুলার যা জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন, তা হলো 'প্রতিরোধের বাহন' হিসেবে ধর্ম, বিশেষত ইসলামের অবস্থান। যখন একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী আরেকটি দুর্বল গোষ্ঠীকে অন্যায়ভাবে আঘাত হানে, তার সত্তা ও সংস্কৃতি অস্বীকার করতে চায়, তখন দুর্বল গোষ্ঠী সামর্থ্য অনুযায়ী এই আঘাতের প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়। প্রতিরোধের জন্য তার দরকার হয় কিছু মাধ্যম বা বাহন। আর ধর্ম বা ধর্মীয় চেতনা-উদ্দীপনা এ ক্ষেত্রে শক্তিশালী বাহন হতে পারে। ইসলামও সেই বাহনেরই কাজ করেছে বহু ক্ষেত্রে, বিশেষত পশ্চিমা আগ্রাসন ও দখলদারির বিরুদ্ধে, পশ্চিমা আক্রমণের বিরুদ্ধে। আর এই প্রতিরোধকে মোকাবিলার জন্য পশ্চিমা বিশ্বই আবার ধর্মকে সম্পৃক্ত করেছে। তারাই খ্রিষ্টধর্ম ও ইহুদি ধর্মকে ইসলাম ধর্মের মোকাবিলায় দাঁড় করিয়েছে নিজেদের আগ্রাসনকে যুক্তিসংগত হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য।

সে কারণেই দেখা যায়, হানটিংটনসহ অনেক পশ্চিমা পণ্ডিত বেশ সাফল্যের সঙ্গে 'ইসলাম বনাম ইহুদি-নাসারা' তত্ত্ব প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে ফুলারের প্রতিধ্বনি করেই যেন আইজাজ আহমদ লিখেছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী খ্যাতিমান পণ্ডিত বার্নাড লুইস হলেন সভ্যতাসমূহের সংঘাত-তত্ত্বের প্রকৃত লেখক। স্যামুয়েল হানটিংটনের অনেক আগেই তিনি লিখেছিলেন যে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিজয় সম্পন্ন হওয়ার পর পৃথিবীর মৌলিক ও বিসংগত সংঘাত হবে ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতার সঙ্গে মুসলমান সভ্যতার। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে নয়-এগারো ছিল ইসলাম ও ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতার চূড়ান্ত লড়াইয়ের সূচনার তোপধ্বনি।...সভ্যতা নিয়ে এই বিতর্কের দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, এটি মুসলমানদের ভূমিতে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের পুরো ইতিহাসকে অস্বীকারের চেষ্টা করছে। অথচ পশ্চিমের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষোভের শিকড় নিহিত আছে এই ইতিহাসে। দ্বিতীয়ত, ক্রমাগত পশ্চিমের "ইহুদি-নাসারা" বৈশিষ্ট্য প্রচার করছে, সেমেটিক-বিরোধী পশ্চিমের পুরো ইতিহাস অস্বীকার করছে, ইসরায়েলকে পশ্চিমের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করছে আর এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইসরায়েলের দখলদারি-ঔপনিবেশিক চরিত্রকে অস্বীকার করছে। ফিলিস্তিন প্রশ্নে মুসলমানদের স্পর্শকাতরতা তাই এভাবেই পুনর্লিখিত হয়েছে যে এটা ঔপনিবেশীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া নয়, বরং ইহুদি-নাসারাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রচণ্ড ঘৃণার প্রকাশ।'[৪]

ফুলার নিবিড় বিশ্লেষণ করে তাঁর বইয়ে জোরালো ভাষায় বলেন যে ফিলিস্তিন সমস্যার সূত্রপাতের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক নেই আরব-ইসরায়েল সংকট সৃষ্টিতেও। বরং ইউরোপ থেকে গণহারে ইহুদিদের আরব ভূমিতে অভিবাসী হওয়ার মধ্য দিয়ে এই সংকট তৈরি করা হয়েছে। পূর্ব ইউরোপ থেকে ইহুদিরা এসে আবাস গড়তে থাকায় স্বাভাবিকভাবে ফিলিস্তিনিরা বিচলিত হয়ে ওঠে। তিনি বলছেন, 'হোলোকাস্টের অপরাধ পুরোপুরি ইউরোপীয়দের কাঁধে বর্তায়। আর এই হোলোকাস্টই ইহুদিদের চূড়ান্তভাবে ফিলিস্তিনের দিকে ধাবিত করে, যাকে আবার সমর্থন জোগায় অপরাধী ইউরোপীয়রা। তিন-চতুর্থাংশ ফিলিস্তিনি শেষ পর্যন্ত ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের ফলে ইসরায়েলের নৃতাত্ত্বিক শুদ্ধি অভিযান ও নিপীড়নের শিকার হয়ে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়। এভাবে ইউরোপীয়দের পাপের মূল্য দিতে হয় ফিলিস্তিনিদের। যদি ইসলাম না থাকত, তাহলেও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ফিলিস্তিনিরা খুশিমনে ইহুদিদের কাছে নিজেদের ভূমি ছেড়ে দিত না কিংবা গেরিলা প্রতিরোধ গড়ে তোলা থেকে বিরত থাকত না। বাস্তবে খ্রিষ্টান ফিলিস্তিনিরাও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গেরিলা আন্দোলন গড়ে তোলায় ভূমিকা রেখেছিল। কালক্রমে ফিলিস্তিনি-ইহুদি জাতিগত বিরোধ ধর্মীয় রূপ নিলেও এর উৎসে ইসলামের কোনো কিছুই করার

ছিল না।' (পৃ. ৩০৩-৩০৪)

ফুলার সন্ত্রাসবাদের ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন এবং ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদকে সমর্থক করে তোলার পশ্চিমা অপচেষ্টার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন যে দুনিয়ায় কেউই সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে পারবে না। তবে একে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত করা যায়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নীতি সেদিকে না গিয়ে বরং সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। যেভাবে সন্ত্রাসবাদকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তার মানে দাঁড়ায়: 'সন্ত্রাসবাদ হলো, আমি যা বলি তা-ই।' (পৃ. ৩২৯) কেননা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ সন্ত্রাসবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে: 'নির্দিষ্টভাবে মাপজোখ করে বেআইনি সহিংসতা বা বেআইনি সহিংসতার হুমকি ব্যবহারের মাধ্যমে ভীতি সৃষ্টি করা এবং তা করে সাধারণত রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা আদর্শিক লক্ষ্য অর্জনে সরকার বা সমাজকে চাপ প্রয়োগ করা।' (পৃ. ৩২৯) ফুলার বলেন যে সহিংসতার বেআইনি ব্যবহার আসলে কী, তা স্পষ্ট করা হয়নি। তার মানে হলো, রাষ্ট্র যা অনুমোদন করে না তাই বেআইনি। এভাবে 'রাষ্ট্র সমান আইনি' সমীকরণ তৈরি করা হয়েছে, যা পশ্চিমা বিশ্বের বেশির ভাগ গণতান্ত্রিক দেশে সত্যি হলেও অন্যত্র বিশেষত স্বৈরতান্ত্রিক দেশগুলোতে প্রযোজ্য নয়। কেননা, সেখানে সব বিরোধী পক্ষকে বেআইনি অভিহিত করা হয়।

ফুলার ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে প্রশ্ন তুলেছেন যে সন্ত্রাসবাদ কি তাহলে পশ্চিমা বিশ্বের সুবিধামতো সংজ্ঞায়িত ও চিহ্নিত হবে কি না। কেননা, সাম্প্রতিক বিশ্বে রাজনৈতিক সহিংসতার অসংখ্য ব্যবহার হয়েছে আর তার অনেকগুলো হয়েছে বিভিন্ন দেশ-জাতির স্বাধীনতাসংগ্রামে। তিনি বলেন যে যদি পেন্টাগনের সংজ্ঞায়িত 'বেআইনি সহিংসতা' মেনে নিতে হয়, তাহলে ১৭৭৬ সালে আমেরিকার বিপ্লবীরা যে বৈধ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এই বেআইনি সহিংসতা প্রয়োগ করেছিল, তা গ্রহণ করা যায় না। আর তাহলে আজকের আমেরিকাও পাওয়া যেত না। তিনি আরও বলেন যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত করার পরও কেনিয়ার জোমো কেনিয়াটা বা ইসরায়েলের মেনশাম বেগিন পরবর্তীকালে সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। আবার বিরাট পরিসরে সন্ত্রাস চালিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর প্রচণ্ড ভীতি তৈরি করে জয়ের কৌশলও তো আছে। এ প্রসঙ্গে তিনি হিরোশিমা-নাগাসাকিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক বোমা নিক্ষেপের উল্লেখ করে বলেন যে এটা তো ভয়ংকর-দানবীয় এক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। ফুলার বরং মনে করেন, 'অন্য জাতীয়তাবাদীদের মতো বেশির ভাগ মুসলমান যারা জাতীয়তাবাদী অন্যায্যতা-বঞ্চনার নামে লড়াই করছে, তাদের অবশ্যই "সন্ত্রাসী" হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না। বরং তারা হলো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, যাদের সঙ্গে

রাজনৈতিক আচরণ বা সমঝোতা প্রয়োজন। "অন্তর্ঘাত" অবৈধ হতে পারে, তবে অন্যায়ের শিকার হলে এটা হবে মানবিক প্রতিক্রিয়ার নির্যাস।' (পৃ. ৩৩৪)

ফুলারের এই নিবিড় বিশ্লেষণ অনেককে এই বলে বিভ্রান্ত করতে পারে যে তিনি হয়তো সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করছেন বা কিছুটা হলেও উৎসাহিত করছেন। আসলে সন্ত্রাসবাদের আগা-গোড়া সম্পর্কে অস্পষ্টতা ও ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অজ্ঞতাই এই বিভ্রান্তির কারণ। আর তাই ফুলারের বিশ্লেষণ খুব মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

তা ছাড়া ফুলার স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদ শেষ করার বোঝা বা দায় মুসলমান জনগোষ্ঠীর নিজেদের কাঁধেই পড়ে। তবে এটা করতে হলে অবশ্যই প্রথমে সেসব পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে হবে যা কিনা উগ্রবাদ ও ব্যাপকভিত্তিক আমেরিকাবিরোধী মনোভাব তৈরি করেছে। এর মানে হলো মুসলমানদের ভূমিতে আর কোনো ভিনদেশি বুট নয়, বিদেশি সৈন্য দ্বারা কোনো আক্রমণ নয়।...মুসলমান সমাজদের অবশ্যই শান্ত ও স্থিত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সুযোগ দিতে হবে। আর শুধু মুসলমানরাই সন্ত্রাসবাদ সত্যিকারভাবে মোকাবিলায় নিজেদের সমাজের ভেতরে চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনতে পারে।' (পৃ. ৩৩৪) তিনি এও বলেছেন যে সবকিছুর জন্য ইসলামকে যেমন দায়ী করা যায় না, তেমনি যাবতীয় সমস্যার জন্য পশ্চিমা বিশ্বকেও একতরফাভাবে দায়ী করা যায় না।

৬.

গ্রাহাম ই ফুলারের দীর্ঘ গবেষণালব্ধ ও পরিশ্রমের ফসল এই বইটির তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। আজকের দুনিয়ায় যখন ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদকে সমার্থক হিসেবে প্রতিষ্ঠার পশ্চিমা প্রয়াস ক্রমেই সাফল্য পাচ্ছে, তখন এর বিরুদ্ধ স্রোতের যাত্রী হিসেবে ফুলার আমাদের নিয়ে যান এক আশ্চর্য ও বিচিত্র অভিযাত্রায়। তিনি ইতিহাসের পথপরিক্রমা ধরে বিশ্লেষণ করে আমাদের দেখান যে ইসলাম না থাকলেও মধ্যপ্রাচ্যে আরব, পারসিক, তুর্কি, কুর্দি, ইহুদি এমনকি বারবার ও পশতুনের মতো নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী ভূরাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করত ও বিরোধে লিপ্ত থাকত। আর ইসলাম না থাকলে খ্রিষ্টধর্ম বিশেষত গোঁড়া খ্রিষ্টবাদই হতো মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান ধর্ম। আর থাকত আজকের মতোই অল্প কিছু ইহুদি ও জরাথ্রুস্টবাদী। তাতে করে পশ্চিমের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে থাকা নিশ্চিত হতো না। মধ্যপ্রাচ্যের খ্রিষ্টানরা অস্ত্র হাতে আগত ইউরোপের খ্রিষ্টানদের স্বাগত জানাত না।

ফুলার প্রশ্ন রাখেন, যদি মধ্যপ্রাচ্যে ও উত্তর আফ্রিকায় গোঁড়া খ্রিষ্টবাদীরা

প্রাধান্য বিস্তার করে থাকত, তাহলে কি তারা নিজেদের মাটিতে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ বা ঘাঁটি গাড়ার জন্য স্বাগত জানাত? উত্তরটাও তিনি দেন এভাবে যে না, খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত মধ্যপ্রাচ্য পশ্চিমা তেল কোম্পানিগুলোকে খুশিমনে স্বাগত জানাত না। বরং নিজেদের ভূমি, বাজার, সার্বভৌমত্ব ও ভাগ্যকে পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে উপনিবেশবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলত, যেমনটা গড়েছে ভারতের হিন্দুরা, চীনে কুনফুশীয়রা, ভিয়েতনামে বৌদ্ধরা এবং আফ্রিকায় খ্রিষ্টানরা। এ প্রসঙ্গে ফুলার লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তেল, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে সেখানকার মানুষের লড়াইয়ের দীর্ঘ ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন যে নিশ্চিতভাবেই ফরাসিরা খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত আলজেরিয়া দখল করে নিত সমৃদ্ধ কৃষিভূমির জন্য এবং সেখানে উপনিবেশ গড়ে তুলত। ইথিওপিয়াবাসীর খ্রিষ্টান হওয়া কোনোভাবেই ইতালীয়দের বিরত করত না সেখানে নিষ্ঠুরভাবে উপনিবেশ গড়ে তোলায়। সোজা কথা, ইসলামপ্রধান মধ্যপ্রাচ্য যেভাবে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, ইসলামের বদলে খ্রিষ্টধর্ম থাকলেও প্রতিরোধ-প্রতিক্রিয়া এ রকমই হতো।

ইসলাম না থাকলে মধ্যপ্রাচ্য নিশ্চয়ই অনেক বেশি গণতান্ত্রিক হতো? এই প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দেওয়ার পক্ষে নন ফুলার। তিনি বলেন যে ইউরোপের একনায়কতন্ত্রের ইতিহাস পরিক্রমায় নিলে এ রকম আশা করা যায় না। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি এসে স্পেন ও পর্তুগালের কঠোর একনায়কতন্ত্রের সমাপ্তি হয়েছে। মাত্র কয়েক দশক আগে গির্জাসম্পৃক্ত একনায়কতন্ত্র থেকে গ্রিক বেরিয়ে এসেছে। খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত রাশিয়ায় কার্যত এখনো একনায়কতন্ত্র। লাতিন আমেরিকায় একনায়কেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদে ও ক্যাথলিক গির্জার সহযোগিতা নিয়েই বছরের পর বছর ক্ষমতা আঁকড়ে থেকেছে। বেশির ভাগ খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত আফ্রিকার অবস্থাও ভালো নয়। তাই ফুলারের পাল্টা প্রশ্ন, যদি খ্রিষ্টপ্রধান মধ্যপ্রাচ্য হতো, সেটা কেন ব্যতিক্রমী হতো?

মধ্যপ্রাচ্যে ফিলিস্তিন সমস্যার উল্লেখ করে ফুলার বলেন, সহস্র বছরের বেশি সময় ধরে খ্রিষ্টানরাই নির্লজ্জভাবে ইহুদিদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, খ্রিষ্টানরাই হোলোকাস্ট ঘটিয়ে লাখ লাখ ইহুদি নিধন করেছে। সেমেটিকবিরোধী ভয়াবহ কর্মকাণ্ড গভীরভাবে প্রোথিত আছে পশ্চিমা খ্রিষ্টবাদের মাটিতে ও সংস্কৃতিতে। আর তাই ইহুদিরা ইউরোপের বাইরে নিজেদের আবাসভূমির সন্ধান অব্যাহত রাখত, জায়নবাদী আন্দোলন এখনকার মতোই অব্যাহত থাকত আর ফিলিস্তিনেই ঘাঁটি গাড়ত। নয়া ইহুদি রাষ্ট্র ফিলিস্তিনের সাড়ে সাত লাখ আরব অধিবাসীকে নিজেদের মাটি থেকে বিতাড়িত করত যদি তারা সবাই খ্রিষ্টান হতো, তাহলেও।

বাস্তবে তো বিতাড়িত আরবদের মধ্যে খ্রিষ্টানও ছিল, যারা নিজ ভূমি রক্ষায় লড়াই করেছিল। আর তাই ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সমস্যা আজও অব্যাহত থাকত জাতীয়তাবাদী, নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক সংঘাত হিসেবে, যা কিনা সম্প্রতি এসে ধর্মীয়ভাবে উজ্জীবিত হয়েছে। ফুলার এও মনে করিয়ে দেন যে মধ্যপ্রাচ্যে আরব জাতীয়তাবাদের উত্থানের প্রথম পর্বে আরবীয় খ্রিষ্টানদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। প্রথম প্যান-আরব বাথ পার্টির আদর্শিক স্থপতি হিসেবে সরোবনে শিক্ষা গ্রহণকারী সিরীয় খ্রিষ্টান মিশেল আলফাকের নাম করা হয়।

ফুলার জোর দিয়ে বলেন যে ইসলাম যদি না থাকত আর মধ্যপ্রাচ্যে যদি প্রাচ্য খ্রিষ্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ অবস্থায় বসবাস করত, তাহলেও পশ্চিমাদের সাম্রাজ্যবাদী অভিযান এখানে বজায় থাকত তেল ও অন্যান্য স্বার্থে। পশ্চিমা শক্তি নিজেদের স্বার্থেই মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রে রদবদল করত আর নিজেদের অনুগত সরকার বসাত। আর তাই আজকের মতো ফিলিস্তিনকে পুড়তে হতো, ইরানিরা প্রবল জাতীয়তাবাদী হিসেবে থাকত। দেখা যেত ফিলিস্তিনিরা ইহুদিদের, চেচেনরা রুশদের, পারসিকরা আমেরিকান ও ব্রিটিশদের, কাশ্মীরিরা ভারতীয়দের, তামিলরা সিংহলিদের আর উইঘুর ও তিব্বতিরা চীনাদের প্রতিরোধ করত।

ইসলামকে নিয়ে আজকে পশ্চিমা দুনিয়া ও অন্যত্র যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আলোচিত, তা হলো সন্ত্রাসবাদ। এই বইয়ে ফুলার প্রশ্ন করেছেন, ইসলাম না থাকলে কি নয়-এগারো হতো না? জবাবও তিনি দিয়েছেন এভাবে যে মধ্যপ্রাচ্যে বছরের পর বছর আমেরিকার নীতি ও কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জমে থাকা ক্ষোভের প্রকাশ তো অন্য কোনোভাবে হতো। তিনি বলেন যে যখন আরও অনেক দীর্ঘস্থায়ী ক্ষোভ থাকে, তখনো শুধু ধর্মের সম্পৃক্ততাকেই খুব সহজে দায়ী করা যায়। আল-কায়েদার সন্ত্রাসীদের কাছে ইসলাম তো একটি আতশি কাচের মতো ব্যবহৃত হয়েছে যে আতশি কাচ কিনা সূর্যালোক থেকে অগ্নি প্রজ্বলন করতে পারে। জমে থাকা অভিন্ন ক্ষোভ ও হতাশাকে একত্র করে বিদেশি আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে আঘাত হানা হয়েছে।

ফুলার আমাদের এটাও মনে করিয়ে দেন যে পশ্চিমারা সন্ত্রাসবাদের জন্য ইসলামকে অভিযুক্ত করে ইতিহাসের বিকৃতি ও বিস্মৃতি ঘটিয়েছে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ফিলিস্তিনি ইহুদি গেরিলারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ চালিয়েছিল। শ্রীলঙ্কার হিন্দু তামিল 'টাইগাররা' আত্মঘাতী বোমা হামলার কৌশল উদ্ভাবন করেছিল এবং এক দশকের বেশি সময় ধরে এই কাজে বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দিয়েছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তো তামিলদের আত্মঘাতী বোমা হামলায়ই নিহত হন। শিখদের সুসংগঠিত সন্ত্রাসবাদে প্রাণহানি ঘটে ভারতের

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর। সারা ভারতে আতঙ্ক তৈরি করে শিখ সন্ত্রাসীরা তো আটলান্টিকের ওপর এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান হাইজ্যাক করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মেসিডোনিয়ার সন্ত্রাসীরা বলকান অঞ্চলে আতঙ্ক তৈরি করেছিল। ১৯ শতকের শেষ ভাগে ও ২০ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপ ও আমেরিকায় 'নৈরাজ্যবাদীরা' কয়েক ডজন বড় বড় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কয়েক দশক ধরে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির সন্ত্রাস কিংবা ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট গেরিলা ও সন্ত্রাসীদের আঘাত অথবা মালয়েশিয়ায় কমিউনিস্টরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে, কেনিয়ায় মাউ মাউ সন্ত্রাসীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নিয়েছিল। তালিকা অনেক দীর্ঘ হতে পারে উল্লেখ করে ফুলার বলেন যে সন্ত্রাসবাদ চালাতে গেলে মুসলমান হতে হয় না। তিনি আরও বলেন যে অব্যাহতভাবে ইসরায়েল বা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, দখলদারি, উৎখাত ও হস্তক্ষেপে ক্ষুব্ধ হয়ে আরব মুসলমান বা খ্রিষ্টানরা তাহলে কেন একই ধরনের গেরিলা কায়দা বা সন্ত্রাসী তৎপরতার পথ বেছে নেবে না? বরং প্রশ্ন হতে পারে যে এটা আরও আগে কেন হয়নি? যদি ইসলাম আধুনিকতা ঘৃণাই করবে, তাহলে নয়-এগারো পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করতে হলো হামলা চালানোর জন্য? কেন ২০ শতকেই ইসলামি চিন্তাবিদেরা সংস্কৃতিগত স্বতন্ত্র রক্ষা করেই আধুনিকতা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন?

ফুলার আমাদের ভাবনার গভীরে নিয়ে যান এই বলে যে যদি ইসলাম কখনোই প্রতিরোধের বাহন হিসেবে না থাকত, তাহলে অবশ্যই মার্ক্সবাদ থাকত। এটা এমন এক আদর্শ যা অসংখ্য সন্ত্রাসী, গেরিলা ও জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করেছে। কলম্বিয়ায় ফারক, পেরুতে শাইনিং পাথ, ইউরোপে রেড আর্মি ফ্যাকশন গুটি কয়েক নামমাত্র। পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইনের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ হাবাশ ছিলেন একজন গ্রিক অর্থোডক্স খ্রিষ্টান ও মার্ক্সবাদী, যিনি বৈরুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করেছেন। বহু ফিলিস্তিনি খ্রিষ্টান হাবাশকে সমর্থন দিয়েছেন।

ফুলার যুক্তি দিচ্ছেন যে যারা বিদেশি আগ্রাসনকারী বা নির্যাতকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তারা তাদের কাজকে গৌরবান্বিত হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য কিছু ছত্রচ্ছায়া বা ব্যানার চায়। ন্যায়বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রেণিসংগ্রাম এ রকম একটি ছত্রচ্ছায়া হিসেবে বিবেচিত হয়। জাতীয়তাবাদ আরও ভালো। তবে ধর্ম হলো সর্বোত্তম। আর সর্বত্রই ধর্ম জাতীয়তা ও নৃতাত্ত্বিকতা চাঙা করতে বড় ভূমিকা রাখে, বিশেষত শত্রু যদি হয় ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। এসব ক্ষেত্রে বিরোধ-সংঘাতের উৎস নয়, বরং বাহন হয়ে ওঠে ধর্ম।

বইটিতে ফুলার আমাদের কাছে এই অভিমতও তুলে ধরেন যে আমরা এখন এমন একটা সময়ে বাস করছি, যখন সন্ত্রাস প্রায়ই দুর্বলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি ইতিমধ্যে আফগানিস্তান, ইরাক ও অন্যত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর অতুলনীয় শক্তিমত্তাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। আর তাই অনেক অমুসলিম সমাজে বিন লাদেনকে 'পরবর্তী চে গুয়েভারা' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। প্রচণ্ড প্রভাবশালী মার্কিন শক্তিমত্তাকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করার আহ্বানই এর কারণ। দুর্বলরা পাল্টা আঘাত হানছে, এই আবেদনটি ইসলাম বা মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতিকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে।

যদি ইসলাম না থাকত, তাহলে কি পৃথিবী আরও বেশি শান্তিময় হতো না—এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফুলার তাঁর বইয়ে উপসংহার টানছেন চূড়ান্তভাবে। তিনি বলছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নিরন্তর বিরোধ-উত্তেজনায় ইসলাম নিঃসন্দেহে বাড়তি একটি মাত্রা যুক্ত করেছে, সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে জটিলতা বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে ইসলাম এসব সমস্যার কারণ নয়। অথচ সমস্যার কারণ হিসেবে বিশ্বের একক পরাশক্তির দুনিয়া দাপিয়ে বেড়ানোর প্রভাব খুঁজে দেখার চেয়ে ইসলামকে দাঁড় করানো অনেক সোজা।

গোটা বইয়ে ইতিহাসের পরিক্রমাসহ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের আলোকে ফুলার তাই আরও বলছেন যে ইসলাম না থাকলেও আজকের দুনিয়া বিদ্যমান বেশির ভাগ রক্তাক্ত সংঘর্ষ অব্যাহত থাকা দেখতে পেত, যেখানে ভূরাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করত যুদ্ধ ও নির্যাতন। ধর্মের বদলে অন্য কোনো কিছু ব্যবহৃত হতো জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রেরণা ও ছত্রচ্ছায়া হিসেবে। নিশ্চয় ইতিহাসের পরিক্রমা এখনকার মতো হতো না। তবে মানব ইতিহাসের বৃহত্তর ঐতিহাসিক ও ভূরাজনৈতিক ইস্যু অর্থাৎ নৃতাত্ত্বিকতা, জাতীয়তাবাদ, উচ্চাশা, লোভ, সম্পদ, স্থানীয় নেতৃত্ব, গোত্র, আর্থিক প্রাপ্তি, ক্ষমতা, হস্তক্ষেপ এবং বহিরাগত, আগ্রাসনকারী ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণার কারণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বিরোধ অব্যাহত থাকতই। ফুলার মনে করিয়ে দেন যে বিংশ শতকে মানব ইতিহাসের প্রধান প্রধান আতঙ্ক প্রায় সবই ধর্মনিরপেক্ষ শাসনক্ষেত্র থেকে সৃষ্ট। কঙ্গোতে নৃশংস গণহত্যা পরিচালনাকারী বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড, হিটলার, মুসোলিনি, লেনিন ও স্ট্যালিন, মাও এবং পল পটের নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন তিনি। আরও বলেছেন যে ইউরোপীয়রা দু-দুবার বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে ও তাতে গোটা বিশ্বকে জড়িয়েছে। এর কোনো তুলনাই ইসলামের ইতিহাসের সঙ্গে হতে পারে না। আর তাই যাঁরা মনে করেন যে ইসলাম না থাকলে দুনিয়াতে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সহিংসতা অনেক কম হতো, তারা সত্য ভুলে যান। কঠিন সত্য হলো এই যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সহিংসতা আজকে আমরা যেমন

দেখছি, ইসলামের অবর্তমানে তার খুব একটা ব্যতিক্রম হতো না।

ফুলারের বিশ্লেষণের সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিমত করার অবকাশ রয়েছে। বিশেষত ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ ও ব্যাখ্যা নিয়ে একাধিক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, রয়েছে পাল্টাযুক্তি। আর তাই তাঁর উপসংহারের সঙ্গেও অনেকে, বিশেষত পাশ্চাত্যঘেঁষা, পণ্ডিতেরা একমত নন। একইভাবে পাশ্চাত্য গণমাধ্যম ও প্রচারযন্ত্রের কল্যাণে দুনিয়াজুড়ে অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের ভেতর ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে এতটাই নেতিবাচক ধারণা গেঁড়ে বসেছে যে প্রসারিত দৃষ্টি ও মুক্তমন নিয়ে ফুলারের বিশ্লেষণ ও উপসংহার উপলব্ধি করতে সক্ষম মানুষের সংখ্যা কমই বলতে হবে। সর্বোপরি সিআইএর একজন সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কেন ও কী উদ্দেশ্যে এ রকম একটি বই রচনা করলেন বা এর পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই গোপন কোনো মদদ আছে কি না, এজাতীয় সন্দেহের জাল ছড়ানোর কাজটিও রয়েছে। অবশ্য হানটিংটন সম্পর্কেও বলা হয় যে তাঁকে সিআইএ অর্থায়ন করেছে আর পশ্চিমা গোষ্ঠী বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে দিয়ে *সভ্যতাসমূহের সংঘাত* বইটি লিখিয়েছে গোটা দুনিয়ার ওপর তার আধিপত্য বিস্তারকে জায়েজ করতে।

এত কিছুর পরও গ্রাহাম ই ফুলারের বইটি কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করার বিরাট এক দুয়ার খুলে দিয়েছে। অনেক প্রশ্নের জবাব মেলে ধরেছে। অনেক বিভ্রান্তিকর ধারণার অপনোদন করেছে। এটা প্রতিষ্ঠা করেছে যে ইসলাম সভ্যতাসমূহের সংঘাত সূত্রপাতে বা বিস্তারে কোনো ভূমিকা রাখেনি, বরং সংঘাত অনিবার্য হওয়ায় মোকাবিলা করতে গিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। ইসলাম সন্ত্রাসবাদের কোনো কারণ নয়, বরং পশ্চিমা আগ্রাসন-হস্তক্ষেপের প্রতিরোধের শক্তিশালী বাহন হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি ইসলাম না থাকলেও আজকের দুনিয়ায় সংঘাত ও আগ্রাসনের চিত্রটি আমূল বদলে যেত না, বড়জোর কিছুটা এদিক-ওদিক হতো।

তথ্যসূত্র

১. রশীদ, মো. আবদুর (অনূদিত), *স্যামুয়েল পি হানটিংটনের দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনস অ্যান্ড দ্য রিমেকিং অব ওয়ার্ল্ড অর্ডার*, পৃষ্ঠা-৩০৪ (ঢাকা : অনিন্দ্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১০)।

২. John Cherian, 'War of Terror', *Frontline*, Vol.28, No.20, October 7, 2011. pp-4.

৩. John Cherian, ibid, 2011, pp-5.

৪. Aijaz Ahmad, 'Broken Countries, Broken Economies', *Frontline*, Vol.28, No.20, October 7, 2011. pp-28.

গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুচ্ছের বাংলা অনুবাদ

Islamophobia ইসলামভীতি
Neoconservative নয়ারক্ষণশীল
Islamofascism ইসলামী ফ্যাসিবাদ
Global War on Terror সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধ
Heresy and Power উৎপথ ও ক্ষমতা'
Abrahamic Faiths ইব্রাহিমীয় বিশ্বাস
Byzantium versus Rome: Warring Christian Polarities বাইজানটানীয় বনাম রোমান : খ্রিস্টীয় মেরুকরণের যুদ্ধ
Eastern Orthodox Christianity প্রাচ্যের গোঁড়া খ্রিস্টবাদ
Western or Roman Catholic Christianity পশ্চিমের বা রোমান গোঁড়া খ্রিস্টবাদ
Eastern Orthodox Church প্রাচ্যের গোড়া গির্জা
Fault Lines ফাটল রেখাগুলো
Meeting at the Civlizational Boarder of Islam ইসলামী সভ্যতার সীমান্তে মিলন
The Clash of Civilisations সভ্যতাসমূহের সংঘাত
Bloody Borders of Islam ইসলামের রক্তাক্ত সীমানাসমূহ
War of Terror সন্ত্রাসের যুদ্ধ
Vehical of Resistence প্রতিরোধের বাহন
Islam vs Judeo-Christian ইসলাম বনাম ইহুদি-নাসারা'

লেখক পরিচিতি

আকবর আলি খান

অর্থনীতিবিদ ও প্রাবন্ধিক। ইতিহাস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং রেগুলেটরি রিফর্ম কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা—*অন্ধকারের উৎস হতে* (পাঠক সমাবেশ, ২০১০); *পরার্থপরতার অর্থনীতি* (ইউপিএল, ২০০০); *ডিসকভারি অব বাংলাদেশ : এক্সপ্লোরেশন ইনটু ডিনামিকস অব এ হিডেন ন্যাশন* (ইউপিএল, ১৯৯৬); *সাম আসপেক্টস অব পিজ্যান্ট বিহেভিয়র ইন বেঙ্গল, ১৮৯০-১৯১৪ : এ নিও-ক্ল্যাসিকাল অ্যানালিসিস* (এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮২), *আজব ও জবর-আজব অর্থনীতি* (প্রথমা, ২০১৩), *চাবিকাঠির খোঁজে : নতুন আলোকে জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'* (প্রথমা, ২০১৪)।

ইমতিয়াজ আহমেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক। ১৯৯১ সালে কানাডার অটোয়ার কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতি, সন্ত্রাসবাদ, শরণার্থী ও অভিবাসন, উন্নয়ন রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ১৭টি বই এবং ১০০টির বেশি গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হলো : বীণা সিক্রী ও মুচকুন্দ দুবের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশিত *কনটেম্পরাইজিং ঠাকুর অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড* (ইউপিএল, ২০১৩), আমেনা মহসীনের সঙ্গে প্রকাশিত *উইমেন অ্যান্ড মিলিট্যান্সি : সাউথ এশিয়ান কমপ্লেক্সিটিস* (ইউপিএল : ২০১১), *আন্ডারস্ট্যান্ডিং টেররিজম ইন সাউথ এশিয়া : বিয়ন্ড স্ট্যাটিস্ট ডিসকোর্সেস* (সম্পাদিত) (কলম্বো : রিজিওনাল সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিস অ্যান্ড নিউ ডেইলি : মনোহর পাবলিশার্স, ২০০৬) প্রভৃতি।

সৈয়দ ইফতেখার আহমেদ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্দান অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিকস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে পিএইচডি করেছেন। বর্তমানে আমেরিকান পাবলিক ইউনিভার্সিটির স্কুল অব সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজের অস্থায়ী শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। প্রকাশনা- *Water for Poor Women: Quest for an Alternative Paradigm* (Lanham: Lexington Books, 2013); লেখালেখির বিষয়- পানি, শাসনব্যবস্থা, ইসলামবাদ, গণতন্ত্রায়ণ, জেন্ডার ও উন্নয়ন।

পাভেল পার্থ

লেখক ও গবেষক। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা : *মধুপুরের প্রাণবৈচিত্র্য, অরণ্যের লড়াই, খাদ্য-লংঘন ও লড়াই, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা, কৃষকের বীজ অধিকার* ইত্যাদি। ছোট কাগজ, জার্নাল ও নানান স্থানীয় প্রকাশনাসহ পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন। বারসিক নামের এক বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

মিজানুর রহমান খান

সাংবাদিক, আইন বিশেষজ্ঞ। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা- *তত্ত্বাবধায়ক সরকার : এর অশনিসংকেত* (আগামী, ২০০৯); *সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক* (সিটি প্রকাশনী, ১৯৯৫); *মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড* (প্রথমা, ২০১৩)।

আসজাদুল কিবরিয়া

লেখক ও সাংবাদিক। *প্রথম আলোর* বাণিজ্য পাতার সম্পাদক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। অর্থনীতি বিষয়ে লেখালেখি বেশি করেন। ইতিহাসে আগ্রহী। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : *অর্থনীতির অনর্থ* (জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১৪); *ট্রানজিটের টানাপোড়েন* (জাগৃতি, ২০১২)। *ভাষা আন্দোলনের গল্প* (প্রজাপতি, ১৯৯৪) গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। অফিসে সরাসরি উপস্থিত হলেই শুধু নগদ টাকা গ্রহণ করা হবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি গ্রাহক কার্ড দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৮১



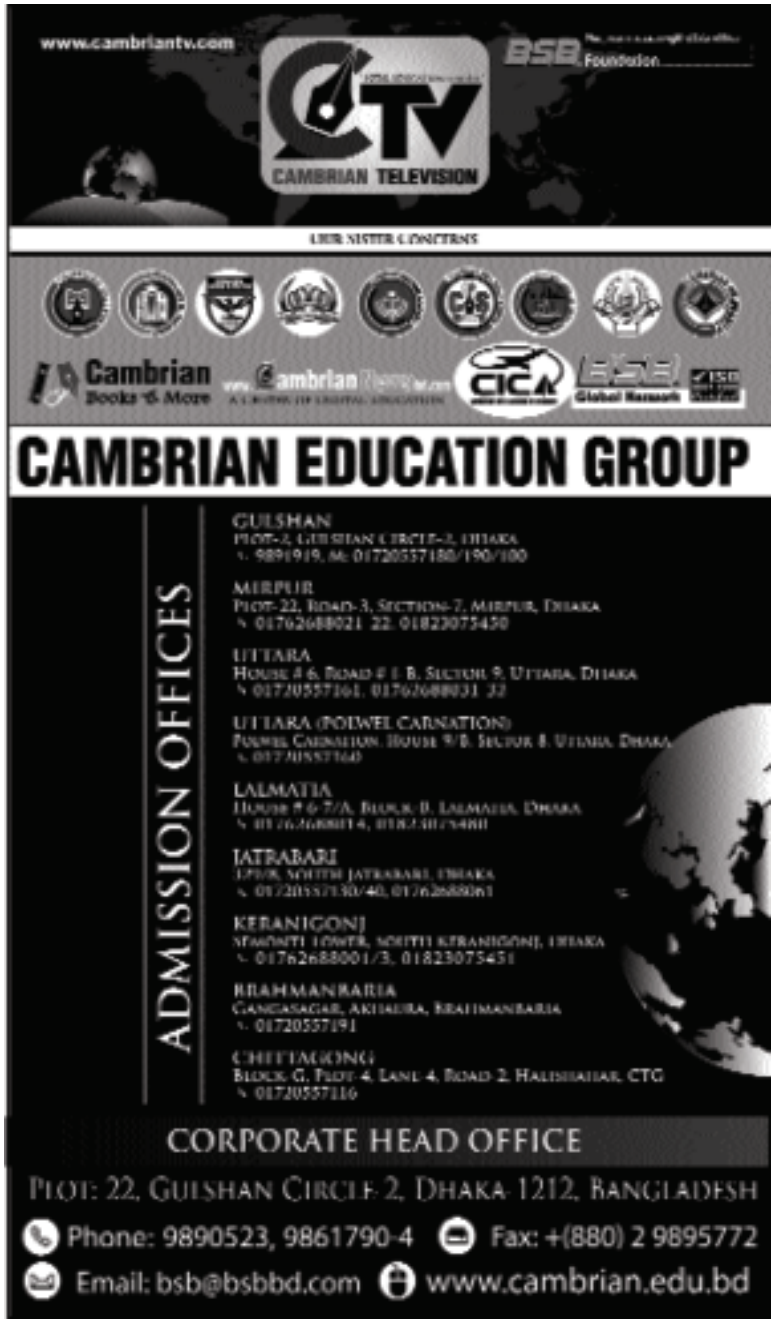
www.cambriantv.com
BSB Foundation
CTV
CAMBRIAN TELEVISION
Cambrian Books & More
CICA
BSB Global Research
CAMBRIAN EDUCATION GROUP
ADMISSION OFFICES
GULSHAN
PLOT-2, GULSHAN CIRCLE-2, DHAKA
9891919, M: 01720557180/190/100
MIRPUR
PLOT-22, ROAD-3, SECTION-7, MIRPUR, DHAKA
01762688021 22, 01823075450
UTTARA
HOUSE # 6, ROAD # 1 B, SECTOR 9, UTTARA, DHAKA
01720557161, 01762688031 32
UTTARA (POLWEL CARNATION)
POLWEL CARNATION, HOUSE 9/B, SECTOR 8, UTTARA, DHAKA
01720557160
LALMATIA
HOUSE # 6/ 7/A, BLOCK-B, LALMATIA, DHAKA
01762688014, 01823075460
JATRABARI
PLOT, SOUTH JATRABARI, DHAKA
01720557130/40, 01762688061
KERANIGONJ
SHANTI TOWER, SOUTH KERANIGONJ, DHAKA
01762688001/3, 01823075451
BRAHMANBARIA
GANGASAGAR, AKHAURA, BRAHMANBARIA
01720557191
CHITTAGONG
BLOCK: G, PLOT: 4, LANE: 4, ROAD 2, HALISHAHAR, CTG
01720557116
CORPORATE HEAD OFFICE
PLOT: 22, GULSHAN CIRCLE-2, DHAKA-1212, BANGLADESH
Phone: 9890523, 9861790-4
Fax: +(880) 2 9895772
Email: bsb@bsbbd.com
www.cambrian.edu.bd


result
BCS ৩৩তম বিপ্লব
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জাতীয় মেধায় ১ম
১ম
রিদওয়ান ইসলাম (পদার্থ)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২য়
নাজনীন পুরকায়স্থ (রসায়ন)
DU
৩য়
খায়রানা শর্মীক (পুলিশ)
DU
জাতীয় মেধায় ৭ম
৫ম
মো: শোভের আলম (পদার্থ)
ঘটিয়েছে
S@ifur's
01713 432056
বরিশাল ব্রাঞ্চের ছাত্র
01714 163601
জাতীয় মেধায় ৯ম
৬ষ্ঠ
মো: আরাফাত রহমান (পদার্থ)
KUET
জাতীয় মেধায় ১০ম
৭ম
লিয়াজ মোর্শেদ (পদার্থ)
আখরখনা ব্রাঞ্চের ছাত্র
BUET
৮ম
ইমরান রহমান (পুলিশ)
বরিশাল ব্রাঞ্চের ছাত্র
৯ম
আসাদুজ্জামান (রসায়ন)
DU
১০
সালিহা আফরিন (পুলিশ)
S@ifur's-এ BCS কোচিং করে ৩৩তম BCS-এ
২৬৪৪ জন সফল ক্যাডারদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে
মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের
S@ifur's 33rd BCS Success '14
পাহপথ 01713 432073
মৌচাক 01713 432011
আগারগাঁও 01713 017811

প্রথমার বই সারা বছর সেরা বই

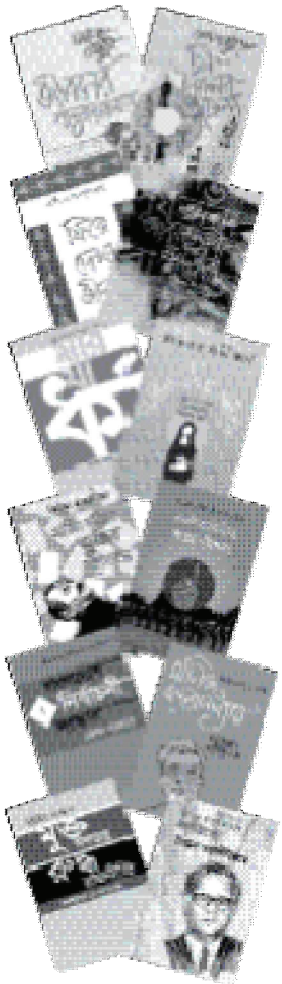

কোষগ্রন্থ

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
যার যা ধর্ম : বাংলা ভাষায়
প্রথম ধর্ম অভিধান ৩য় মুদ্রণ ৳ ৮০০

প্রবন্ধ, গবেষণা ও অন্যান্য

আকবর আলি খান
চাবিকাঠির খোঁজে : নতুন আলোকে
জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' ৫ম মুদ্রণ ৳ ৩৫০
মিজানুর রহমান খান
মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড ৩য় মুদ্রণ ৳ ৬০০
আনোয়ার উল আলম
রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা ৪র্থ মুদ্রণ ৳ ৩৭৫
আবদুল মান্নান সৈয়দ
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অন্তর্বাস্তবতা
বহির্বাস্তবতা ৳ ৪০০
এম সাখাওয়াত হোসেন
বাংলাদেশে নির্বাচনী সংস্কার ১৯৭২-২০০৮ ৳ ৪৫০
মতিউর রহমান
মুক্ত গণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি :
বাংলাদেশ ১৯৯২-২০১২ ৳ ৪৫০

আত্মস্মৃতি / স্মৃতি

ফারুক চৌধুরী
জীবনের বালুকাবেলায় ৫ম মুদ্রণ ৳ ৭৫০
সৈয়দ শামসুল হক
তিন পয়সার জ্যোছনা ৳ ৪০০
এটিএম শামসুল হুদা
ফিরে দেখা জীবন ৳ ৩৬০
সৈয়দ আবুল মকসুদ
স্মৃতিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ৳ ২০০
মতিউর রহমান
আকাশগুলা সূর্যতারা : কবিতা-গান-
শিল্পের ঝরনাধারায় ৳ ৮০০

প্রথমা

প্রাপ্তিস্থান : প্রথমা বইয়ের দুনিয়া—ঢাকা কারওয়ান বাজার ৮১৮০০৭৮; বাংলাবাজার ৩১৭২৮-৮৮৪৪২৩; শাহবাগ ৯৬৬৪৮২৫; চট্টগ্রাম ৬১৬১৬৫, রাজশাহী ৩১৭৪৯-৮৪৫৮৪৫
ফোনে অর্ডার/ বই অনুসন্ধান : ০১৭১১-৬৪৯৪২২ (সকাল ১০টা-রাত ৮টা)

পাঠকের মননশীল ভাবনার জগতকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পাঞ্জেরী'র উল্লেখযোগ্য কিছু বই

পাঞ্জেরী

- বাংলা সাহিত্যের অনিবার্য সংকেত : মাইকেল থেকে মানিক ড. রতন সিদ্দিকী
- কতিপয় নাট্যকৃতি ড. রতন সিদ্দিকী
- কবিতার রূপকল্প ও আত্মার অনুষঙ্গ ড. সরকার আবদুল মান্নান
- সম্প্রীতির সম্ভাবনা : বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের দলিল মোহাম্মদ রফি
- Social Change Through Logical Erudition
  Mohammad Nuruddin (Alow)
- The Essentials of Governance Coordination and State's Management
  Mohammad Nuruddin (Alow)
- Emergence of Bangladesh and Role of Awami League
  Dr. Md Abdul Wadud Bhuian
- From Imbroglios to Socialistation
  Mohammad Nuruddin (Alow)
- Small Ethnic Groups of Bangladesh A Mapping Exercise
  Mohammad Rafi
- Can We Get Along?
  Mohammad Rafi

